CENTRAL LIBRARY

মাসিক পত্রিকা

দ্বাবিংশতি বর্ষ

আভা

শারদীয়া সংখ্যা

১৪০০

সম্পাদিকা—রেখা চট্টোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

MUKHERJEE & ALLIANCES (I) PVT. LTD.

JABAKUSUM HOUSE
34. CHITTARANJAN AVENUE, 2ND FLOOR,
CALCUTTA-700 012

Phone : 27-3123

★

ALL SORTS OF CARGO

Clearing Forwarding Agent (Custom House)
&
Consultant Civil Engineers.

CENTRAL LIBRARY

বৎসরান্তে আবার শারদীয়া পূজার আয়োজন চলেছে। আলোতে মণ্ডপ সজ্জায় পরস্পরের সঙ্গে রেশারেশি ঘটা ভালই চলেছে। নতুন জামা কাপড় কেনার ভিড়ে পথে চলা সুকঠিন হয়ে পড়েছে। মা আসছেন উপলক্ষে কিছু মানুষ দূর দূরান্তে পাড়ি দিচ্ছেন। আবার কেউ কেউ উৎসবের কটা দিন আত্মজনেদের নিয়ে নানাভাবে দিন কাটাবার পরিকল্পনায় মেতে উঠেছেন। এইসব আনন্দ উৎসবের সমারোহের মধ্যে সদ্য ভূমিকম্পে নিহত বা সর্বহারা মানুষের কথা সকলেই ভুলে গেছেন। এবারে উৎসবের জাঁকজমক কমিয়ে এই দুর্গত মানুষের কথা চিন্তা করতে পারলে আমাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া যেত—কিন্তু বিরাট অর্থ সংগ্রহের নামমাত্র অংশ অনেক পূজা কমিটি দুর্গত ত্রাণ তহবিলে জমা দিয়েই তাঁদের দায় দায়িত্ব সেরে ফেলছেন।

আভা পত্রিকার অন্যতম আত্মীয় ও পৃষ্ঠপোষক শোভনা সেন আমাদের মধ্যে নেই। কলম ধরলেই তাঁর স্মৃতি আমাদের শোকাহত করে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক বাণী রায় ও মায়া বসুও চলে গেছেন। প্রতিটি আভা পত্রিকার পূজা সংখ্যায় এঁদের লেখা প্রকাশিত হয়ে এসেছে। আজ সেইসব শূন্যস্থান পূর্ণ করবার লোকের বড় অভাব।

এবারে যে সব লেখক লেখিকা এবং বিজ্ঞাপন দাতারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আভা পত্রিকার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে সকলকে ৺বিজয়ার যথাযোগ্য প্রীতি ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাই।

—সম্পাদিকা

কবি ও সাহিত্যিকা *শোভনা সেন*

স্মরণে—

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ
সর্বে সন্তু নিরাময়

M/s. A. K. SEN & CO.
M/s. I. T. T. PVT. LTD.

M/s. ALLIED CHROMES & CHEMICALS PVT. LTD.

M/s. ANALYTIQUE

43A, BLOCK-'C', NEW ALIPORE, CALCUTTA-700 053

With best Compliments of

S. K. HAZRA & CO. PVT. LTD.

Manufacturers of :

"S. K. H." Pumps, Submercible Pumps & Motors.

167, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-700 001

সুসাহিত্যিকা *শোভনা সেন*-এর

পুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্য	(মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ৫০০তম আবির্ভাব স্মরণে)	মূল্য ২০ টাকা
সাধক মালিকা	(মহাপুরুষগণের জীবনী পদ্যে)	মূল্য ২০ টাকা
ছোটদের শ্রীরামকৃষ্ণ	(পদ্যে)	মূল্য ৫ টাকা
মাটির প্রদীপ	(কাব্য গ্রন্থ)	মূল্য ৫ টাকা
ওরা কাজ করে	(গল্প)	মূল্য ১৫ টাকা

প্রকাশক : কৃষ্ণ কিশোর সেন, ১৮৩, বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, কলিকাতা-৬৯

প্রাপ্তিস্থান : এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ।
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

সাহিত্যিক শ্রীজ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

"সাম্যবাদী রাজপথ" (নিবন্ধমূলক উপন্যাস)

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। মূল্য ৩০ টাকা

প্রকাশক : শ্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়দীপ প্রকাশন ; ১/৮৩, নাকতলা, কলিকাতা-৭০০ ০৪৭

প্রাপ্তিস্থান : শৈব্যা পুস্তকালয় ; ৮/১সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক *বেদুইন*-এর

কয়েকটি বই

পথে প্রান্তরে (সম্পূর্ণ)—৩৫ টাকা	প্রকাশক	সাহিত্য প্রকাশ
অপরাধ অপরাধী—৩৫ টাকা	,,	,, ,,
অতঃকিম—৩৫ টাকা	,,	,, ,,
সমকালীন ভারতবর্ষ ও সুভাষচন্দ্র—২৫ টাকা	,,	নাথ পাবলিশিং
তৃতীয় পক্ষ বনাম চতুর্থ পক্ষ—১২ টাকা	,,	অনিমা প্রকাশনী
সন্ত্রাস যুগে যুগে—৩০ টাকা	,,	পত্রপুট

With best compliments from :

G. R. CONSTRUCTION

Building Contractor, Painting Decorator &

General Order Suppliers.

30, SANTOSH ROY ROAD, CALCUTTA-700 008

Phone (Evening Office) : 77-6387

with COMPLIMENTS from

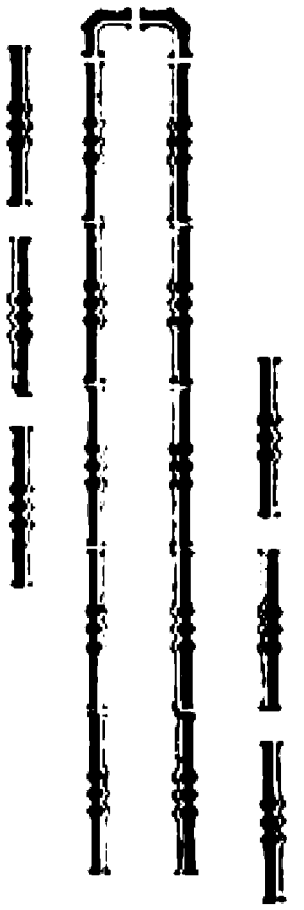

DABUR (INDIA) LIMITED

Manufacturers of :

AYURVEDIC MEDICINES AND COSMETICS.

CALCUTTA ★ SAHIBAD ★ DABURGRAM

SUNNY INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

13N, DHIRENDRA NATH GHOSH ROAD,

CALCUTTA-700 025

With best compliments from :

BARUAH ENTERPRISE

JANATA ROAD,

DIGBOI, ASSAM

Phone : 467 (.)

GOVT. APPROVED ELECTRICAL CONTRACTOR.

CENTRAL LIBRARY

With best compliments from :

BARUAH BROTHERS

P. N. ROAD, SANTIPARA

DIBRUGARH, ASSAM.

Distributor for :

NESTLE INDIA LTD.

With best Compliments of

KAMAKHYA STORES & AGENCY

GENERAL MERCHANTS & STOCKISTS.

DISTRIBUTORS, ORDER SUPPLIERS,

TIMBER CONTRACTOR & COMMISSION AGENTS.

P. O.—PARBATPUR, NAMRUP,

DIST.—DIBRUGARH, ASSAM-786623

CENTRAL LIBRARY

ENGINEERING CHAMBER

H. S. ROAD,

DIBRUGARH

ASSAM

"মায়ের পূজায় শারদ অভিনন্দন

শতরূপা

(আধুনিক ডিজাইনের তাঁতের শাড়ী ও ধুতি বিক্রেতা)

৬২/৪, সূর্য্য সেন স্ট্রীট, (ইণ্ডিয়া হোটেলের নীচের তলায়)
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ফাটা ছাদ ?
জল পড়ে ?
ফাটা ছাদের সমস্যায় হতাশ ?

মূল্যবান পরামর্শ ও দশ বৎসরের গ্যারান্টিসহ
মেরামতের জন্য যোগাযোগ করুন।

কুমার ব্রাদার্স এণ্ড কোং
২, চার্চ লেন, কলিকাতা-৭০০০০১
ফোন ঃ ২৪৮-৮৫৫৫

With best compliments from ..

SATISH CHANDRA BHOWMICK
Authorised Plumber : Calcutta Municipal Corporation.

B. G. ENTERPRISE
Contractor & Order Suppliers

E/165, RAMGARH, CALCUTTA-700 047
Phone : 72-3039

With Best Compliments Of

B. E. PUMPS PRIVATE LIMITED

4, B. B. D. BAG, EAST

CALCUTTA-700 001

Gram :	Telex :	Phones :
BHOWMKAL	021-2426	248-7746 / 7747 / 7837 / 8714

With Best Compliments from :—

Phone : 48-4004

KAMAL OPTICAL

General Opthalmic Services & Sight Testing by Highly Qualified
and Experienced Eye Specialists.

114A, ASHUTOSH MUKHERJEE ROAD, 1st Floor, CALCUTTA-25

EYE SPECIALISTS :

Dr. M. K. GHOSE, M.B.B.S., D B.M.S., D.H.S.. D.O., M.D., M.S., (OPHTH).
5 to 6 p.m.—Mon, Wed, Friday.

Dr. (Mrs) M. SENGUPTA, M.B.B.S., D.O.:
Daily—6-30 p.m. to 8-30 p m.
Morning—11 p.m. to 12 noon
Mon. Wed. Friday.

Dr. S. C. BOSE, D.O.G.S.
Refractionist & Opthalmist
Tues. Thurs & Saterday 5 to 6 p.m.

With the Best Compliments of—

Phone : 40-2134

BENGAL TAXI SERVICE

15, LOWER RANGE (Ground Floor)
CALCUTTA-700 012

A/c. Ambassador
Non A/c. Ambassador
A/c. Contessa
} ON CAR HIRE

With best compliments from :

CARRY & TRAVEL

8, MANSATOLA LANE

CALCUTTA-700 023

Phones : 49-6678, 49-7727 & 49-4224

With best compliments of :

Phones : { 26-3020
26-0915

THE CITY EXCHANGE HOUSE
6, BRABOURNE ROAD,
CALCUTTA-700 001

With best compliments from :

MERLINE
130, BAGMARI ROAD,
CALCUTTA-700 054

Dealers :
ESCORTS LTD.
FOR YAMAHA Rx 100

— নিয়মাবলী —

লেখকদের প্রতি

১। 'আভা'তে প্রকাশের জন্য সমস্ত রচনা নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদিকার ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

২। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত রচনা বিবেচনা করা সম্ভব নয়।

৩। বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা নয় এমন লেখক বা লেখিকার রচনা প্রকাশের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হবে।

৪। জাতীয় সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত যে কোন রচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৫। নূতন লেখক-লেখিকার প্রকাশযোগ্য রচনা যথাসময়ে প্রকাশিত হবে।

৬। মিল ও ছন্দোবদ্ধ কবিতাকে সুযোগ দেওয়া হবে।

৭। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৮। উপযুক্ত ডাক টিকিট সঙ্গে না থাকলে কোন পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকদের এক বৎসরের চাঁদা সডাক ২১ টাকা। আজীবন গ্রাহক চাঁদা সডাক ১৫০ টাকা।

২। যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

৩। ভি. পিতে পত্রিকা পাঠানো সম্ভব নয়। গ্রাহকদের চাঁদা মণি অর্ডার যোগে 'আভা' কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

আভা পত্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ সংখ্যা, গ্রন্থ-পঞ্জীসহ

ছাত্র-ছাত্রীদের ও বাংলা ভাষার গবেষকদের সহায়ক।

	মূল্য টাকা		মূল্য টাকা
শরৎ শত-বার্ষিকী সংখ্যা (দ্বিতীয় পর্ব)		আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার সংখ্যা	৪·৫০
ভাষান্তরে শরৎ সাহিত্য সহ	৯·০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র সংখ্যা	১২·০০
নজরুল স্মরণ সংখ্যা	৩·০০	হীরেন বসু সংখ্যা	৭·৫০
ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সংখ্যা	২·০০	আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা	১৫·০০
আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা	৭·৫০	শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সংখ্যা (নিঃশেষিত)	৭·৫০
ভাষাবিদ হরিনাথ দে জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা	৪·৫০	"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব" সংখ্যা	১২·০০
তরু দত্ত স্মরণ সংখ্যা	৪·৫০	অজিত কৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.) সংখ্যা	১২·০০
কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা	৬·০০	শ্রীঅরবিন্দ সংখ্যা	৬·০০
বনফুল শ্রদ্ধার্ঘ সংখ্যা	৬·০০	শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সংখ্যা	৯·০০

"দাদামশাই" কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা ১২·০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : "আভা" কার্যালয়, ৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৬

সূচীপত্র

শারদীয়া ১৪০০ (ইং ১৯৯৩)

P 29181

শ্রীশ্রীদুর্গা বন্দনা—দিব্যেন্দু হালদার

প্রবন্ধ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য—হরপ্রসাদ মিত্র ১১১

পথ চলাতেই আনন্দ—রমেন্দ্র নাথ মল্লিক ১২৬

রবীন্দ্র-জীবনে-সৃজনে ও মননে 'শরণাগতি'—রণজিৎ কুমার সেন ... ১৬০

রজনীকান্তের গান : বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট—বন্ধুমিত্র মজুমদার ... ১৬৮

বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির আসলি চেহারা—জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সর্বধর্ম সমন্বয় বাণী—রামধন দাস ... ২১৩

লোকমাতা রাণী রাসমণি ও ভারতের নব জাগরণ—ডঃ সুধীর বেরা ... ২১১

কাহিনী

কত মরু প্রান্তরে—এ. কে. সেন ১৩৯

রম্যরচনা

জেনারেশনের হাত—নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায় ১০৫

লেখক হওয়ার ঝক্কি—হরি গোপাল চৌধুরী ... ২১৭

লীলা প্রসঙ্গ

একটি আশ্চর্য লীলা—নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২০২

গল্প

সব পেয়েছির দেশ—চিত্রিতা দেবী ১২৯

কনটেসা—কুমারেশ ঘোষ ... ১৩৪

নবজীবন—কালীশঙ্কর মল্লিক ১৭৫

"আগে যদি বুঝতাম"—রমা গুপ্ত ১৯৬

বুদ্ধু—আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৯

নেশার কান্না—সুপ্রভাত লাহিড়ী ... ২০৪

সমীরণ—ডাঃ রামচন্দ্র গুপ্ত ২০৯

তোমাকে-জীবন—বিবেক চ্যাটার্জী ১৩৬

স্মৃতি-বিস্মৃতি—বেহুইন ... ১২৭

অপরাধী—সুনীল কুমার মণ্ডল ২৩৫
নারায়ণ—মীর মহম্মদ জাফর ... ২৪০
গন্ধরাজ—শৈলজা চৌধুরী ২৪৫
সিঁদ কাটা—তপতী চক্রবর্তী ... ২৪৭
নিজের ফাঁদে—সতীদেবী মুখোপাধ্যায় ... ২৫৪

কবিতা

আনন্দময়ীর আগমণে—রমাদেবী বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১১৯
দুটি চোখ—এম, শাহের আলম সেলিম ... ১২৫
সৈনিক হুঁশিয়ার—সুধাংশু ঘোষ ... ১৩৫
ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের পঞ্চাশ বছরে—ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু ... ১৫৯
যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ—কৌশিক ভট্টাচার্য্য ১৯৫
শরৎকাল—ডাঃ রামচন্দ্র গুপ্ত ২০৩
আমি তাকে মা ব'লে ডাকি—নচিকেতা ভরদ্বাজ ... ২৩৩
দিব্যজ্যোতি—জিতেন কুমার দাস ... ২৩৪
পাখি—কিরণশঙ্কর মৈত্র ... ২৩৪
প্রভুকে বসাও সদা অন্তরে—সুনীল কুমার দে ... ২৪৪
রাজপথ—রবি রঞ্জন চ্যাটার্জী ২৪৬
আবিষ্কার—দেবাশিস্ দাশ ... ২৫৩
বিশ্বয়ের জন্মদিনে—স্বপন বুড়োর শুভেচ্ছা ... ২৬২
প্রভাতের উদয়—শ্রীকুমার রঞ্জন ... ২৬৪
"বারমাস্যা"—গৌর গোপাল পাল ... ২৬১
সতর্ক বাণী—মদন মোহন চট্টোপাধ্যায় ... ২৬৩

সম্পাদিকা : রেবা চট্টোপাধ্যায় সহযোগী সম্পাদক : ডাঃ গোবিন্দ দাস চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রণ : কৃষ্ণা আর্ট প্রেস প্রচার সম্পাদক : জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান : আভা কার্যালয় —৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৭৫-৮১৭২

মূল্য—১০ টাকা

CENTRAL LIBRARY

।। শ্রীশ্রীদুর্গা বন্দনা ।।

মহামায়া তুমি, অসুরনাশিনী,
দুঃখ-হারিণী মা।
ত্রিনয়নী তুমি, জগত-জননী—
করো আমাদের ক্ষমা।।

দুর্গা নামেতে, কাটে দুরদশা,
প্রাণ-তরঙ্গে, ওঠ শত আশা।
তোমারি নামেতে, জেগে ওঠে মাগো,
মা-নামের মহিমা ॥

চণ্ডিকা তুমি, জগত-তারিণী,
শিব শক্তির বাণী।
উমা রূপে তুমি, আসিগো ধরায়,
দুর্গতি নাশো জানি॥

রামচন্দ্রের, অকাল বোধন পূজা,
বঙ্গের নাম, দুর্গা মা দশভুজা॥
শত দুঃখের, মাঝে গো আমরা—
পূজি আশ্বিন তোমা॥

দিব্যেন্দু হালদার

দ্বাবিংশতি বর্ষ
সপ্তম-অষ্টম সংখ্যা

আভা

তমসো মা জ্যোতির্গময়

আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৪০০
September & October 1993

আনন্দময়ীর আগমনে

রমা দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘন ঘটার ঘুচলো কালো,
নীল গগনে জাগলো আলো,
বর্ষা শেষে উঠলো হেসে
আনন্দে ভরপুর।
কাশের বনে লাগলো দোলা,
বাতাস বহে আপন ভোলা,
নদীর জলে বাজলো তালে—
আগমনীর সুর॥

আশু ধানের শ্যামলিমায়—
শরৎ রবি সোনা ছড়ায়,
সাজলো ধরা সুবাস ভরা
কুসুম-লতিকায়।
শিউলী ঝরা আলপনাতে—
গিরিসুতার চরণপাতে,
উজল রেখা যায় যে দেখা—
কানন বীথিকায়॥

দশভুজার দশটি হাতে
দশটি ঈষু ঝন্‌ঝনাতে—
আসুর ভীতি বিষাদ গীতি—
মিলায় দূরে আজ।
প্রাণ মাতানো মধুর তানে
শারদীয়ার বোধন গানে—
আকাশ-ধরা আপন হারা,
সাজলো নব সাজ॥
ভুবন ছেয়ে সকাল সাঁঝে—
আগমণীর নূপুর বাজে,
সকল কাজে প্রাণের মাঝে—
হর্ষে ডাকে বান।
মহোৎসবে জগৎ জুড়ে
উঠলো বেজে মোহন সুরে—
দশভুজার মহাপূজার
আনন্দ জয় গান॥

"পূর্ণের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ"

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবন দর্শনের সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করেছেন
রবীন্দ্র স্নেহধন্যা চিত্রিতা দেবী। মূল্য ১৫ টাকা।

"একটি সুন্দর মুহূর্ত" মূল্য ৩৫ টাকা

চিত্রিতা দেবীর অসাধারণ রোমান্টিক উপন্যাস। প্রেম, কাম, ভোগ, ত্যাগ চরম বৈরাগী ও মুগ্ধ ভালবাসার কাহিনী। পটভূমিতে রয়েছে বুদ্ধের সমকালীন ভারতবর্ষের বিশাল প্রেক্ষাপট।

এম সি সরকার এণ্ড সন্‌স। ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য

হরপ্রসাদ মিত্র

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প, উপন্যাস,—তাঁর বেশ কিছু পদ্য রচনা এবং সংক্ষিপ্ত কিছু সাহিত্য-সম্পর্কিত মন্তব্য ছাড়াও তাঁর কিছু দিনলিপি পড়েছেন অনেকেই। যুক্তপ্রদেশের অর্থাৎ বর্তমান উত্তর প্রদেশের জৌনপুর শহরে তিনি তাঁর মাতামহের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ১৭ই চৈত্র ১৩০৫ (৩০, মার্চ, ১৮৯৯) সন্ধ্যা ৭-১৪ মিনিট। তারপর পিতৃগৃহে বিহারের মুঙ্গের শহরে ৩৯ বছর বয়স পর্যন্ত বাস করেন তিনি। কর্মজীবনে তাঁর অনেকদিন অতিবাহিত হয় পুনাতে। সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাপারে তিনি কোনো রকম রাজনৈতিক মতবাদের দলভুক্ত ছিলেন না। তাঁর তিরোধান ঘটে ১১এ সেপ্টেম্বর ১৯৭০। প্রায় চোদ্দ বছর বিপত্নীক জীবন যাপন করতে হয় তাঁকে। তাঁর স্ত্রী পারুলদেবী লোকান্তরিত হন ১১ জুলাই ১৯৮৪ অর্থাৎ ২৬ আষাঢ় ১৩৯১।

৩০-৯-১৯৪৮ তারিখে শরদিন্দু 'মন-কণিকা' নামে তাঁর রচনা-খাতায় লেখেন—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর চার-পাঁচ বছর আগে বনফুলের সঙ্গে একবার অধ্যাপক কালীকিঙ্কর সরকার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান। তখন শরদিন্দুর চার-পাঁচখানা বই প্রকাশিত হয়েছে এবং 'প্রবাসী'তে তিনি লেখেন। বোলপুর থেকে ফিরে কালীকিঙ্করবাবু শরদিন্দুর সঙ্গে দেখা করে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে তিনি জিগেস করেছিলেন শরদিন্দুর বই তিনি পড়েছেন কিনা। রবীন্দ্রনাথ জানান যে, তিনি পড়েন নি। অতঃপর শরদিন্দু রবীন্দ্রনাথকে নিজের 'চুয়াচন্দন' বই পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তাও তিনি 'গ্রহণ করেন নি'। ১৩৪০ সালে তাঁর প্রথম গল্প পুস্তক 'জাতিস্মর' প্রকাশিত হবার পরে রবীন্দ্রনাথকে সেই বইয়ের এক কপি উপহার পাঠিয়েছিলেন। বইটির উপহার-পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ এই কবিতার অংশ লিখে দেন—'বন-বেতসের বাঁশিতে পড়ুক তব নয়নের পরসাদ।' তিন মাস কোনো প্রাপ্তিসংবাদ না পেয়ে ভয়ে-ভয়ে চিঠি লেখেন। কিছুদিন পরে দার্জিলিং থেকে কবির 'ক্লান্ত পোস্টকার্ড' পান। তার মর্মকথা—'আমার অসুস্থ শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমার সেক্রেটারীরা সম্ভবত আপনার বই আমাকে দেন নাই।' রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারীদের ওপর এই কারণে তাঁর সংগত অভিমান ছিল। বাংলা-সাহিত্যের আধুনিক পর্বের কোনো কোনো সমালোচকদের সম্বন্ধেও তাঁর অসন্তোষ ছিল সংগত। মোহিতলাল মজুমদার এবং শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ তিনি এইসূত্রে উল্লেখ করে গেছেন।

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত কলকাতা থেকে পুনা প্রবাসী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—"কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে

আলোচনা করছিল। ইতিহাসের উপকরণে ভারাক্রান্ত নয় অথচ খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস, এইরকম উদাহরণ দিতে গিয়ে একটি ছেলে 'গৌড়মল্লার' উল্লেখ করল। তখনই মনে হল ছেলেটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।" যেমন তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যসন্ধানের আগ্রহ, তেমনি তাঁর গোয়েন্দা কাহিনী-গুলির আকর্ষণ, আবার অনুরূপ মনোযোগ তাঁর সরস গল্পগুলির উদ্ভাবনায়—লেখক হিসেবে তাঁর সম্বন্ধে এইসব কারণেই পাঠকের প্রীতি ও কৌতূহল অব্যাহত ছিল এবং থাকবে।

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮, জুলাই তারিখে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সম্বন্ধে শোভন বসুর লেখা 'গল্প-পরিচয়' ছাপা হয় 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড' কর্তৃক প্রকাশিত 'শরদিন্দু অম্নিবাস'-এর পঞ্চম খণ্ডে। তাতে দেখা যায়—"১৯১৫ সালে (বাংলা ১৩২২ সন) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ষোল বছর বয়সে তাঁর জীবনের প্রথম ছোট গল্প—একটি অলৌকিক কাহিনী—রচনা করেন।" সে গল্পের নাম 'প্রেতপুরী' এবং সেটি প্রথম ছাপা হয় 'পুষ্পপাত্র' নামে এক পত্রিকায়। ১৯৬৪-তে শারদীয়া 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় সেটি পুনর্মুদ্রিত হয়। তাঁর শেষ অলৌকিক গল্প 'কামিনী' ১৯৬৫ তে লেখা হয় এবং 'প্রেতপুরী' আর 'কামিনী' দুটিই 'রঙীন নিমেষ' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর পূর্বোক্ত প্রথম অলৌকিক গল্পেই ভূত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বরদাকে দেখা গেছে। তাঁর প্রথমদিকের ভূতের গল্পগুলির বরদারই কাহিনী। কথক হিসেবে বরদার নিজস্ব এক ভঙ্গি ছিল—শুরুতেই চমকপ্রদ কোনো প্রসঙ্গ অবতারণার পরে গল্প প্রবাহিত হয়। বরদা এক কাল্পনিক চরিত্র। 'গল্প পরিচয়' নামে এই সংক্ষিপ্ত লেখাটির শেষ দিকে দেখা যায় শরদিন্দু বাবু তাঁর জীবনের শেষদিকে বরদার গল্পগুলি নিয়ে একটি সংগ্রহ প্রকাশের কথা ভেবেছিলেন। তাঁর নোটখাতায় এই তথ্য পাওয়া গেছে—

'রক্ত-খদ্যোত' গল্পের শেষ কয়েক পংক্তির ভাবাংশ স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের একটি গল্প হইতে গৃহীত হইয়াছে।

'অশরীরী' লিখিবার সময় গ্য-মোপাসাঁর 'La Horla' নামের গল্পটি মনের পশ্চাৎপটে বিদ্যমান ছিল। উভয় গল্পই ডায়েরীর আকারে লেখা—কিন্তু বিষয়বস্তুতে কোন মিল নাই।

'অশরীরী'কে গ্য-মোপাসাঁর ভাবানুপ্রেরণায় লিখিত বলা যাইতে পারে। অন্য গল্পগুলি মৌলিক।

এই পঞ্চম খণ্ড 'অমনিবাসের' প্রথম একত্রিশটি গল্প অলৌকিক শ্রেণীর। তার পরবর্তী বত্রিশ থেকে আশি সংখ্যক গল্পগুলি মূলত সরস কাহিনী—কৌতুক রসই সেগুলির প্রধান উপজীব্য। অতএব সূচীপত্র অনুসারে শরদিন্দুবাবুর এই অলৌকিক গল্পগুলির নাম ও রচনাকাল যথাক্রমে—প্রেতপুরী ১৬ ফাল্গুন ১৩৩৯-১৯১৫; রক্ত-খদ্যোত-১৯২৯; টিকটিকির ডিম-১৩৩৬; অন্ধকারে-১৩৩৭; মরণ-ভোমরা-৫ পৌষ ১৩৩৮; অশরীরী-১৬ ফাল্গুন ১৩৩৯; সবুজ চশমা-২৬শে শ্রাবণ ১৩৪০; বহুরূপী-১২ ভাদ্র ১৩৪৪; প্রতিধ্বনি-২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫; পঞ্চভূত-১৬ ফাল্গুন ১৩৫৩; আকাশবাণী-৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩; ধীরেন ঘোষের বিবাহ-১৯ বৈশাখ ১৩৫৬; দেহান্তর-৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬; ভূত-

ভবিষ্যৎ-১৬ বৈশাখ ১৩৫৭ ; নিরুত্তর-১১ শ্রাবণ ১৩৫৯ ; দেখা হবে-৭ ফাল্গুন ১৩৬০ ; গুহা-৩১ শ্রাবণ ১৩৬২ ; শূন্য শুধু শূন্য নয়-৫ আশ্বিন ১৩৬৩ ; মধু-মালতী-৩০ বৈশাখ ১৩৬৪ ; চিরঞ্জীব-১৯ বৈশাখ ১৩৬৪ ; মায়া কুরঙ্গী-১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ ; সতী-২৫ পৌষ ১৩৬৪ ; নীলকর-১৮ আষাঢ় ১৩৬৫ ; কালো মোরগ-১৬ ভাদ্র, ১৩৬৫ ; নখদর্পণ-১৫ আশ্বিন ১৩৬০ ; প্রত্নকেতকী-১৮ পৌষ ১৩৬৮ ; ছোট কর্তা-১৯ জুলাই ১৯৬১ ; মালকোষ-৯ আগষ্ট ১৯৬১ ; ফকির বাবা-৮ জানুয়ারী ১৯৬৩ ; পিছু পিছু চলে-১৯ জুন ১৯৬৫ ; কামিনী-৮ আগষ্ট ১৯৬৫ ।

মনোহরণ-সামর্থ্যই যে গল্প-উপন্যাসের প্রধান গুণ, সেকথা অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে তাঁর এক সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় (অমনিবাস ১ম খণ্ড)। বাঙালীর লেখা উপন্যাসে ইতিহাসের প্রয়োগ সম্বন্ধে সেই ভূমিকাতেই তিনি সর্বাগ্রে শশিচন্দ্র দত্তের উল্লেখ করেন, তারপর অন্যান্যদের। উনিশ শতকের মধ্যপর্বে শশিচন্দ্র দত্ত ইংরেজীতে কিছু গল্প লিখেছিলেন ইতিহাস অবলম্বনে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সেই পক্ষেই তাঁর দুটি ইতিহাসাশ্রিত গল্প লেখেন যার মধ্যে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে কতকটা প্রতিবিম্বিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাঁর কয়েকটি গল্প-রোমান্স লেখেন। তারপর শশিচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র রমেশচন্দ্র দত্ত 'রীতিমত ইতিহাস-অনুগত উপন্যাস' লিখলেন। বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রতিষ্ঠিত হোলো রমেশচন্দ্রের কলমেই,—মনে হয়, সুকুমার বাবু এই কথাই বলতে চেয়েছেন। তারপর তিনি লেখেন—'ঐতিহাসিক উপন্যাসেরই খণ্ড ছিন্ন রূপ দেখা গেল হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের গল্পে। তারপর এলেন যদুনাথ ভট্টাচার্য। ইনি বাংলার ইতিহাস থেকে কিছু বীর পুরুষ বেছে নিয়ে কল্পনা সংযোগে উপন্যাস লিখলেন। তা স্বদেশী এবং ঐতিহাসিক হ'ল বটে কিন্তু ঠিক উপন্যাস হ'ল না, অর্থাৎ পাঠকের মন ভোলাতে পারেনি। তার পরে এলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।" রাখালদাসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেখা হয়—"রাখালদাস ইতিহাসের পাঠক ছিলেন না, ছিলেন ইতিহাসের গবেষক এবং ইতিহাসের লেখক। ইনি ইতিহাস বিদ্যাকে অধিগত করেছিলেন, তাই তাঁর উপন্যাসের ঐতিহাসিক মালমশলা টাটকা সবজির মতো স্বাদু। রাখালদাসের উপন্যাস পড়লে ইতিহাস পড়ার ফল হয়। গল্পরসও আছে, কিন্তু সে রস খাঁটি হলেও নবীন নয়। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রেরই জের টেনেছিলেন।" সাধারণ পাঠক কেবল তাঁর 'ময়ূখ' উপন্যাসটিই যোগ্য সমাদরে গ্রহণ করেছেন। তাঁর পরে এলেন শরদিন্দু। সুকুমার বাবুর কথায়—'ইনি ঐতিহাসিক ছিলেন না।' —ছিলেন "ইতিহাস-পিপাসু পাঠক, ভক্ত। আগেকার লেখকদের মতো শরদিন্দুবাবু দূরবীণের চোঙার মধ্য দিয়ে কিংবা নাকে দূরদৃষ্টির চশমা এঁটে ইতিহাস হাতড়ান নি বা খোঁজ চালান নি। ইনি যেন চোখে কনট্যাক্ট লেন্স লাগিয়ে ইতিহাসকে হাতের নাগালে পেয়েছিলেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত শরদিন্দুবাবুর ঐতিহাসিক গল্পের কালপ্রসার। এর মধ্যে কোথাও গল্পের পরিবেশ গল্পরসের তীক্ষ্ণতার হানি করে নি।"

যেমন তাঁর লৌকিক ও-অলৌকিক কাহিনীতে, তেমনি ইতিহাসাশ্রিত গল্প-উপন্যাসে, তেমনি ডিটেক্‌টিভ গল্পেও পাঠকের মনোহরণ-ক্ষমতায় তাঁকে বাঙালী লেখকদের মধ্যে 'অদ্বিতীয়' বল্‌তে ইচ্ছে করে,—কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী',—রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' এবং বেশ কয়েকটি ছোটগল্প প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দেবী' বা 'আদরিণী'—শরৎচন্দ্রের অন্তত 'শ্রীকান্ত'-প্রথম পর্ব,—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মধ্যে ন্যূনপক্ষে 'পথের পাঁচালী', 'দৃষ্টিপ্রদীপ' এবং বেশ কয়েকটি ছোটগল্প, —তারাশঙ্করেরও 'কবি' এবং বেশ কয়েকটি ছোটগল্প, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাস আর তাঁরও কয়েকটি ছোটগল্প, প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-অচিন্ত্যকুমারেরও প্রধানত কয়েকটি গল্পের এবং পরশুরামের ও অন্যান্য কারো কারো মনোহরণ-সামর্থ্য মনে রেখে 'অদ্বিতীয়' বিশেষণটি উহ্য রাখাই সমীচীন। বাংলায় ডিটেকটিভ কাহিনীর ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবের প্রাক্‌কাল সম্বন্ধে প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত ১৩৭৮ সালের ৩রা আশ্বিন লেখেন (অম্‌নিবাস : দ্বিতীয় খণ্ড) প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের দারোগার দপ্তরের প্রসঙ্গ, -পাঁচকড়ি দে'র কথা যিনি অনেক বিদেশী লেখকদের রচনা অবলম্বনে লিখতেন বা অনুবাদ করতেন,—দীনেন্দ্রকুমার রায়ের প্রসঙ্গ যাঁর সঙ্গে পাঁচকড়ি দের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে প্রতুলচন্দ্র লেখেন - দীনেন্দ্রকুমার "বিদেশীদের দেশী সাজ বা নাম পরাননি এবং ঘটনাস্থলও অবিকৃত রেখেছেন।" কেবল তাই নয়, প্রতুলচন্দ্র একথাও উল্লেখ করেন যে, দীনেন্দ্রকুমারের রচনার গুণে -"ছেলেবয়সে লণ্ডনের এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভূগোল শিক্ষার এমন সহজ উপায় আর ছিল না।" —এবং—"তাঁর গোয়েন্দা কাহিনীর জনপ্রিয়তার ফলে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সাহিত্যকীর্তি 'পল্লীচিত্র', 'পল্লীবৈচিত্র্য' তাঁর জীবদ্দশাতেই দেশবাসী বিস্মৃত হয়েছেন।" এইসূত্রে প্রতুলবাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তেরও উল্লেখ ক'রে লেখেন যে বাংলা সাহিত্যে যদিও সায়েন্স-ফিকশনের তিনিই ছিলেন জন্মদাতা, গোয়েন্দা-কাহিনী তিনি লেখেন নি। বরং প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় অন্তত একটি ক্রাইম-ষ্টোরি লিখেছিলেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব এই শ্রেণীর গল্প-উপন্যাসের আসরে আবির্ভাব ঘটে ১৯৩০-এর দশকের প্রথম দিকেই। ১৯৩৩ সালে তিনি প্রথম গোয়েন্দা গল্প লেখা শুরু করেন। 'ব্যোমকেশ'-তাঁরই আত্মপ্রক্ষেপ। একথা তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে বলেছিলেন ১৩৭৫ সালে। কিন্তু তাঁর নানা শ্রেণীর গল্পের কালানুক্রমিক বা বিষয়ানুসারী তালিকা তৈরী করা শ্রমসাপেক্ষ কাজ। কিন্তু তা হলেও এই আলোচনার সেটিই বিশেষ লক্ষ্য নয়। গল্প এবং উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর আবেদনের চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে যা বলতে ইচ্ছে হয়, সেই সিদ্ধান্তটির উপযুক্ত ভাষা খুঁজতে গিয়ে কয়েকটি উদাহরণের ওপর বিশেষ নজর দিতে হচ্ছে,—যেমন তাঁর 'সেতু', 'জাতিস্মর', 'বিষকন্যা', 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ', 'কালকূট' 'রিমঝিম', 'কালো মোরগ', 'বাঘের বাচ্চা', 'ছুরি', 'রক্ত-সন্ধ্যা', 'প্রেমের কথা', 'কানু কহে রাই', 'ইন্দ্রতূলক', 'চুয়া-চন্দন', 'শাদা পৃথিবী', 'ঘড়িদাসের গুপ্ত কথা', 'অষ্টম সর্গ', 'কহেন কবি কালিদাস', 'পিছুডাক', 'পিছু পিছু চলে', 'নিশীথে', 'মায়া কানন', 'শালীবাহন', 'অভিজ্ঞান', 'টিকটিকির ডিম',

'শঙ্করের কাঁটা', 'কামিনী', 'ডেনডেটা', 'শূন্য শুধু শূন্য নয়', ইত্যাদি। খুব ভেবেচিন্তে এই নামগুলি সাজানো হয়নি,—যেমন-যেমন মনে এসেছে, সেইভাবেই দেওয়া হলো। তাঁর গোয়েন্দা-কাহিনীগুলির মধ্যে একমাত্র 'শঙ্করের কাঁটা' দেখা যাচ্ছে এই ত্বরিত তালিকায়। নিশ্চয় তাঁর আরো অনেক গল্প উপন্যাসের নাম সমভাবে সমান উৎসাহে এতে যোগ করা যায়। 'ত্বরিত' এবং বিলম্বিত বা দীর্ঘ-স্থায়ী আবেদনের পার্থক্যের কথা তাঁর নিজেরও মনে এসেছিল একসময়ে। নিজের ডায়েরিতে ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৫২ তারিখে তিনি লেখেন—"আমার সাহিত্য-জীবনে একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা বোধ হয় সকল সাহিত্যিকের জীবনে ঘটে না। আমার লেখার একটা immediate appeal আছে, যাহাকে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার কৌতুকচ্ছলে 'ত্বরিতানন্দ' বলিয়াছেন, তাছাড়া একটি delayed action আবেদন আছে যাহা অনুভূত হইতে সময় লাগে। যেগুলি আমার সত্যকার ভাল রচনা সেগুলি গুণিসমাজে আদর পাইয়াছে রচিত হইবার ১০/১২ বছর পরে।" এছাড়া সাহিত্য-জীবনের ব্যক্তিগত কথা তিনি আরো কোনো-কোনো ক্ষেত্রে জানিয়ে গেছেন। তাঁর 'চলচ্চিত্র প্রবেশিকা' এই ধরণের রচনা।

শরদিন্দু সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা হিসেবে এই কটি কথা এখানে বলে নেওয়া গেল।

দুটি চোখ

এম, শাহের আলম সেলিম

ছোট্ট দুটি চোখ।
এই-ই আনে যুগান্তর—
দেহে, মনে, আঁধারে আলোয়।
এই-ই রচে নূতন জগৎ
নূতন মায়ায় আর নূতন ভাষায়।
প্রতি যুগে দেশে দেশে আধারের বুকে
এই-ই জ্বালে নূতনের আলো।
ছোট্ট দুটি চোখ ;
ছোট্ট করে ভাবি এরে যত—
মুহূর্তে মুহূর্তে সে যে বড় হয়ে চলেছে সতত।

এই চোখে ঝরে জল
অগ্নি উঠে জ্বলি—
এ চোখের গোপন ইঙ্গিতে
লক্ষ লক্ষ প্রাণ দেয় বলি।
এ চোখের বিমল দৃষ্টিতে—
বাঁধা পড়ে মানুষের মন
ছোট নহে এ দুটি নয়ন,
এই চোখে কল্যাণী আছে
এই চোখে রুদ্র এসে নাচে॥

'পথ চলাতেই আনন্দ'

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

তীরভূমিতে বসবাসকারী আমরা সবাই।

জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ—যে দিকেই চলাচল হোক, সে পদচারণায় অথবা সন্তরণেই হোক, এগিয়ে চললেই বিপদ আসবে।

বিপদ, বাধা, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, প্রতিপক্ষ, বিপক্ষ, বিক্ষোভ, বিশৃঙ্খলা, অবাধ্যতা, অসভ্যতা, অশালীনতা ও অনগ্রসরতা—চলমান জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের নিত্য সহযাত্রী।

অর্থাৎ অগ্রগামী জীবনের স্রোতের বিপরীতে পদচারণা বা সন্তরণই যথার্থ ও স্বাভাবিক। প্রতিকূলের বনপথেই মনপথ আবিষ্কার করণীয়।

সেখানে বাধা অতিক্রমের দৌড়ের প্রতিযোগিতার কথা স্মরণীয়। অনেকগুলো বাধাকে দ্রুত টপ্‌কিয়ে পৌঁছোতে হবে আগেই প্রার্থিত স্থলে। আমরা তাই নিত্য প্রতিযোগী বাধা অতিক্রমের দৌড়ের। আমাদের প্রায় সকলেরই জীবন এই দৌড়োদৌড়ির প্রতিযোগীর। যে যত দ্রুত আসন্ন বাধাকে অতিক্রান্ত হতে পাচ্ছে সেই বিজয়ী।

বিজয়ী হওয়া বড় কথা। বিজয়মাল্য বড়ই প্রার্থনার সর্বপ্রতিযোগীরই।

তাই যখনই প্রতিযোগীর কথা আসছে তখনই একাধিক জনের অবস্থিতি পারিপার্শ্বিকতায়।

এবং এই একাধিক জনতার মধ্যের কথা এলেই এসে যায় প্রচলিত প্রবচন—নানা মুনির নানা মত। একে এক কথা, বহুতে বিভিন্ন। বিভিন্ন মতবাদে বিচিত্র মনোভাবের প্রকাশ, বিশ্লেষণের বিচিত্র বিকাশ এবং বিশিষ্ট মনোভঙ্গীর মধ্যে কোনো কাজের একমুখী কাজের বহুবিধ বাধার সম্মুখীনতা। সহজ ঋজুপথ। বিসর্পিল গলিপথে ঘুরপাক খায়। ক্ষুদে গলির কাশীর যেন চোরাপথে ঘটে রূপান্তর।

সহজ বিস্তার অসহজ ব্যাখ্যায় সারাল্য গিয়ে প্রাবল্য দেখা দেয় বাঁক ফেরা নদীর ঘূর্ণী। মনের আর মতের চলে ঘুরপাক।

এমনি ঘোড়াঘুড়ি আর মনকষাকষি থেকে ঘটায় মতান্তরের পথ বেয়ে মনান্তরে।

এখন এই মনান্তর নিয়েই কথা।

মতান্তর তো হবেই।

প্রতিটি মানুষ পৃথক। পৃথক পৃথক তাদের মন। পৃথকভাবে প্রতিজনের মনের গতি। এবং প্রতিজনে পৃথকভাবে ভাবিত। পৃথক অস্তিত্বে প্রতিজনে বিশ্বাসী।

কেউ কারো ছায়া নয়। সবারই স্বতন্ত্র কায়া।

একজন যা ভাবছে, যা করছে তা তার নিজস্ব। কোটিকে গুটিক সাদৃশ্যে মিল একজনের অবয়বে অপরের—এ প্রায় যমজ সন্তানের হয় যদিও, তা ছাড়া হঠাৎ হঠাৎ অদেখার মধ্যেও কদাচিৎ দেখা গেলেও দেখা পাওয়ার মতন। শোনা যায় দেশের প্রধান সমদৃশ্যের অবয়ব সদৃশ্য-পুরুষকে প্রতিপালন করেছেন। সেসব বিশেষ ক্ষেত্রের বিশেষ এক রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনের বিশিষ্ট ক্ষেত্রের কথা। সাধারণ স্বাভাবিক বা সচরাচর দেখার এবং জানার কথায় আসে না। আমরা প্রতিটি মানুষের অবয়ব বৈসাদৃশ্যের কথাই মানী।

একজন আরেকজনের থেকে এই যে অন্য ভাব নিয়ে ভাবনা নিয়ে এবং ভবিতব্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে—তার ফলশ্রুতিও অন্য।

এই ভিন্ন ফলশ্রুতির ভিন্ন স্মৃতি।

কারণ একজন একটি ভাবকে নিয়ে ভাবনা করে, অপর জন অন্য ভাবকে নিয়ে অন্য ভাবনা করে অথবা একই ভাবকে নিয়ে এক-একজন এক-এক ভাবে ভাবনার দিগন্তে হাঁটা দেয়। ফলে একই ভাবের ফলশ্রুতি ভিন্ন-ভিন্ন হয়। একই অঙ্কের ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভ হয়। অথবা বলা যায় সবারই অঙ্কের ভুল হয়ে যায়। কারণ এক অঙ্কের তো একই ফল হবে। এক মন হয়ে অঙ্ক কষলে ফল লাভ হয় নির্ভুল।

আমাদের চাই অঙ্কের ফল নির্ভুল হোক সবারই।

সেই নির্ভুল অঙ্কের ফল লাভ করতে গেলে মনকষাকষির কলঙ্ক থেকে এক অকলঙ্কিত শুভবুদ্ধির কাছে আশ্রয় লাভ প্রয়োজন।

আদতে ভাসা মেঘের মতন ছন্নছাড়া মন সকলের দুর্জনের ছিনিমনি খেলায় বিপথে ও বিপদ হাজিরা দেয়।

ভালোর চেয়ে মন্দের প্রলোভন বেশি সহজ পাওয়া। সেই সহজের পথে এক সহজিয়া টানে ঐতিহ্য—ভোলা চটকদারীর মোহে মোহগ্রস্থতায় অবস্থিতি ঘটে। অবসান হয় বিবেকবোধ ও বিচারবোধ। শুভকর্মপথকে অচেনা মনে হয়, ছলনার মায়াজালে সব সোনার হরিণের লোভে সর্বনাশের দিকে প্রধাবিত হয়। আর শেষে সোনার ডিম প্রসবিণীকে হত্যা করে রাতারাতি কুবীর দখলদারীর খোয়ার-স্বপ্ন বপন করে।

মনের এই আশা কুহকিণীর প্রভাবে সমূলে আসে নির্মূলের উপজীবিকা। জীবন তখন হয়ে ওঠে বলার মতন—'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়?'

এই আক্ষেপ, এই অপসোস—স্বাভাবিক স্বভাবের।

এবং এই বিপদের সম্মুখীন হওয়াটাই অবসম্ভাবী। আসতেই পারে সবার জীবনযাত্রায় চলার ছন্দে-ছন্দে ভালো-মন্দের গতিময়তায়। কিন্তু তাই বলে তাকে নিয়ে ভাবনা করে, ভাবিত থাকা চলে না। শুভমন নিয়ে, শুভবুদ্ধি নিয়ে, শুভকর্ম পথে নির্ভয়ের পথকে অনুসরণ করণীয়। মনে ভাবতে হবে 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে যেন না করি আমি ভয়।'

এমনি নির্ভয়ে নিজের শুভপথে ও শুভ মতে চলাই চলমানতা।

চলোর্মীই জীবন।

চলতে চলতে হবে, টলতে যেন না হয়। চলাচল রাখাই জীবনী। বিবেকানন্দের কথাই সত্যি—বাজারে কুকুরের ঘেউ, ঘেউ থাকেই।

তাই যথার্থ ভাবা আমরা তীরভূমির বাসীন্দা। আমাদের ডাঙায় বাঘ ও জলে কুমীর। আমরা থতমত খেয়েই যাই। আমাদের ভয়-ভাবনাই পরিবেশে-পরিমণ্ডলে। কিন্তু তবু আমরা এক-একজন প্রায়ই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠছি। আমাদের দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থা হয়। আমরা পূর্বাপর তালমান জ্ঞান করতে ভুলে যাই। একটা উদ্ধতা আচারণে চালিত হওয়ার পর্যায় পরিলক্ষিত হয়।

এটা কি স্বাভাবিক ?

বোধ হয় নয়।

নিজের অবস্থায় নিজে একরকম, বহুজনের মধ্যে আবার বহুজনের মধ্যে থেকেই বহুজনের থেকেও অনন্য।

এই অনন্যতা ভালো। কিন্তু তাই বহুজনের থেকে দূরে থেকে নয়, বহুজনতার মধ্যে একজন হওয়ার মানসিকতা মননশীলের।

তবে অসুবিধা প্রজন্মের ব্যবধানে।

এক সময়ের মানুষ একরকম ভাবে, অন্য সময়ের মানুষ অন্যরকম। এই যে মানসিকতার রকমফের, এর ফলে এক যুগের চিন্তা অন্য যুগের সমর্থনযোগ্য না হতেও পারে। এক যুগের আচরণ অন্য যুগের অচল মনে হতেও পারে। এক ভাব অন্য ভাবে ব্যাখ্যাতও হতে পারে অন্য যুগে। তাই যুগের ভাব ও আচরণ যুগান্তের সঙ্গে রূপান্তর লাভ করতেও পারে। এক যুগ অন্য যুগে আনে নতুন সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা। প্রভাতী দেখায় দিনের ছবি যেমন, আগের কাল পরের কালের অগ্রদূত।

আবার 'শিশুর পিতা ঘুমিয়ে আছে সব শিশুরই অন্তরে'। এই শিশুর জাগরণ পরিপূর্ণ মানবিকতায় এবং মানবতার স্বীকৃতিতে।

তাই বলার সুযোগ হয়, মানুষের মনুষ্যত্ব-বিকাশই আত্মপ্রকাশ।

এবং জীবনে চাই কর্ম। তা শারীরিক হোক অথবা মানসিক। না হলে বলা হয়েছে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।

একজন অবসর নিয়ে কাজের বাইরের জন হতে পারে। কিন্তু কাজ নিয়ে কাজের মানুষও হয়ে থাকতে পারে।

আদত কথা কাজের মানুষ হয়ে থাকা। ক্ষুরধার পথ দিয়ে জাগ্রত পদচারণার প্রয়োজন। বলতে পারা—'আমাদের এই পথ চলাতেই আনন্দ।'

সব পেয়েছির দেশ

(গল্প)

চিত্রিতা দেবী

অফিস থেকে ফিরে এসে আজ আর গা ধোয় নি মিরান্দা। বেতের চেয়ারে মাথা দিয়ে খোঁপা থেকে ববারব্যাণ্ডটা খুলে ফেলেছে। চেয়ারের পিঠ বেয়ে কালো চুল ঝুলে রয়েছে। কমলা অনেকক্ষণ কাশ্মীরি কাঠের ট্রেতে চা সাজিয়ে রেখে গেছে। মিরান্দা চা ঢালতে ভুলে গেছে। শুধু চুপ করে বসে থাকাতেই ভালো লাগছে।

ছোট বারান্দাটার একপাশে মাধবীলতার ঝাড়। ভারী চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। বর্ষার আমেজ লাগা বাতাসে ভেসে আসছে মাধবীর মৃদু গন্ধ। অতনু সেদিন বলছিল তোমার নামের সঙ্গে বারান্দা নামটা বেশ মেলে। কিন্তু তোমার এই বারান্দাটা যেমন ছায়া ঢাকা আশ্রয় দিতে উৎসুক, তোমার মনটা কিন্তু সেরকম নয়। এইখানেই হয়েছে অমিল।

"তবে তো ঠিকই হয়েছে", মিরান্দা হেসেছিল। এটা তো অমিলেরই যুগ। কবিতায় তো মিল থাকে না।

—"সত্যি তোমার নামটা কিন্তু বেশ অসাধারণ", অতনু বলেছিল। শুধু অতনু কেন অনেকেই একথা বলে।

মিরান্দা শুনেছে তার জন্মের সময় তার অধ্যাপক দাদু রজতশুভ্র রায় কলেজে "টেম্পেস্ট" পড়াচ্ছিলেন। তাছাড়া সেদিন নাকি সারারাত ঝড়ের দাপাদাপি চলেছিল। আকাশে ঝড়ের আর বাড়িতে মায়ের কান্না। ভোর না হতেই অবশ্য সব শান্ত। দাদু তখনি তার নাম ঠিক করেছিলেন।

সেই দাদু হঠাৎ আজ প্রায় সাত আট মাস হোল, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বীরভূমের প্রান্তে একটি প্রায় গণ্ডগ্রামে গিয়ে বাস করছেন।

বাবা ভাবেন, দাদু বোধহয় তাঁর উপরে রাগ করেই গ্রামে গিয়ে বাস করছেন। মিরান্দা ভাবে, হয়ত সে চাকরি নিয়ে কোম্পানীর ফ্ল্যাটে উঠে আসায় রাগ করেছেন; কিন্তু অনেকেই সন্দেহ করে হয়ত দিদার উপরেই রাগ করেছেন। দিদা কেয়ারও করেন না; বলেন, "বয়েই গেল।"

মিরান্দা ভাবল, এবারে বম্বে থেকে ঘুরে এসেই একবার দাদুকে দেখে আসবে। গাড়ি সে নিজেই চালাতে পারবে, তবে ওদিকটা চেনে জানে এমন কাউকে সঙ্গে নেবার চেষ্টা করবে। অতনু, ধৃতিমান দুজনেই হয়ত সঙ্গ দিতে চাইবে। কিন্তু সেটা একটু বেশী মডার্নিসম্ হয়ে যাবে। দাদু হয়ত ভুল বুঝবেন। তার চেয়ে দিদাকেই ধরে নিয়ে চম্পট দেবে।

মিরান্দার বন্ধুরা প্রায়ই আসে ; অতনু ধৃতমান তো বটেই,—দেবাশীষ, রবিন, কবিতা, রঞ্জিতা, মঞ্জুলিকা। কিন্তু ন'টার মধ্যেই সকলে চলে যায়। মিরান্দা স্পষ্টই বলে দিয়েছে, "তোমাদের সঙ্গে এই আড্ডাটুকু বেশ লাগে, কিন্তু তারপরে আমি একা।"

সত্যি একা থাকতে মিরান্দার বেশ লাগছে। মাঝে ক্যাসেট চালিয়ে ওর প্রিয় গানগুলি শোনে। T. V. তে আজকাল এত বেশী বক্তৃতা থাকে, সে খুলতে চায় না।

ছেলেদের মধ্যে মাঝে মাঝে কেউ কেউ একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে। ও রূঢ় ব্যবহার করে না। কিন্তু আমল দেয় না। এদের কাউকে দেখেই এখনো পুলক, রোমাঞ্চ ইত্যাদি জাগে না। আজকাল রোম্যান্সের দিন বোধহয় ফুরিয়ে গেছে। শুধু তারই বয়স বেড়েছে তাই নয়, যুগটাই যেন বুড়িয়ে গেছে। শেষ অবধি হয়ত সেই মা, বাবার হিসেব কসে পছন্দ করা সুপাত্রটীর গলাতেই মালা দিতে হবে। কারণ বয়স বেড়ে যাচ্ছে ; সকলেই ওকে বলছে, এখুনি যদিও সে একাকীত্বের যন্ত্রণা টের পাচ্ছে না, শীঘ্রই এমন একদিন আসবে, যখন সঙ্গীর অভাবে জীবন শুকনো বিরস হয়ে উঠবে।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে মিরান্দার ক্লান্তি অনেকটা কমে এল। চুলে হাতপ্যাঁচ জড়িয়ে ও ঝুঁকে পড়ে কাপে চা ঢালল। এমন সময় বাইরে কার একটা ছায়া পড়ল। অন্ধকারের ফিকে ভাবটা কেটে গিয়ে ততক্ষণে আরো একটু ঘন হয়ে এসেছে। তার উপরে আর একটা গাঢ় ছায়া দেখা গেল।

মিরান্দা চমকে উঠল,—"কে ?"

অল্প হাসির সঙ্গে উত্তর এল "আমি"।

"কে" ? মিরান্দা হঠাৎ ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল। আলোর সুইচটা টিপতে যাবে, লোকটি তার হাত ধরে ফেলল। মিরান্দা চীৎকার করে উঠল, "কমলা, কমলা"।

অন্ধকারের মধ্যে লোকটী বলল, "তুমি কি এখনো গল্প লেখো, তাহলে আমাকে নিয়ে অনায়াসে একটা ভুতের গল্প লিখতে পার। কিন্তু তুমি বড্ড বেশী ভয় পেয়েছো। আমি শুধু ভুত নয়, বর্তমানও।"

—"হাত ছাড়ো বলছি। তুমি কে ?"

—"তোমার যে প্রেম মরে গেছে আমি তার কঙ্কাল।"

ততক্ষণে কমলা ছুটতে ছুটতে এসে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে।

কমলা—"এ কি আপনি এখানে কি করে এলেন ? আমি যে আপনাকে বললাম এ সময়ে দিদিমণি কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। আপনি কাল সকালে আসবেন।"

—"হ্যাঁ, বলেছিলে বটে, কিন্তু সকালে আমার সময় হোত না, তাই এখনি এলাম।"

—"কিন্তু কি করে এলেন ?"

—"তোমাদের ঐ গেটটা লাফিয়ে পার হওয়া এমন কিছু শক্ত নয়। তারপরে পাশের গলি দিয়ে চুপি চুপি চলে এলাম। তুমি কিন্তু দারুণ বদলে গেছ মিরি।"

মিরান্দা অবাক হয়ে চেয়েছিল। একে কখনো দেখেছে বলে তো মনে হচ্ছে না। তবু কোথা থেকে যেন একটা চেনা পরিবেশ তৈরী হয়ে উঠছে। তার নামকে এভাবে সংক্ষিপ্ত করে কে ডাকতে পারে? মিরান্দা মনের দেয়াল আঁচড়াতে লাগল, যদি কোন ফাঁক দিয়ে আলোর নিশানা মেলে।

হয়ত চেনা কেউ না। অচেনা কেউ ঠিকানা খুঁজে এসেছে। তার নাম তো আজকাল ইচ্ছে করলেই জানা যায়। অফিসের জানা কেউর কাছ থেকে আধচেনা কেউ খোঁজ নিয়ে এসেছে। মিরান্দার আবার একটু ভয় ভয় করতে লাগল। আর ঠিক সেই সময়েই সে হেসে উঠল। কড়া আলোয় তার সাদা দাঁত ঝকঝক করে উঠল। যে পরিবেশটা একটা পরিচিত সুগন্ধে মন্থর হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, তা কে যেন কেউ হঠাৎ ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে দিল।

উঃ কি নিষ্ঠুর! কে তুমি?

"কে তুমি, কে তুমি, কে তুমি?" ভরাট গলায় গানের সুরে হেসে উঠল আগুন্তক।

"ওঃ অগ্নি, অগ্নি, অগ্নি"! অপার বিস্ময়ে চেয়ে রইল মিরান্দা। তার সেই দৃষ্টি দেখে কমলা আস্তে আস্তে ভিতরে চলে গেল।

মিরান্দার দুচোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, "অগ্নি, অগ্নি, অগ্নি; আ অগ্নি, তোমার সে আগুন রং কি করে--"

বাধা দিয়ে আগুন্তক বলল, "এমন ধোঁয়ার মত কালো হয়ে গেল? এই তো"?

—"কি করে অগ্নি, কি করে? আমি তো তোমাকে চিনতেই পারিনি।"

—"তোমার মন নিশ্চয় পেরেছিল মিরি। এখানে এসে একটু বসতে না বসতেই, তোমাদের জানালার পাশের সেই হাস্নাহানার গন্ধ আমার নিঃশ্বাসে ভরে এল। স্মৃতির সহচরী হয়ে গন্ধ ভেসে আসে আগে।

—"মনে আছে আমরা দুজনে মিলে আদর্শ সমাজ, আদর্শ মানুষ গড়ার স্বপ্ন দেখতাম?"

—"হ্যাঁ, আমাদের প্রেম স্বার্থপরের মত শুধু দুজনের জন্যে একটা ভোগের জগৎ তৈরী করতে চায় নি"।

—"মনে আছে কতবার তুমি আমাকে সেই কবিতাটা আবৃত্তি করে শোনাতে, সেই যে 'আমরা দুজনা স্বর্গ খেলে না গড়িব না ধরণীতে—'

—"আমাদের প্রেমে বারবার প্রতিজ্ঞার সুরে ভেসে উঠত, আমাদের জীবন হয় যেন উৎসর্গের ফুল, নৈবেদ্যের থালা—"

—"তবে কেন তুমি চলে গেলে ? কিছু না বলে, কোন চিহ্ন না রেখে, হঠাৎ একদিন কোথায় তুমি উধাও হয়ে গেলে, কেন গেলে ?"

—"তুমি কি কিছু শোনো নি ?"

—"শুনেছিলাম, কিন্তু প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারিনি। শেষে চারিদিকে বিষাক্ত কানাকানি শুনতে পেলাম, তুমি কোন খুনোখুনির রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছো, এককথায় যার নাম উগ্রপন্থা।"

—"তুমি আমার খোঁজ করনি ?"

—'আমি এত রেগে গিয়েছিলাম, তোমার সঙ্গে মনে মনে এত ঝগড়া করেছিলাম, যে বাইরে আর কিছুই করিনি। তোমার সম্বন্ধে সব উৎসাহ যেন এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিলে। তুমি আমাদের সমস্ত স্বপ্ন চুরমার করে দিয়ে পালিয়ে গেলে। এমন পথ বেছে নিলে যেখানে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। আমরা যে ভেবেছিলাম, শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজের সঙ্কীর্ণতা স্বার্থপরতা দূর করব। সেই তুমি কি করে ভাবলে ভয় দেখিয়ে terorise করে মানুষের মনে শুভবুদ্ধি জাগানো যায়। কি করে জানলে তোমাদের মতটাই ঠিক ? কি করে জানলে হাতে ক্ষমতা পেলে তোমরাও এখনকার ক্ষমতাবানদের মত বদলে যাবে না। খুন করে সমাজব্যবস্থা পাল্টাবে ? হত্যার রাজনীতি ?" মিরান্দা হাঁপাতে লাগল।

অগ্নি বলল,—"তোমাদের শ্রীকৃষ্ণও তো যুদ্ধের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছিলেন।"

মিরান্দা—"যুদ্ধ আর গুপ্তহত্যা এক নয়। এইসব মতবাদ একটা থেকে আর একটায় স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়। দেখছ তো পাঞ্জাবে কি হচ্ছে। যে পাঞ্জাব একদিন বিরাট মোগল সৈন্যর সঙ্গে লড়েছিল। যারা একদিন 'অকালনিরঞ্জন' বলে গর্জে উঠেছিল, তারা আজ গুপ্ত হত্যায় মেতেছে। নিরস্ত্র নারী হত্যা, শিশু হত্যা অনায়াসে চলছে। বিন্দুমাত্র পাপবোধ নেই। কারণ সামনে ঝুলছে একটা ফাঁকা মতবাদের ধুয়ো"।

অগ্নি অল্প অল্প হাসছিল; এখন বলল, "রাগলে তোমাকে দারুণ দেখায়। তুমি দেখছি এখনো ছেলেমানুষ আছ।

মিরান্দা উত্তেজিত হয়ে বলল, "অত হাল্কাভাবে কথা বোল না। এটা হাসির কথাও না, হাল্কা কথাও না। আমার জীবনের এক বিরাট অংশ ছুরি দিয়ে কেটে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, যেদিন শুনলাম, তুমি নিজের হাতে—উঃ। সেদিন তোমাকে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে চেষ্টা করলাম, এবং কয়েকমাসের মধ্যেই সফল হলাম। বছর গড়াতে লাগল, তুমি আমার কাছে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে।"

শুনতে শুনতে অগ্নির মুখ থমথমে হয়ে এল। সে বলল, "জানি আজ আমি তোমার কাছে মৃত। তোমার সতেরো বছর বয়সের প্রেম আজ সাতাশ বছরে আর ফিরে পাবে না। কিন্তু তুমি যদি কোনদিন এরকম হারিয়ে যেতে, আমি ছাড়তাম না। আমি তোমার খোঁজ করতে

সারা পৃথিবী ঘুরতাম। আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনতে প্রাণ দিতে পারতাম। তুমি হচ্ছ সেই জাতের মানুষ, যারা মানুষকে ভালোবাসে না, শুধু আইডিয়াকে ভালোবাসে। আমি চলি।" অগ্নি উঠে দাঁড়ালো।

মিরান্দা দুহাতে মুখ ঢেকে বসেছিল; আর হাতের ভিতর দিয়ে চোখের জল টপ টপ করে পড়ছিল। এবারে মুখ থেকে হাত খুলে ভাঙা গলায় বলল, "কোথায় যাবে? কেনই বা এসেছিলে।"

—"যদি এগারোটার গাড়ি ধরতে পারি, ফিরে যাব। আর এসেছিলাম একটা চিঠি দিতে।"

—"চিঠি? কার চিঠি? দাও!" মিরান্দা হাত বার করল।

অগ্নি তার ঝোলার ভিতর থেকে একটু খুঁজে একটা চিঠি বার করে দিল।

খাম খুলে মিরান্দা চিঠি বের করল,—রজতশুভ্র রায়ের লেখা,—"দিদি। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিকে পাঠালাম। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ও নিজের ও পথের ভুল বুঝতে পেরে পথ থেকে সরে আসতে চায়। সেই অপরাধে ওর সঙ্গীরা ওকে খুনের দায়ে লুকিয়ে ধরিয়ে দেয়। প্রায় পাঁচ বছর ঘানি টেনে ও পালাতে সক্ষম হয়। তারপর থেকে পথই ওর সঙ্গী। তবু সারা ভারত ঘুরে কোথাও পথের নিশানা পায় নি। মৃত্যুর পথ সোজা। ছোট্ট একটা ছুরি কিম্বা পিস্তল; মুহূর্তের উত্তেজনা। জীবনের পথ দীর্ঘ। বহু ধৈর্য্যে তাকে আবিষ্কার করতে হয়। নানা দেশ ঘুরে শেষকালে বীরভূমের কাছে একটা গ্রামে এসে ও ভাবল পরীক্ষা করে দেখবে, এ সমাজে এখনো বাঁচার পথ খোলা আছে কিনা। ওর কাছে সব শুনে আমি গ্রামটী দেখতে গেলাম; এবং তখনি গ্রামটীকে পুষ্যি নিলাম। গ্রামটী বেশ বড়। বেশীর ভাগই অবশ্য আদিবাসী। এইখানে একটা 'সব পেয়েছির দেশ' তৈরী করতে সুরু করেছি, যেখানে সবাই সবাইকে প্রীতির চোখে দেখবে। স্বার্থ এবং অর্থ পরস্পরের প্রতিযোগিতায় মানুষের শ্বাসরুদ্ধ করবে না। এই কাজে অগ্নি আমার ডান হাত। তুমি যদি বাঁ হাত হতে চাও তো চলে এস।"

চিঠিটা হাতে নিয়ে মিরান্দা বিহ্বলভাবে অগ্নির দিকে চেয়ে রইল।

কমলা এসে বলল,—"দিদি যাবে না?"

মিরান্দা বলল,—"হাঁ। তাড়াতাড়ি আমাদের দুজনকে কিছু খেতে দাও। তারপরে ছোটো সুটকেসটায় এক সপ্তাহের মত কিছু শাড়ি জামা ভরে দাও।"

—"সে কি কোথায় যাবে?"

—"দাদু ডেকেছেন।"

—"এই রাতে?"

—"হাঁ।" আজই গাড়িতে পেট্রল ভরেছি ট্যাঙ্ক ভর্তি করে।"

কনটেসা

কুমারেশ ঘোষ

ঝকঝকে বিরাট 'কনটেসা' মোটরখানা কোনঠাসা হয়ে নয়, বরং বেশ বুক ফুলিয়েই দাঁড়িয়েছিল রাজপথের ধারে।

গাড়ির মালিক চিরঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অফিস সামনেই সাততলা বিল্ডিং-এর তিনতলায়। সেখানে সে-ও সেদিন বুক ফুলিয়েই অফিস করছিলো।

সেদিন ঠিক অফিস করছিলো না, অফিস করার ভাণ করছিলো।

কারণ মন পড়েছিল তার পাম অ্যাভিনিউ-এ রুমা লাহিড়ীর কাছে।

কথা আছে, আজ শনিবার হাফ-ডের পরেই দু'জনে যাবে ডায়মণ্ড হারবারের দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। একটা ফাঁকা মনোরম জায়গা দেখলে সেখানেই তারা নেমে যাবে, খাবে, গল্প করবে, নাচবে গাইবে। যাবার সময় পার্ক স্ট্রীটের কোন রেষ্টুরেন্ট থেকে প্যাটিজ, স্ন্যাকস ইত্যাদি কিনে নেবে। ফ্লাস্কে কফি তো থাকবেই।

কিন্তু কিসে যাবে তারা?

রুমা জানে চিরঞ্জীব তার অ্যামবাসেডারটা নিয়ে আসবে। যেমন এনে থাকে।

না। চিরঞ্জীব জানায়নি রুমাকে যে, সে তার অ্যামবাসেডারটা বদলে কিনেছে কনটেসা-টা।

বলেনি, রুমাকে চমকে দেবার জন্যই।

রুমা দেখে বলবে, কী সুন্দর গাড়ি। কার গাড়ি? তোমার?

চিরঞ্জীব হেসে বলবে, মনে তো হচ্ছে, ঠিক বলতে পারচিনে। এ সংসারে কে কার বলো? এ 'কার'-ই বা কার জন্যে কে জানে!

জবাবটা খুব যুৎসই হবে। না?

আচ্ছা, এ অবস্থায় অফিসের কাজে কারো মন বসে? না, বসতে পারে? চিরঞ্জীবেরও বসেনি।

'কনটেসা' খানার দরজার কাঁচ কালো।

নতুন ফ্যাশন। ভেতর থেকে বাইরের সব কিছুই মেঘলা মনোরম স্নিগ্ধ দেখায়। অথচ বাইরে থেকে ভেতরের কিছুই দেখা যায় না। প্রকাশ্য রাস্তায় গাড়ির মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে থাকলেও ক্ষতি নেই। কী মজার কলই না বেইরেচে!

মজার কল বা ব্যাপারই বটে!

ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল অরুণ। কারখানায় কাজ করে। বয়স ২৫/২৬. পরণে ধোপদুরস্ত পাজামা রঙীন সার্ট। হঠাৎ 'কনটেসা' মোটরখানা দেখে থমকে দাঁড়ালো। দাঁড়ালো তার দরজার সামনে। দরজার কালো কাঁচে চমৎকার তার চেহারাটা ফুটে উঠেছে। যেন আর্শি।

মোটরের দরজার কাঁচের আর্শির সামনে বেশ সটান হয়ে দাঁড়িয়ে অরুণ তার সার্ট আর কলার টেনেটুনে ঠিক করলো। ঘাড়টা কয়েকবার এদিক ওদিক বেঁকালো। না, ভালোই দেখাচ্ছে। বুক পকেট থেকে ছোট্ট একটা চিরুণি বার করে মাথার চুলগুলোকে আঁচড়াতে লাগলো, তেড়িটা বাগালো যত্ন করে! হুঁ, এতক্ষণ খুঁতখুঁত করছিলো মনটা।

ভাবলো, যাক, ভালই হলো। চেহারাটা একবার দেখে নেওয়া গেল। টেড়িটাও বাগানো হলো।

শেষে সে চললো কাছেই বস্তিতে পদ্মরাণীর সঙ্গে দেখা করতে।

কথা আছে আজ ওরা দুজনে সিনেমায় যাবে রিক্সায়।

আর কনটেসা-টায় আর্শির কাজ সারা গেল।

অরুণ বেশ বুক ফুলিয়েই চললো।

সৈনিক হুঁশিয়ার

শ্রীসুধাংশু ঘোষ (জামসেদপুর, বিহার)

শিয়রে দাঁড়িয়ে শমন ডাকিছে সৈনিক হুঁশিয়ার,
ভারত ভূমিতে মড়ক লেগেছে কষে ধর হাতিয়ার।
নির্য্যাতিতের ক্রন্দন ধ্বনি দিকে দিকে শিহরণ,
সৈনিক তুমি, দাঁড়িয়ে রবে কি-আনিবেনা জাগরণ।

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত বীর নাহি ভয় নাহি ভয়,
শত্রু দলনে শাণিত কৃপাণ শত্রু করিবে ক্ষয়।

দলিত মথিত ভারতের মাটি বিভক্ত করেছে যে জন
তোমরা তাদের করিও না ক্ষমা সে নহে আপন জন।

শত শহিদের বিদেহী আত্মা কাঁদিতেছে শোন ঐ
তোমরা এখনও ঘুমিয়ে রবে কি তোমরা জাগিলে কই?
স্বাধীন ভারতে নব জাগরণ তোমরা আনিবে ডেকে,
বিদেহী আত্মা শান্তি লভিবে মুখরিত দিকে দিকে।

তোমাকে-জীবন

বিবেক চ্যাটার্জী (নাসিক)

তোমাকে লিখছি। তোমাকে লেখার উচ্ছাশার নাগরদোলায় চড়ে কখন যে তোমারই রাজ্যে প্রবেশ করেছি নিজেই জানিনা। একগাদা সাদা কাগজে কালি ঢেলে আর কলম কামড়ে বসেই আছি। লেখা কিছুই হয় না। চিঠি যেন ঘুমোতে চায়। আমার চোখের পাতা দুটো একে অপরের সংস্পর্শে এলেই তোমার মুখখানা জলছবির মতো ভেসে ওঠে পর্দায়. চোখের স্ক্রীনে। তোমার সাথে কথা বলার এইই হয়তো সহজতম মাধ্যম। আজ দোলপূর্নিমা, আকাশে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। ইচ্ছে হচ্ছে সারা রাত জেগে চাঁদের আলোয় পুরোনো কথা বলি। তোমার প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস আমার কপাল ছুঁয়ে যাচ্ছে. তোমার প্রত্যেকটি স্পন্দন আমাকে আন্দোলিত করছে। অথচ তোমাকে ছোঁয়ার উপায় নেই। আমি তোমার উষ্ণ, অবর্ণণীয় গন্ধ অনুভব করছি, যা আমার কোষের মধ্যেকার প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু কে বিব্রত করে তুলছে। তবু তুমি থেকেই নেই। আমার ধরাছোঁয়ার গণ্ডীটা আসলে ভীষণই সীমিত। তোমাকে পেতে গেলে হয়তো গণ্ডীটাই বড় হতে হবে, সে কি আমার সাধ্য ?

যে অন্ধ, দৃষ্টিহীন, সে তো জানে এই রঙীন বর্ণময় পৃথিবীর কিছুই সে কোনদিন দেখতে পাবে না। তবু তার ইচ্ছে হয়। স্বপ্ন তবু সে মনে মনে দেখে। একটি মুহূর্তের জন্যও যদি সে এই রঙীন সংসারের সামান্য স্বাদও পেত, তবু তার সান্ত্বনা থাকত। ফুটপাথের পাশে ছেঁড়া ন্যাকড়া মুড়ি দিয়ে যারা জীবন কাটায়, তারা যদি একটি রাত্রির জন্যও যদি মনুমেন্টের সমান একটা বাড়ীতে ঘুমুতে পারত, হয়তো জীবন সার্থক হতো।

আমি তা চাই না। কারণ গণ্ডীটাই যে সীমিত। সীমিত মন নিয়ে আর যাই হোক ভালোবাসা যায় না।

বিশ্বাস করো—এ আমার জীবন নয়। আমি জানি একে জীবন বলে না।

তুমি বলো—আত্মনির্ভরতার কথা, বাঁচার কথা, জীবনের মূল অনুভূতির কথা, ভালোবাসা, আনন্দ, সুখ আরো কত কি। তুমি বল—দেহাতীত প্রেমের কথা।

কিন্তু হতাশা আর দুঃখ যার গলার মালা, সে তো নির্ভরতাকে দেখে চমকাবেই। জানো—মানুষকে আমার বড় ভয়। তাই তো আমি আমার অস্তিত্বকে প্রায়ই খোয়াই।

তোমাকে জড়িয়ে ধরে একবার অন্ততঃ জয়ের স্বাদ পেতে বড় ইচ্ছে করে। তোমাকে বুকে পেয়ে সমস্ত কলংকের বোঝা মাথায় নিয়েই এগোতে চাই।

সেদিন তোমার জন্মদিনে তোমার সামনে নিজেকে বার বার কেমন যেন বোধ হচ্ছিল। ওই কালো ছায়াটা—অনবরত আমাকে তেড়ে বেড়ায়।

সবার স্নেহ ভালোবাসা থেকে দূরে বন্ধুত্বের মতো শ্রেষ্ঠ আস্বাদ ভুলে সবকিছুকে হারিয়ে তোমাকে আঁকড়ে ভেবেছিলাম জীবনযুদ্ধে জয়ী হবো। সেটা যে আমার দুঃস্বপ্ন বই আর কিছু নয়। আসামীর কাঠগড়ার সামনে আসামীর যে অবস্থা—আমারও হতভাগ্যের একই করুণ পরিণতি।

বুঝছি—স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত .হতভাগ্যের কিছুই থাকতে নেই। একটা জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিলেও বুঝি সে আগুনও হেসে উঠে নিভে যাবে। তোমার জন্যই এই পৃথিবীকে নতুন করে ভালো লাগছে। আমি বাঁচতে চাই, আমি ভালোবাসা চাই, ভালোবাসতে চাই। একদিন সমুদ্রমন্থনে উত্থিত বিষ ধারণ করে মহাদেব নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন, আজ আমি একবার প্রেমের কলংক বিষ ধারণ করে নীলকণ্ঠ হবো। তুমি বিশ্বাস করো—আমার সমস্ত অনুভূতি তোমায় ঘিরে। বিবর্ণ বিষন্ন মুহূর্তে তোমার দেখা পাওয়ায় মনে হতে লাগল, এতদিন কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো মহাশূন্যে তিল তিল করে জ্বলে পুড়ে মরছিলাম, তোমার সান্নিধ্য আমাকে আবার জীবন দিল। ভাঙাচোরা নোনা ধরা বাড়ীকে মেরামত করে কালার ওয়াশ করলে যেমন সুন্দর দেখায়, মনে হয় আমিও তেমনি বদলে গেলাম।

তুমি বোধ কারি জান—মানুষের জীবনের গতিপথ ও গতিবেগের পরিবর্ত্তন হয় মাঝে মাঝেই। আমার জীবনে তোমার আবির্ভাবের আগে এমন বিশ্রী ঢিমেতালে চলছিল, আজ সে গতির পরিবর্ত্তন হয়েছে। তোমাকে পাবার নেশায় আমি এত মশগুল, যে চিন্তাভাবনার বাইরে আমি।

মনের আকাশ থেকে অনিশ্চয়তার মেঘ কেটে যেতেই জীবনে আমার এক জোয়ার এসেছে। হারাবার ভয় আমার আর নেই। ভালোবাসার প্রথম অধ্যায়ে তোমাকে পাওয়া ছাড়া আর কোন চিন্তাই আমার মনে স্থান পেতনা। বিশ্ব সংসারের এই আনন্দমেলায় তুমি ছাড়া আর কাউকে ভাবতে পারি না, অন্য কারো অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি না। আসলে চিন্তাভাবনা যখন বাস্তবে রূপ নেওয়ার জন্য ছটফট করে তখন আমাকে খুব ব্যস্ত বোধ করি। কিন্তু এই তোমার চিন্তাভাবনার স্বপ্ন যখন ভেঙে খানখান হয়, তখন নিজেকে জীবনবিচ্যুত বোধহয়।

জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতে উত্তীর্ণ হয়ে এইটেই শুধু বুঝতে পারলাম, যে সুখ, দুঃখ পেতেই হবে। এর থেকে কারো মুক্তি নেই। সমস্ত দুঃখকে হয়তো ভোলা যায় না, তবু জয় করতেই হবে, অন্ততঃ বাঁচার জন্য। সবাই দুঃখ জয় করে, কেউ দুদিনে, কেউ দু বছরে। পৃথিবীর দিকে মুখ তোলো, দেখবে নিদারুণ গ্রীষ্মের পর ঝরঝর বরষা, পচা ভাদ্রের পরেই নির্মল শরতের আনন্দ।

ভেবেছিলাম—একথা তোমাকে লিখবো না। তবু শেষ পর্যন্ত আমার মন, আমার আবেগ —আমি হার মানলাম।

এই পৃথিবীতে একলা থাকার অনেক আনন্দ, তবু দুঃখটাও কম নয়। কোন আদর্শ বা প্রিয়পাত্রের জন্য দুঃখকষ্ট সহ্য করা যায়, কিন্তু নিজের জন্য একাংশও অসহ্য। যে মানুষ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেও কারোর এক ফোঁটা চোখের জল পড়বে না, তার বাঁচা কিজন্য? বিশ্বাস করো—এ আমার মনের কথা - দেবদাস যেন কাওকে হতে না হয়, পার্বতীর বেঁচে থাকার তবুও সান্ত্বনা আছে, কিন্তু দেবদাস? হায়!

ঔদার্য্য আর ভালোবাসার ক্ষীণ অমৃতধারা ক্ষীণতম হলেও আমাদের বেঁচে থাকার ওইটুকুই আনন্দ। এই মধুর অনুভূতি যেন আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরের আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অতল সাগরের দিকে, কোন এক অজানা হিল্লোলে, যেন হারিয়ে ফেলেছি আমার অতীত, ভবিষ্যত আর বর্ত্তমানের শিহরণ জাগানো দিনগুলোকে। অবুঝ মনটা কিছুতেই বোঝেনা, বারণ শোনে না, বার বার স্মরণ করে দেয় আমার মানস মন্দিরের লুপ্ত ঈপ্সাকে, যেন হাহাকার করে কেঁদে ওঠে আর নিঃশব্দ আব্দার করে আমার কাছে।

নিশুতিরাতে জানলার একটুকরো ফাঁক দিয়ে যখন লক্ষ মণ্ডলের দিকে চেয়ে থাকি, মনের অজান্তেই ভেসে আসে তোমার স্মৃতি, জীবনের সংলাপ, অতীতের ফেলে আসা দিনগুলো, কথা, অভিমান, সমস্ত নাটক।

তারপর ঘুমিয়ে পড়ি। গভীর অবচেতনে আর তারই আনন্দধারায় চলে বর্ত্তমান জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, বেদনাময় গতি। সব যেন মায়ার বাঁধন। সমস্ত কিছু ফেলে সামনে তাকাই। তোমাকে দেখি, যেন ভোরের শিশিরে ভেজা ……।

শিহরিত হই। কেঁপে উঠি। সমস্ত বাস্তবতাকে ছেড়ে দূরে সরে যাই আমাদের ভবিষ্যত পথের দিকে, কিন্তু কি অদ্ভুত বলোতো—না জানা যে কোন মিলন দেবতা মিলিয়ে দিল দুটো মনকে আর দুজনকে সমান ভাগে ভাগ করে দিল প্রেম।

কামনা আর বাসনা—এটাই জীবন নয়। মাঝে মাঝে এ হৃদয় অন্য কিছু পেতে চায়। আর এই চাওয়া থেকেই পাওয়ার সৃষ্টি, যার শেষ নেই, ধ্বংস নেই, ক্ষয় নেই, অমর হয়ে থাকে চিরকাল। তাই তোমার আমার চাওয়া পাওয়ার মধ্যে অন্তহীন বন্ধন রয়ে যায়, যা হারিয়ে যাবে না নদীর স্রোতে। জীবনটাকে যদি যুপকাষ্ঠের কাঠগড়ায় বিচার করি, তাহলে উত্তর পাবো—তোমার প্রেমময় জীবন শুভ, তাই অজানা মুখোসটাকে খুলে নিয়ে এগিয়ে চলি স্রোতের প্রবল টানে, দুজনে দুজনকে কাছে পেতে। এটাই তো পাওয়া, যে পাওয়ার অন্ত নেই, শেষ নেই।

মানুষের সৃষ্টিই তো তাই। জীবনের সমস্ত পাওনা মিটিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া, ঘুম ভেঙ্গে যায়, রেশটুকু রয়ে যায়। কিন্তু এর শেষ কোথায়?

সারা জীবন শুধু এক থেকে আর এক। শেষ চিহ্ন শুধু একফোঁটা কান্না নয়তো মুক্ত ঝরানো হাসি।

কত মরুপ্রান্তরে

(কাহিনী)

—এ. কে. সেন

রাজস্থানের মরুভূমি পশ্চিম দিগন্তে যশোলমীর রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে, সিন্ধুপ্রদেশের ভিতর ঢুকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট মাইল পর্যান্ত বিস্তৃত। তারপরে ধীরে, ধীরে, তার রুক্ষ প্রকৃতি বদলে যেতে সুরু করলো। হঠাৎ সিন্ধুনদীর অববাহিকার পূর্ব্বপ্রান্তে প্রায় একশ, দেড়শ মাইল কিংবা, তারও কিঞ্চিৎ বেশী দূরে এসে থমকে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে রুক্ষ মরুভূমি যতই সিন্ধুনদীর নিকটবর্ত্তী হতে লাগলো, ততই সবুজ গাছপালা, শস্য শ্যামলাই হ'য়ে উঠতে লাগলো। সিন্ধুনদীর পশ্চিম প্রান্তে, প্রকৃতি শস্য শ্যামলা সবুজ প্রান্তর প্রায় দেড়শ মাইল কিংবা তারও কিঞ্চিৎ বেশী বিস্তৃত ভূখণ্ডের 'পর আবার ধীরে ধীরে প্রকৃতি রুক্ষ ধূসর মরুভূমিতে পরিণত হলো। যতই পশ্চিমে অগ্রসর হবে, ততই প্রকৃতি রুক্ষ, বালুকাপূর্ণ গভীর হ'তে গভীরতর মরুভূমিতে পরিণত হল, বেলুচিস্থানের সীমানার ভিতরে। রাজপুতনার মরুভূমির আর বেলুচিস্থানের মরুভূমির প্রকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য না থাকলেও, দৃশ্যগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য চোখে পড়ে। বেলুচিস্থানের বালির উপরে অজস্র মসৃণ উপলখণ্ড বিছানো যেটা রাজস্থানের মরুতে বিশেষ দেখা যায় না। আর একটা বৈচিত্র দেখা যায় যে রাজপুতনা মরুভূমির বুকে উটের খাদ্য —এক প্রকার কাঁটাগাছের ঝোপ যদিও। বেলুচি মরু হতে অনেক কম। মাইলের পর মাইল শুধু বালু আর পাথরের নুড়ি। লোকজনের সংখ্যা খুবই কম, তাও যেখানে প্রকৃতির নিয়মে সামান্য জলের ব্যবস্থা আছে, তাকেই ঘিরে ঐ জলের চারিদিকে কিঞ্চিৎ গাছপালা আর মাটীর ঘর, উট আর গাধা—ছোট্ট একটি গ্রাম বা জনপদ গড়ে উঠেছে। বেলুচিস্থানের অভ্যন্তরে অর্থাৎ পশ্চিমের দিকে যতই এগোনো যাবে, প্রকৃতি ততই কঠিন রুক্ষ। বেলুচিস্থানের পশ্চিমে ইরান। হিন্দুকুশ পর্ব্বত মালার দক্ষিণাংশ মোটামুটিভাবে ইরাণ ও বেলুচিস্থানের মধ্যে সীমানা রেখা বলা চলে। ঐ পর্ব্বতমালার উভয় পার্শ্বে প্রকৃতির খেয়াল কিঞ্চিৎ বেশী মাত্রায় জলের ব্যবস্থা থাকায়, লোকজনের বসতি দেখা যায়। আবার দক্ষিণে আরব সমুদ্রের তীর হ'তে পঞ্চাশ ষাট মাইল পর্য্যন্ত ভূমির প্রকৃতি সামান্য ভিন্ন। উত্তরে আফগানিস্থান ও হিন্দুকুশের উচ্চ জটামালায় ঢাকা। উত্তর অংশে মধ্য এশিয়ার হিমপ্রবাহ হিন্দুকুশের অজস্র রন্ধ্র দিয়ে এই অঞ্চলে এসে রুক্ষ রুদ্র প্রকৃতিকে শান্ত ও শীতল করে। এই অঞ্চলের গরমকালের তাপমাত্রা ১০০° - ১০৫° ডিগ্রী মধ্যে থাকে। বর্ষাকাল বোলে কিছু নেই। শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। মাইনাস পাঁচ ডিগ্রী পর্যন্ত হতে দেখেছি। অজস্র তুষারপাত এবং সারা অঞ্চল বরফে ঢেকে যায়। যতদূর দেখেছি, এই অঞ্চলটা প্রায় দেড়শ মাইল চওড়া। বেলুচিস্থানের মধ্যভাগ মরুভূমি। বেলুচিস্থানের প্রকৃতি বড়ই অদ্ভুত। সারা বেলুচিস্তানে বসতি নেই। বোধহয় সেই সময়—পনের কুড়ি লক্ষর অধিক

P 2918 1

লোকের বাস ছিল না। গ্রীষ্মকালে ঐ বরফ গলে গিয়ে জমি আদ্র হয়ে উঠত এবং তখন অজস্র গোলাপ গাছের ঝোপে, ফুলে ফুলে ভরে উঠতো। যেদিকে তাকাও সেদিকেই গোলাপ গাছ। ঐ বন্য গোলাপ ফুলের নির্য্যাস বের কোরে আতর তৈরী করা, ওদিককার একটা বড় অংশ লোকের ব্যবসা ছিল। আর ছিল অজস্র আঙুরের ক্ষেত, আর অজস্র ডালিমের গাছ (আনার), ডালিমের ফুলে চারিদিক লালে লাল। আর আছে বড় বড় জর্দ্দালুর (পীচ্) গাছ। গাছে অজস্র ফল। তরমুজের ক্ষেত। তরমুজ, সর্দ্দা, খরমুজা খেত। গ্রামাঞ্চলে মাইলের পর মাইল এই দৃশ্য। কোয়েটা ও চমনের ফলের বাজার তখন বিশ্ববিখ্যাত ছিল। চমন কোয়েটা হতে প্রায় ষাট মাইল পশ্চিমে, তখনকার ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের সীমানার শেষ জনপথ। ছোট্ট শহর কিন্তু বিরাট ফলের বাজার। কান্দাহার অঞ্চলে যত ফল, সব চমনে এসে জমা হতো। আর বেলুচিস্তানের ফল নিয়ে কোয়েটা হয়ে ট্রেনে সেই ফল লাহোর দিল্লী হয়ে কোলকাতা পর্য্যন্ত আসতো। সপ্তাহে তিন দিন ফলের স্পেশাল ট্রেন ছিল। তখনো এয়ারকণ্ডিশন ট্রেনের ব্যবস্থা চালু হয়নি। তাই ঐ ফল সংরক্ষণের জন্য ঢাই ঢাই বরফের স্তূপ প্রত্যেক ফলের কামরাগুলিতে দেয়া হতো। প্রত্যেক বড় ষ্টেশনেই বরফ দেবার ব্যবস্থা ছিল। মনে রাখা দরকার যে এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই ছিল ফলের মরশুম। আর সে সময় উত্তর ভারতের প্রচণ্ড গরম, লোহার কামরা বন্দী ফলের বাক্সগুলি রক্ষা করতে কী পরিমাণ বরফের প্রয়োজন হতো—সেটা সহজেই অনুমান করা যায়—মনে রাখতে হবে চমন হতে কোলকাতা আড়াই হাজার মাইলের উপর আর উত্তর ভারতের গ্রীষ্মকালীন গরমের ভিতর দিয়ে ঐ ফলের ট্রেন গুলিকে যেতে হ'তো। রেল কর্তৃপক্ষ ঐ ফল যাতে কলকাতা পর্য্যন্ত প্রায় আশী ঘন্টার রাস্তা টাটকা অবস্থায় থাকে, সেজন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করতেন।

কোয়েটা হতে একটি ব্রড্‌গেজ্ লাইন, চমন পর্য্যন্ত চলে গেছে। এই লাইনটিও একটি ইন্‌জিনীয়ারিং বিস্ময়, কারণ কোয়েটা হতে চমনের মাঝ পথে, হিন্দুকুশের এক তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়কে অতিক্রম করতে হবে এবং এই দুরূহ কর্ম্ম ষাট মাইলের ভিতরে করা সহজ কথা নয়—ইন্‌জিনীয়ারিং বিদ্যা প্রয়োগের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনেকগুলি টানেল এবং জায়গায় জায়গায় দুইখানা ইঞ্জিনের সাহায্যে এই ট্রেনটি কোয়েটা—চমন, কোয়েটা যাতায়াত করতো।

আর একটি লাইন কোয়েটা হতে সিধে পশ্চিমে নুস্কি হয়ে জাহিদান পর্য্যন্ত চলে গেছে প্রায় আড়াইশত মাইল রাস্তা। পথে গুটি কত ষ্টেশন মাত্র! জনমানবহীন রুক্ষ ধূসর মসৃণ উৎপলখণ্ড বিছানো প্রান্তরের ভিতর দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা এই ট্রেন যেত। মধ্যে মধ্যে দুই একটি জনপদের আভাস পাওয়া যেত। কিছু সবুজ শ্যামলতাও চোখে পড়তো কিন্তু তাও কদাচিৎ। জাহিদান তখনকার ভারতবর্ষ ও ইরাণের সীমারেখার প্রায় উপরে অবস্থিত। —বোধহয় ইরাণের সীমানার পাঁচ ছয় মাইল ভিতরেই ছিলো। যাতায়াতের কোন বিশেষ বাধানিষেধ ছিলো না। এদিক-কার ট্রেনগুলির সাথে পরিচিত আমরা, কোয়েটা-নুস্কি-জাহিদান বা কোয়েটা - চমনগামী ট্রেনগুলির

অবস্থা কল্পনাই করতে পারবো না। গাড়ীগুলিতে দু-চারজন লোকমাত্র—তখনকার ফার্ষ্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, ইণ্টার ক্লাস, থার্ড ক্লাস গাড়ী থাকা সত্ত্বেও, ক্লাসের কোন বিভেদ সেখানে ছিল না। ন্যূনপক্ষে ছয়ফুট উঁচু পাঠান বেলুচি, স্যালোয়ার কামিজধারী, জরীর কাজওয়ালা ওয়েষ্টকোট, মাথায় বিরাট পাগড়ী. হাতে রাইফেল, যার যে কামরায় খুশী উঠে বসতো। ষ্টেশন ছিল কিন্তু ওদের টিকিট কাটবার বালাই ছিল না। চেকার, টেকার গাড়ীতে থাকতো না। স্বাধীন প্রকৃতির লোক। যথেচ্ছ স্বাধীনভাবে চলাফেরায় অভ্যস্থ বেলুচি পাঠান, ইংরেজদের নিয়মশৃঙ্খলা বা তার ট্রেনগাড়ীর বাধা নিষেধের ধার ধারতো না।

বেলুচিস্তানে তিন জাতীয় লোক আমার চোখে পড়েছে। তার উত্তর অংশে বেলুচি-পাঠান—সবাই নিঃসন্দেহে আর্যাগোষ্ঠি সম্ভূত। বেশভূষা আমাদের পরিচিত কাবলীওয়ালার মতন প্রায়। গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ, উচ্চনাসা, ঘাড়ছাটা বাবরীচুল, চোখে সুরমা আর হাতে রাইফেল অথবা বন্দুক, নিদেন পক্ষে লোহা বাঁধানো মজবুত দীর্ঘ বাঁশের লাঠি। ওদিকে বাঁশ দেখি নাই। ভারতের অন্যান্য স্থান হতে, ঐ বাঁশের লাঠি সরবরাহ করে, অনেক ব্যবসায়ী হয়ত বা ধনী হয়েছেন। অন্য একটি গোষ্ঠী দেখেছি—যারা নিঃসন্দেহে মঙ্গলজাতি উদ্ভূদ্ধ। উঁচু চোঁয়ালের হাড়, ঈষৎথ্যাবড়া নাক. চেরা চোখ, স্বল্প দাঁড়ি গোপ - এদের চিনিয়ে দেয়। এই গোষ্ঠীর লোক কিন্তু তখনকার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের—বর্ত্তমান পাকতুনীস্থানে, চোখে পড়েনি। আর একটি গোষ্ঠী লোক দেখেছি যারা প্রায় দেখতে আমাদের মতন, তাদের ভাষা "ব্রুহুই"—পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি (ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়) যে এই ভাষার সাথে তামিল ভাষার যথেষ্ঠ সাদৃশ আছে।

বেলুচিস্তানে শতকরা আটানব্বই অংশ মুসলমান হলেও, প্রত্যেক গ্রামে, গঞ্জে বা সহরে হিন্দু বেলুচি তখনও বাস করতো। এদের জীবিকা ছিল চাকরী দোকানদারী। ব্যবসা-বাণিজ্য আর সুদের কারবার। এদের সবাই বলতো শেঠ এবং তারা মুসলমান বেলুচিদের সাথে স্বচ্ছন্দে মিলে-মিশে নিরাপদেই থাকতো। এদের ভাষা, পোষাক পরিচ্ছদে বিন্দুমাত্রর পার্থক্যও ছিল না। না বললে বোঝবার উপায় ছিল না হিন্দু কি মুসলমান।

এরকম এক হিন্দু বেলুচি ভদ্রলোকের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে বেলুচিস্থানে অনেক হিন্দু দেবস্থান নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। সে সব জায়গায় দেবস্থানে সিন্ধু, রাজপুতনা, গুজরাট, পাঞ্জাবের অনেক হিন্দু তখনও তীর্থ করতে যেতেন। তার মুখেই প্রথম হিংলাজের কথা শুনেছিলাম। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি আমায় বললেন যে লুস্কি হতে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ মাইল দুরে একটি হ্রদ আছে এবং সেই হ্রদে বোধহয় ভেরা নামে একটি নদী এসে মিশেছে। সেই সঙ্গমস্থলে একটি বহু প্রাচীন দেবস্থান আছে, যেখানে তখনও অনেক হিন্দুযাত্রী তীর্থ করতে যেতেন।

শুনে আমার বড় কৌতুহল হ'ল। আমার বাঙ্গালী বন্ধু বান্ধব দু-চারজনকে এই দেবস্থানের কথা বললাম এবং আমার সহযাত্রী হতে অনুরোধ করলাম কিন্তু কেউই সেই অজানা অচেনা দুর্গম অঞ্চলে আমার সহযাত্রী হতে রাজী হলেন না, তাই একদিন দুর্গা বোলে জাহিদানগামী ট্রেনে একাই চেপে বসলাম। সময়টা ছিল এপ্রিল মাস—ইষ্টারের ছুটি।

কোয়েটা হতে নুস্কি প্রায় সত্তর আশী মাইল রাস্তা। বেলা এগারোটা নাগাদ ট্রেন নুস্কির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে প্রায় বৈকাল পাঁচটায় নুস্কি পৌঁছিল। পথে মধ্যে মধ্যে ষ্টেশন ছিল বটে কিন্তু সে সব ষ্টেশনকে আমাদের পক্ষে ষ্টেশন ভাবা মুস্কিল। ষ্টেশন মাষ্টার, লাইনস ম্যান, ষ্টেশন ঘর, সিগন্যাল ইত্যাদি রেলষ্টেশনের যাবতীয় বস্তুই আছে কিন্তু আমাদের পরিচিত কোলাহল ইত্যাদি কিছুই নাই। পান, বিড়ি, ফেরিওয়ালা, পানিপাড়ে ইত্যাদি কিছুই নেই। জনবিরল মাঠের মাঝে ষ্টেশন—দুচারজন পাঠান বেলুচি এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে—হয়ত বা দুচারজন যাত্রী ওঠানামাও করেছে কিন্তু সবই যেন মৃত বা স্বপ্নপুরী মত। জায়গায় জায়গায় মাইলের পর মাইল সবুজ প্রান্তর। সেখানে মেয়ে পুরুষ ক্ষেতে কাজ করছে। ভেড়া, উট, গাধা চরছে। বড় বড় জরদালুর গাছ—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। দূরে কিন্তু ধূসর ন্যাড়া পাহাড়-তৃণগুল্মহীন। তারপরেই হয়তো ধূ ধূ করছে গাছপালা শূণ্য জনমানবহীন, মাইলের পর মাইল বিশাল প্রান্তর। বালি আর পাথরের নুড়ি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না! মধ্যে মধ্যে উঁচু নীচু পাহাড়। কিছু বাদ বাদ লাইনের পাশ দিয়ে দেখা যায় সারিবদ্ধ উট পরস্পরের সাথে দঁড়ি বাঁধা—পিঠে মালের বস্তা, আর তার সাথে মানুষ হেটে যাচ্ছে। ছোটবেলায় মরুভূমির বুকে সার্থবহ দলের যে ছবি দেখেছি ঠিক সেইরকম।

নুস্কি ওদিককার একটি বড় বস্তি। প্রায় হাজার বিশ পঁচিশ লোকের বসতি। রেলষ্টেশন, পুলিশ ষ্টেশন, পোষ্টাফিস ইত্যাদি সবই আছে। মোটামুটি একটা বড় গণ্ডগ্রামের চেহারা। সরকারী বাড়ীগুলি ছাড়া প্রায় সব বাড়ীই মাটির দেওয়াল ও মাটির ছাদ। সবই ঝকঝকে, তকতকে। সরকারী দিকটাতে পাথরের নুড়ি বিছানো রাস্তা। গ্রামের ভিতরে কাঁচাপাকা রাস্তা।

ষ্টেশনে নেমে আমি রেলওয়ে ওয়েটিংরুমে আশ্রয় নিলাম। ষ্টেশন মাষ্টার ভদ্রলোক—পাঞ্জাবী মুসলমান—অতি সজ্জন ব্যক্তি। তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। ওয়েটিংরুমের দরজা খুলে লোকজন ডেকে কোথা থেকে একটি নেয়ারের খাটিয়া জোগাড় কোরে, ওয়েটিংরুমে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং যতদিন ইচ্ছা, ততদিন এখানে থাকতে পারি সে কথাও জানিয়ে দিলেন। নিজের বাড়ী থেকে, বিছানাপত্র এনে শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং যতদিন থাকবো, ততদিন ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ীতেই খাবার ঢালাও নিমন্ত্রণ কোরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে হাত মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লাম। একটু বাদেই এক পুলিশ অফিসার এসে হাজির হলেন এবং আমার নাম ধাম গোত্র আসবার উদ্দেশ্য

ইত্যাদি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নানাবিধ প্রশ্ন করতে লাগলেন। বাঙ্গালী জেনে আরও উৎসাহের সাথে প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি কৌতুকভরে যথাযোগ্য উত্তর দিচ্ছিলাম আর ফাঁকে ফাঁকে তার সাথে গল্প করছিলাম। ভদ্রলোক উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি সব সময় বলছিলেন যে তিনি কর্ত্তব্যের খাতিরে এইসব প্রশ্ন করছেন এবং খোঁজ খবর নিতে বাধ্য হচ্ছেন। আমি কৌতুকভরে যথাযোগ্য উত্তর দিচ্ছিলাম আর ফাঁকে ফাঁকে তার সাথে গল্প করছিলাম। আমি অবশেষে আমার ইন্‌ডিয়ান আর্মি আইডেনটিফিকেশন কার্ড ও আসবার সময় বেলুচিস্তানের এজেন্ট জেনারেলের দপ্তর হতে যে পরিচয় পত্রখানি সংগ্রহ করেছিলাম, সেগুলি ঐ পুলিশ অফিসারের হাতে তুলে দিলাম। ভদ্রলোক সেই কাগজ দুখানি দেখে সলজ্জভাবে আমায় ফেরৎ দিয়ে বললেন যে আগে ভাগে দেখালে, তাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করতে হতো না। আমি তাকে বললাম যে তার সাথে আলাপের জন্যই আমি আমার পরিচয় পত্রাদি আগে দেই নাই। এতে লাভ হলো যে তার মত একজন সজ্জন ভদ্রলোকের সঙ্গ পাওয়া গেলো। এখন আমরা দুজনেই পরস্পরের "দোস্ত" হলাম। তিনি আমাকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন। যতদূর মনে পড়ে, তার নাম ছিল, সইফুদ্দিন কিজিলবাস—উত্তর পশ্চিম এবং পাঞ্জাব সীমান্তের তক্ষশীলার (Taxila) অধিবাসী। তিনি আমার আসবার কারণ শুনে, আমি যাতে সেখানে যেতে পারি, তার বন্দোবস্ত ও উপযুক্ত সঙ্গীর ব্যবস্থা কাল সকালেই করে দেবেন একথা বলেই বার বার ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিলেন।

ওদিকে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে বাঙ্গালীর উপর ওদিককার জনসাধারণের একটা বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। বাংলার বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপ অতি, অতিরঞ্জিত হয়ে ঐসব দুর্গম অঞ্চলের জনসাধারণের কানে পৌঁছেছিল। ওদের ধারণা ছিল যে বাঙ্গালীমাত্রেই বন্দুক পিস্তল নিয়ে ঘোরাঘুরি করে এবং সাহেব দেখলে গুলি করে। আমি কয়টি সাহেব মেরেছি—এ প্রশ্নের সম্মুখীন আমাকে অনেকবার হতে হয়েছে এবং ভাষাজ্ঞানের অভাবে প্রশ্ন বুঝতে পারি নাই এই ভান করে এড়িয়ে গেছি। কলকাত্তাইয়া লোকের উপর ওদের জনসাধারণের কি শ্রদ্ধাই না ছিল—সেটা না দেখলে ঠিক বোঝা যায় না।

এখানে বলে রাখা দরকার যে কোয়েটা—চমন বা কোয়েটা—নুস্কি জাহিদান রেলপথ দুটি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রস্তুত হয়নি। কোয়েটা বোলান গিরিবর্ত্তের মাঝখানে ইংরাজরা সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সেখানে একটা বড় সৈন্যনিবাস স্থাপন করেছিল। চমন খোজাক গিরিবর্তের মুখে। খোজাক গিরিবর্ত্ত দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে গেলে কোয়েটা ছাড়া পথ নাই তাই কোয়েটায় বড় রকমের সৈন্য ছাউনী ইংরেজরা তৈরী করেছিল। ঐ পথ দিয়ে বহিরশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা ইংরেজদের সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত করে রাখতো। উত্তরে স্বাধীন আফগানীস্থান, পশ্চিমে স্বাধীন পারস্য অর্থাৎ ইরান।

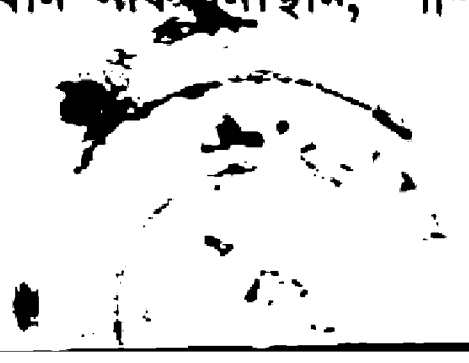

কোনটাই প্রবল নহে কিন্তু ঐ উভয় দেশের উত্তরে প্রবল পরাক্রান্ত রুশ সাম্রাজ্য। ইংরেজরা রুশের ভয়ে ভীত ছিল এবং সন্দেহ করত যে কোন দিন না কোন দিন রুশ আফগানিস্থান বা ইরানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে পারে। তাই খোজাক ও বোলান গিরিবর্ত্তের মুখে সিংহদ্বার আগলিয়ে রেখে বিশাল ক্যান্টনমেন্ট্ বা সেনাছাউনী।

ভারতে ঢুকবার অন্য একটি রাস্তা খাইবার গিরিবর্ত্ত এবং তার দ্বার আগলিয়ে পেশোয়ার (হিন্দু যুগের পুরুষপুর) সৈন্যছাঁউনী। এই ছাউনীগুলির পৃষ্ঠদেশ রক্ষার জন্য কোয়েটা হতে খাইবার পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড বহু ছোট বড় সেনাছাউনী ইংরাজরা স্থাপন করেছিল। ইংরেজরা কখনই উত্তর বা পূর্বদিক হতে ভারতবর্ষ বহিশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে বিশ্বাস করত না এবং সেজন্যই ভারতরক্ষার যত ব্যবস্থা, সবই প্রায় উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাঞ্জাব হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তর প্রদেশে, সিন্ধু বেলুচিস্থানে তৈরী করেছিল। যদিও রুশ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নাই কিন্তু গত বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন এবং ইংরেজের যথেষ্ট পরিমান সমর সম্ভার ঐ কোয়েটা মুস্কি, ভাহিদা, রেলপথ দিয়ে ইরাণে এবং সেখান হতে মটর লরীতে রাশিয়ায় পাঠানো হয়েছে—জার্ম্মানিকে সামলাবার জন্য—বস্তুত পক্ষে এই রাস্তাই ছিল রাশিয়াকে সাহায্য করবার একমাত্র সোজা রাস্তা। কারণ আর কোন সিধে রাস্তা স্থলপথে মিত্র শক্তির হাতে ছিল না। যদিও তখন এপ্রিল মাস তবুও ঐ দিকটায়, তখনও বেশ শীত। পাহাড়ের মাথার বরফ কেবল গলতে সুরু করেছে। রাত্রে দুখানা কম্বল চাপিয়ে শুতে হয়েছিলো। ওদিকে সূর্য্য বেশ দেরীতে ওঠে, তবে সাড়ে ছটা, সাতটা নাগাদ ফরসা হয়ে যায়। সূর্য্য আরও পরে ওঠে। কোলকাতা হতে সময়ের ব্যবধান প্রায় দুঘন্টা মত। বিকালে নটায়ও অন্ধকার হয় না। ভোর বেলা ষ্টেশন মাস্টার মহাশয়ের দৌলতে একটি লোক এক কেটলী বেলুচি চা ও বিরাট এক মগ নিয়ে—আমার ঘুম ভাঙ্গালো। সেই গরম গরম চা এক মগ পান করে শয্যা ত্যাগ কোরলাম। উঠে দেখি এক বিরাট লম্বা চওড়া বেলুচি দোরের কাছে মেজেতে বসে আছে। আমাকে দেখে সে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো—কমসে কম সাড়ে ছ ফুট লম্বা। কব্জির হাড় আমার প্রায় দেড় গুণ চওড়া। আমি নিজেও নেহাৎ ছোট খাটো ছিলাম না। ছ ফুট লম্বা, চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি। কিন্তু ওর সামনে আমাকে আমার নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছিল। লোকটি আমাকে লম্বা সেলাম ঠুকে পস্তু, বেলুচি, উর্দ্দু, হিন্দুস্থানী—মেশালো ভাষায় যা বললো, তার মর্ম্মার্থ ছিল যে কিঙ্গিল বাস স্যার তাকে আমার নিকট পাঠিয়েছে—মাঈকী স্থানমে নিয়ে যাবার জন্য। সে মাঈকীস্থানের রক্ষক ও সেবায়েৎ। রাস্তা প্রায় তিরিশ মাইল মত। জলদি রওনা না হলে রাত্রে আশ্রয় স্থান পাওয়া মুস্কিল হবে। রাস্তায় কোন ভয় নেই। আর সে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সাহেবের কোন চিন্তার কারণ নেই।

আমি তাড়াতাড়ি প্রাতঃক্রিয়া সেরে স্নান কোরে যাবার জন্য তৈরী হ'লাম। ইতিমধ্যে স্টেশন মাষ্টারের বাড়ী হতে প্রায় এক ডজন প্রায় এক ফুট ব্যাসের তন্দুরী রুটি ও সেরটাক মাংস

জলযোগের জন্য এসে হাজির। আমার পক্ষে অত খাওয়া অসম্ভব তাই দুতিনখানা রুটি খেয়ে, বাকী সব ফেরৎ দেবার চেষ্টা কোরলাম কিন্তু মাঈকী স্থানের পূজারী বাধা দিল এবং বাকী রুটি ও মাংস প্যাক কোরে সযতনে নিজের ঝোলায় নিয়ে নিলো। স্টেশন মাস্টারের নিকট হতে বিদায় নিয়ে, সেবায়েতের পিছন পিছন দুর্গা নাম নিয়ে রওনা হলাম। মাষ্টার ভদ্রলোক আমার সাথীকে দেখে বললেন যে ঠিক লোকই পেয়েছেন। আমার আর চিন্তা নেই—পরশু বিকেল পর্য্যন্ত আপনাকে আবার আশা করব।

আমার সাথী ৺মাঈকীর সেবায়েতের নাম মহম্মদ শা, সে কিন্তু আমাকে বলেছিল যে তার নাম মহম্মদ শা শায়োস্তা বিদ্। শুনে চমকে উঠেছিলাম শাস্ত্রী উপাধি শুনে। কারণ ইতি পূর্ব্বে কোন ভারতীয়, মুসলমানের পদবী "শাস্ত্রী" শুনি নাই। পরে কাশ্মীরে বহু মুসলমানের পদবী পণ্ডিত মালব্য····ইত্যাদি পদবী শুনেছি। আমার এক কাশ্মীরী মুসলমান বন্ধুরই নাম ছিল "আসলাম মালবা"। তারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব করতো। তাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখেছি যে চাল চলন, খাওয়া দাওয়ার মধ্যে ঐ দিককার ব্রাহ্মণদের প্রভাব প্রচুর পরিমাণে ছিল। তবে নুস্কি অঞ্চলের সবাই সেবায়েৎকে "মহম্মদ শা" বলেই সম্বোধন করতো। কাউকে ওকে শায়োস্ত বিদ্ বোলে ডাকতে শুনি নাই। বোধহয় হিন্দু পারিবারিক পদবীটা সে শুধু যাত্রীদের নিকটে বলতো। মহম্মদ শা আমাকে বলেছিলো যে ধর্ম্মে সে মুসলমান হলেও, জাতিতে সে ব্রাহ্মণ। তার গলায় একটি রুপার চৌকো মাদুলি ছিল। সে সেই মাদুলি দেখিয়ে আমায় বলেছিলো যে ঐ মাদুলীর ভিতরে তাদের "জনাও" অর্থাৎ পৈতে আছে। ঐ মাদুলী বংশানুক্রমে বড় ছেলের প্রাপ্য এবং যে মাদুলী পাবে, তার উপরে পড়বে "মাঈকী" স্তানের দেখাশুনার ভার। দুঃখ কোরে বোলেছিলো তার বাপের আমলে বহুইয়াত্রী মাইকা স্তানে পূজো দিতে আসতো কিন্তু ইয়াত্রী সংখ্যা ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। এখন খুব কমই ইয়াত্রী আসে। তাও বৎসরে একবার কি দুবার এবং সেসব ইয়াত্রীরাও দরিদ্র সুতরাং আদায় পত্র কম। মাঈকীস্তান রক্ষা করা মুস্কিল। কথায় কথায় মনে হল যে বোধহয় ভাদ্র অমাবস্যায় একবার এবং কালীপূজোর সময় একবার কিঞ্চিৎ হিন্দু তখন পর্য্যন্ত ৺মায়ের স্থানে যেত।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে আমি বহু সিক্কি, পাঞ্জাবী, রাজপুত, হিন্দুদের সাথে এসব বেলুচিস্তানের দুর্গম দেবস্থানের সম্বন্ধে আলোচনা করেছি কিন্তু তারা কেউই এসবস্থানের নামও শোনেনি। হিংলাজ বা নুস্কির মাইকী স্থানের নামও শোনে নাই। ধীরে ধীরে তাই এইসব প্রাচীন দেবস্থানগুলি লোপ পেয়ে যাচ্ছে। বেলুচিস্থানে এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এইরূপ বহু হিন্দু দেবস্থান ছিল—যেখানে আমি গিয়েছি—সেগুলি সব তখনই প্রায় বিস্মৃত ও লুপ্ত হতে চলেছে।

মহম্মদ শা আমাকে সিধে কিজিলবাস সাহেবের বাংলোয় নিয়ে গেলো—তার বোধহয় ঐরকমই নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল। কিজিলবাস সাহেব আমাকে সাদরে তার বৈঠকখানায় নিয়ে বসালেন—

নাস্‌তা পানি করতে অনুরোধ করলেন। আমি সবিনয়ে প্রত্যাখান কোরো জানালাম যে ওঠা ষ্টেশন মাষ্টার মশায়ের দৌলতে ওখানেই সেরে এসেছি। তিনি তবুও বিস্তর রুটি গোস্ত—কাবাব, ফল মেওয়া মহম্মদ শাহের হাতে তুলে দিলেন। পথে প্রয়োজন হবে বোলে। তিনি আমায় আরও জানালেন যে মন্দির প্রায় মাইল তিরিশেক দূর। জায়গাটাকে "হামাম মঞ্জিল বলে।" বন্ধুর চড়াই উৎরাই রাস্তা। প্রায় কিঞ্চিৎ অধিক তিন হাজার ফুট উঁচু—বেশ শীত হবে। জিজ্ঞাসা করলেন যে পর্য্যাপ্ত শীতবস্ত্র আছে কিনা? আমি জানালাম যে যা আছে, তাতেই হয়ে যাবে। উনি অনুরোধ জানালেন নুস্কিতে ফিরে. আবার যেন দেখা করি। তারপর তিনি মহম্মদ শাহ্‌কে ওদেশী ভাষায় কিছু উপদেশ নির্দ্দেশ দিলেন। বুঝলাম আমার দেকভালের জন্য। পরে বুঝেছিলাম যে পথে সরকার অনুমোদিত সার্দারদের সঙ্গে, যোগাযোগ রেখে, যেতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে আমার কিছু না হয়। বোধকরি আমার আর্ম্মি আইডেনটিটি কার্ডই তাকে আমার রক্ষার দায়িত্ব এবং এজেন্ট জেনারেলের অফিসের পরিচয় পত্র সম্বন্ধে বেশী সচেতন করে তুলেছিল। এখানে বলা ভাল ঐ সব অঞ্চলকে Non regulated area বলা হতো। অর্থাৎ ইংরেজী শাসন ওসব অঞ্চলে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার মতন শক্ত ও কায়েমী হয়ে উঠতে পারেনি। স্বাধীনচেতা পাঠান বেলুচিরা ইংরেজের আইন, কানুন, পুলিশ, আদালতের ধার ধারতো না। আমাদের জানা ইংরেজের আইন কানুন মানতো না যদিও নিজ নিজ উপজাতীয় আইন কানুন—তা যতই কঠিন বা আপাতদৃষ্টিতে বর্ব্বরোচিত মনে হলেও—অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতো। নিজ নিজ উপজাতীয় মালেক সরদারদের হুকুম মেনে চলতো—ওদিকে ঐ সব অঞ্চলে জায়গায় জায়গায় ইংরেজ স্থাপিত পুলিশ চৌকী ইত্যাদি থাকলেও, তাহার প্রভাব অতি সামান্যই ছিল। ঐ সব উপজাতীয়দের সর্ব প্রকার বিবাদ বিসংবাদ. তাদের নিজেদের আইন কানুন মাফিক ফয়সালা হতো। আর একটা কথা—যে বেলুচিস্তানে কয়েকটি ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য ছিল। যেমন লাস, বেলা, কালাত ইত্যাদি। এইসব দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতই আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন ছিল। ইংরেজেরা এসব ব্যাপারে নাক গলাতো না। সম্ভবতঃ যাতায়াতের দুর্গমতা এর কারণ। কিন্তু যাহাতে এইসব রাজ্যগুলি একত্রে মিলিত হয়ে প্রবল না হয়ে ওঠে, কিংবা কোন বিদেশী শক্তির সাথে হাত না মিলাতে পারে, সেদিকে ইংরেজেরা অতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতো। বেলুচিস্তানে, ভারতবর্ষের বড়লাটের একজন বিশেষ দুত থাকতো। তাকে Agent general বলা হতো। সমস্ত ক্ষমতাই তার হাতে ছিল। তিনিই সব কলকাঠি নাড়তেন এবং তার আপাত দৃষ্টিতে উপদেশ কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আদেশ, যাহাতে ঠিক ঠিক পালন করা হয়, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত করবার জন্য, কোয়েটার ছাউনীতে বিশাল সৈন্যবাহিনী সজ্জিত থাকতো। ছোট ছোট শহরে চমন, নুস্কি, আক্‌মাস্‌—এইসব দুর্গম অঞ্চলেও agent general এর লোক থাকতো—তারা প্রায় সবাই ছেলে ছোকরা তরুণ ইংরেজ। ঐ সব দুর্গম অঞ্চলে যেখানে আমাদের জানিত আইন. কানুন, নিয়ম,

শৃঙ্খলার বালাই নাই। সে সব জায়গায় ছেলেমানুষ ইংরেজ ছোকরাগুলি একা একা শত্রুভাবাপন্ন উপজাতীদের মধ্যে কি করে থাকতো—তা ভাবলে অবাক লাগতো।

সে যাই হোক, কিজিলবাস সাহেবের নিকট হতে বিদায় নিয়ে, মহম্মদ শার পিছু পিছু অজানা অচেনা –হামাম মঞ্জিলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। রাস্তা বলে কিছু নেই—পায়ে চলা পাহাড়ের গা বেয়ে পথ উঠে গেছে। ঐ রাস্তায় মানুষ, গাধা, খচ্চর, ভেড়া ছাড়া আর কিছু যেতে পারে না। ওদিকে ছাগল, গরু বা ঘোড়া আমার চোখে বড় পড়ে নাই। আছে কিনা জানি না। মরুভূমি অঞ্চলে প্রচুর গৃহপালিত উট দেখেছি।

কখন বা কঠিন চড়াই, কখনও উৎরাই, কখনও বা কোন ছোট উপত্যকা পার হয়ে মহম্মদ শাহের সঙ্গে চললাম। মাঝে মাঝে দু একটি গ্রাম, কিছু কিছু ক্ষেত খামার চোখে পড়ছিল। নারী পুরুষ উভয়েই ক্ষেতে কাজ করছে দেখলাম। গাঁয়ের পথে মেয়েরা স্বচ্ছন্দে যাচ্ছে তাও দেখলাম। মেয়েদের পর্দ্দা কোথাও দেখিনি। স্যালোয়ার কামিজে ঢাকা মাথায় ওড়না—এই সাজই মেয়েদের দেখা যাচ্ছিল। তবে মেয়েরা রাস্তায় খুবই কম।

এই উপমহাদেশে বিন্ধ্যপর্বতের চত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে যে বিশাল ভূখণ্ড, সেখানে মেয়েদের মাথায় কাপড় দেওয়া বোধহয় বহু প্রাচীন বৈদিক সময় হইতে প্রচলিত! এর অন্যথা এই সুদুর্গম অঞ্চলেও দেখলাম না। এই প্রথা আমি পাকতুনিস্থানেও দেখেছি। এদানিং অবশ্য উত্তর ভারতের এই প্রাচীন প্রথা ক্রমশই শিথিল ও লুপ্ত হতে চলেছে।

অপ্রাসংঙ্গিক হলেও একটি কথা বলি—বাংলার উলুধ্বনি কি আর্য্যতর সভ্যতার দান? দক্ষিণ ভারতে স্থানে স্থানে আনন্দ উৎসবে মেয়েদের অনুরূপ ধ্বনি করতে শুনেছি। উত্তর ভারতে কিন্তু কোথাও উলুধ্বনি বা শঙ্খধ্বনি শুনতে পাইনি। বোধহয় জায়গায় জায়গায় বেদ অনুরূপ ধ্বনি দেবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়—শঙ্খধ্বনির কথাতো গীতায় পরিষ্কার আছে "পাঞ্চজন্য ঋষিকেশ দেবদত্ত ধনঞ্জয়"

পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মাঃ বৃকোদর····

তবে উত্তর ভারত হতে উলুধ্বনি বা শঙ্খধ্বনি কি করে বিলুপ্ত হলো?

মহম্মদ শার সাথে মাইকি স্থানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। ওর সাথে পাল্লা রাখা ক্রমশঃই দুরূহ হয়ে উঠতে লাগলো। সে লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুতবেগে স্বচ্ছন্দে চলতে লাগলো আর আমি তার পিছন পিছন হাঁপাতে, হাঁপাতে প্রায় ছুটতে লাগলাম। রাস্তা ক্রমশঃই চড়াই হতে লাগলো। পাহাড়ের গা ঘুরে ঘুরে পায় চলা রাস্তা ক্রমশই উচ্চ হতে উচ্চতর হতে লাগলো। লোকজন প্রায় না থাকার মত। দু-চারজন যাদের দেখা মিলল, তাদের সবাই মহম্মদ শাকে চেনে। মধ্যে, মধ্যে তাদের দেখতে পেয়ে মহম্মদ শা দাঁড়িয়ে তাদের সাথে দু-চার মিনিট আলাপ করতে লাগলো। আমার পক্ষে সেটা ভালই ছিল কারণ ঐ অবকাশে আমি জিরিয়ে নিতে পাচ্ছিলাম। তাদের কথাবার্ত্তার ভিতর প্রায়ই "ইন্দি" ইন্দি" অর্থাৎ আমি যে হিন্দু সেকথা জানাচ্ছিলো।

দু-চারবার কলকাতা, কলকাত্তাও শুনছিলাম। আমি যে, যে সে লোক নই, সেটা মহম্মদ শাহ্ তাদের সবাইকে গর্বভাবে জানাচ্ছিল। ঐ সব পথচারীগণও আমাকে সম্ভ্রমের সাথে সেলাম জানাচ্ছিল এবং আমি তাদের "মেহমান" অর্থাৎ অতিথি সে কথা জানাতে ভুলছিল না। ওদের প্রত্যেকের কাঁধেই ঝুলি এবং ঐ ঝুলি হতে খবানি অর্থাৎ শুষ্ক ফল—আমরা যাকে মেওয়া বলি—বের করে আমাকে উপহার দিচ্ছিল আর 'খাও' 'খাও' বলছিল। ওদের ভিতরে একজন অনেকবার নাকি কোলকাতায় এসেছে। তার সুদের কারবার ছিল। সে কিছু কিছু ভাঙ্গা বাংলা বলতো এবং আমায় পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়ে ভাঙ্গা বাংলায় আলাপ জুড়ে দিল।

কোলকাতার কাবুলিওয়ালারা পেশোয়ার—জালালাবাদ অঞ্চলের লোক জানতাম। ওদের মধ্যে যে বেলুচিস্তানের পাঠান সম্প্রদায়ের লোক ছিল—সেটা জেনে বিস্মিত হলাম। সে যাই হোক, এই ভাবে আলাপচারী করতে করতে অভীষ্ট স্থানের দিকে এগুতে লাগলাম। এদিককার পাহাড়গুলিতে কোন বড় জঙ্গল নেই। বড় বড় গাছ, যা হিমালয়ের বা পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের পাহাড়ে দেখা যায় তাহা একেবারেই নেই। তবে স্থানে স্থানে ভর্দ্দালু বা চীর পাইন গাছের সমাবেশ দেখেছি। ওই অঞ্চলে শীতকালে বরফ পড়ে। তবুও পাহাড়গুলি রুক্ষ—স্থানে স্থানে ছোট ছোট ঝোপ আছে। বরফগলা জল যায় কোথায়? কোন নদী নালাও বিশেষ দেখলাম না। দুই একটি ছোট ছোট ক্ষীণ ধারা চোখে পড়ছিলো। সেটা ঐ বিশাল ভূখণ্ডের—যেটা পাহাড়ের উপর থেকে আমার চোখে পড়ছিল—তুলনায় নেহাৎই নগণ্য। তবে এত জল যায় বা কোথায়? আমার ধারণা ঐ অঞ্চলের ভূগর্ভে বিরাট জলসম্পদ আছে। মধ্যে মধ্যে গ্রাম, ক্ষেত খামারও যে চোখে না পড়ছিল, তা নয়। তবে খুবই কম। মহম্মদ শা সারা রাস্তাই কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল—ওখানকার আবহাওয়া. লোকজন, আচার ব্যবহার খাওয়া দাওয়া, বিবাহ, সাদী, এইসব বিষয়ে আমার প্রশ্নের উত্তরে অনর্গল বোলে যাচ্ছিল। তার কতকটা কথা আমি বুঝতে পারছিলাম, কতকটা পারছিলাম না। এইভাবে প্রায় ঘন্টা চারেক পথ চলবার পর একটা ঝরণার ধারে, বিশাল এক সমতল পাথরের চাটানে বিশ্রাম নিতে বসলাম। মহম্মদ শা ঐ ঝরণার জলে হাত পা ধুয়ে পাথরের চাই-এর উপর বসল, আর আমাকেও মুখ হাত ধুয়ে নিতে অনুরোধ করলো। ওর থলির ভেতর থেকে বদনা জাতীয় একটা তামার বাসন বের কোরে জল ভরে নিয়ে এলো তারপর আমাদের দুজনের মাঝখানে ওর ঝুলি থেকে বের করে একটা চাদর বিছালো—বুঝলাম খাবার আয়োজন হচ্ছে। ক্ষিধেও পেয়েছিলো। তারপর ঝুলির ভিতর হতে ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের দেয়া রুটি মাংস এবং কিঞ্জিলবাস সাহেবের দেয়া খাবারগুলো বের করে চাদরের উপরে রাখলো। তারপর আমাকে খেতে ইঙ্গিত করে, নিজে শুরু করলো। আমি একখানা সেই বিরাটাকৃতি রুটি আর কিছু মাংস খেয়েই পেট ভরে গেল। সেই বদনা থেকে ঢক্, ঢক্ কোরে জল খেয়ে, ঝরণার জলে হাত মুখ ধুয়ে এসে বসলাম—কিছু মেওয়া মুখে দিলাম।

কিন্তু মহম্মদ শা বোধহয় ডজন খানেক ঐ রোটী এবং সেই পরিমাণ মাংস খেয়ে, তারপর উঠল। হাত মুখ ধুয়ে এসে ভুক্তাবশেষ খাদ্যগুলি আবার সযত্নে প্যাক করে ঝুলিতে ভরে নিল। তারপর সটান শুয়ে পড়ল। পাথরটা ছায়াবৃত ছিল—প্রাকৃতিক ভাবেই। কিছু মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়াও বইছিল। সময় তখন প্রায় বেলা দেড়টা কি দুটো। মহম্মদ শা আমাকে শুয়ে পড়বার জন্য ইঙ্গিত করতে আমিও শুয়ে পড়লাম। শোয়া মাত্রই ঘুম।

ঘণ্টাখানেক পরেই মহম্মদ শা'র ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখি সে যাবার জন্য প্রস্তুত। আমি তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে যাবার জন্যে তৈরী হ'লাম। তারপর আবার সুরু হলো হাটা। ক্রমশই উপরে উঠছিলাম। চারিদিকে শুধুই উঁচু, নীচু পাহাড় নজরে পড়ছিলো। ঠাণ্ডাও অনুভূত হচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে দূরে দূরে গ্রাম দেখছিলাম। পথেও দু একটা গ্রাম অতিক্রম করলাম। আগেই বলেছি যে মহম্মদ শাকে প্রায় সবাই জানতো, চিনতো। প্রত্যেক গ্রামেই তাকে ঘিরে জটলা হচ্ছিল এবং আলোচনার বিষয়বস্তু যে আমি স্বয়ং—সেটা বুঝতে আমার কোন অসুবিধে হচ্ছিল না কারণ সর্ব সময়েই 'ইন্দি' 'ইন্দি' এই শব্দ শুনছিলাম আর সবাই আমাকে দেখছিলো। সবাই আমাকে অভিবাদনও করছিল। গ্রামের পথে অতি বিরল হলেও দুচারজন মহিলাকেও দেখেছিলাম—ওদের মুখে পর্দ্দা ছিল না। বাড়ীগুলি সবই মাটী ও পাথর দিয়ে তৈরী। প্রত্যেক গৃহস্থের চৌহিদ্দী প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে মেয়েরা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা ঘরকন্নার কাজ করছিল। বোরখা নজরে পড়লো না।

এক গ্রামে মহম্মদ শা সর্দ্দারের বাড়ী নিয়ে গেলো। সর্দ্দার বিশাল আকার পুরুষ, আমার পরিচয় শুনে সম্ভ্রমের সাথে চারপাই ছেড়ে দিয়ে আমাকে বসতে দিলেন। ওখানে আরও পাঁচ ছয় জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তারা সবাই অভিবাদন করে হাত বাড়িয়ে আমার হাত, তাদের দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে 'দোস্ত' বলে সম্বোধন করলেন। বলতে ভুলে গিয়েছি যে পথে যাদের সাথে দেখা হয়েছে, তারাও দোস্ত বোলে আমার হাতে হাত মিলিয়েছে।

পাঠান আর উত্তর বেলুচিস্তানের একটা বড় বৈশিষ্ট এই যে, তারা যাদের সাথে হাত মিলিয়ে 'দোস্ত' বোলে গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য তারা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হবেন না—এমন অতিথি বৎসল জাতিও দেখিনি। অতি দরিদ্র পাঠান বেলুচিও দোস্তরা অতিথি এলে "আও, খানা খাও বোলে অভ্যর্থনা করবে। খানা না খাইয়ে ছাড়বে না। সেটা আধখানা পোড়া রুটিই হোক বা ঝলসানো কিছু মাংসই হোক।

আর একটা কথা। প্রায় সবার হাতেই বন্দুক বা রাইফেল। বন্দুক ছাড়া কোন পাঠান বেলুচি দেখেছি বোলে মনে করতে পারছি না অবশ্য ব্রিটিশ ক্যান্টনমেন্টের বাইরে।

সর্দ্দার কিছুতেই আমাকে চা না খাইয়ে ছাড়লেন না। সন্ধ্যা হয়ে আসছিলো। তার ইচ্ছা ছিল যে রাত্রিটা আমি তার ওখানে থেকে যাই। বারবার সর্দ্দার অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু

মহম্মদ শা কিছুতেই রাজী হলো না। সে সর্দ্দারকে বুঝিয়ে বলায় ফেরার পথে তার সাথে মুলাকাত করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে তবে যেতে দিলেন। আমার মনে একটু একটু ভয় যে না ছিল তা নয়, এই বিদেশ. বিভূইতে, সম্পূর্ণ অপরিচিত পাঠান বেলুচিদের সাথে, মনটা যেন কেমন বাঁধো বাঁধো ভয় ভয় করছিল কিন্তু এই রাস্তায় নেমে প্রথম যে গৃহস্থের বাড়ীতে এলাম এবং গৃহস্বামীর অর্থাৎ সর্দ্দারের সসম্ভ্রম অমায়িক ব্যবহারে আমার মনের ভয় ভাবটা কেটে গেলো। সর্দ্দারের বাড়ী থেকে বের হয়ে আবার গন্তব্যস্থল মুখে রওনা হলাম। গ্রামের বেশ কয়জন লোক আমাদের সাথে সাথে কথাবার্ত্তা বলতে বলতে গ্রামের বাইরে বহুদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন। এরকমটা অন্যান্য গ্রামের পথেও হয়েছে কিন্তু তখন তাদের সাথে স্বচ্ছন্দে মিশতে পারিনি কিন্তু এখন আমি এদের সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দ্দু পস্তু, বাংলা ইংরেজী ভাষায় স্বচ্ছন্দে আলাপ করতে লাগলাম। বিদায় নেবার সময় তারা সবাই সেলাম জানিয়ে যাবার পথে আবার দেখা হবে এই বোলে বিদায় নিলেন। এই সমস্ত লোকগুলো সবাই বলিষ্ঠ কিন্তু অতি সহজ ও সরল। বন্ধু ও অতিথি বৎসল। সবাই আমার সাথে সদ-ব্যবহার করেছে। আমার যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সেদিকে যথাসাধ্য যত্ন নিয়েছেন। ক্রমে অন্ধকার হয়ে গেলো। সেই জনমানবহীন পার্ব্বত্য রাস্তায় আমি ও মহম্মদ শা ছাড়া আর কাউকে কিন্তু দেখতে পেলাম না। পা টন্ টন্ করছিল। চলতে আর পারছিলাম না কিন্তু তবুও কোনমতে নিজেকে হিচ্ড়ে নিয়ে চলছিলাম। মহম্মদ শা বার বার বলছিল "আউর থোড়াদূর সাহাব। চলিয়ে চলিয়ে বোলে আমাকে উৎসাহিত করছিল। উপায় নেই। যেতেই হবে। শীত ক্রমশই বাড়ছিল। হিমেল হাওয়ার তেজও বাড়ছিল। উপায় নাই—। ক্রমে ক্রমে দূরে একটা আলো চোখে পড়লো। ঐটেই হচ্ছে "হামামজাই" বস্তি। মহম্মদ শাকে অনুসরণ করে অবশেষে একটা প্রাচীর ঘেরা বাড়ীতে এসে পৌছলাম। এইটাই হামামজাই সরাইখানা। প্রাচীরের ভিতর ঢুকে দেখি বেশ বৃহৎ একটি উঠান। তার একদিকে অনেকগুলি গাধাখচ্চর ভেড়া ইত্যাদি বাঁধা। অন্যদিকে বড় একটা বাড়ী—যার গঠন পূর্ব্বে দেখা গ্রাম্য বাড়ীগুলির মতন। সেই উঠোনের একধারে অনেকগুলি অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে বহু বেলুচিপাঠান হুক্কাতামাক খাচ্ছে আর গল্প করছে। বাঙ্গালী আড্ডাপ্রিয় জাতি কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় এই বেলুচিপাঠানরাও কম আড্ডাপ্রিয় নয়। সুযোগ আর সুবিধে পেলেই ওরা ঘন্টার পর ঘন্টা গালগল্প কোরে কাটিয়ে দিতে পারে বাঙ্গালীকে হারিয়ে দিয়ে।

মহম্মদ শাকে দেখে প্রায় সবাই আর্ত উল্লাসে এক সাথে সেলাম জানিয়ে তাকে আহ্বান করলো। পিছনে আমাকে দেখে সবাই একেবারে চুপ। মহম্মদ শা উচ্চস্বরে আমার পরিচয় জানিয়ে দিল তারপরেই উচ্চৈস্বরে আমাকে সেলাম জানিয়ে তাদের আড্ডায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ করলো। মহম্মদ শা কারো কথায় কান না দিয়ে, সরাইখানার মালিককে ডেকে আমার জন্য একখানা ভাল ঘর খুলে দিল। ঘরের মেঝে পাথর পেটানো। উপরে একটি মাত্র জানালা আর একখানি

চারপাই। মহম্মদ শা আমাকে হাত পা ধোয়ার বন্দোবস্ত করলো। খাটিয়ার উপর একখানি কম্বল বিছিয়ে দিয়ে আমাকে বিশ্রাম করতে বোলে দরজা ভেজিয়ে চলে গেলো। আমিও চারপাই এর উপর শুয়ে পড়লাম। রাত তখন প্রায় দশটা (I S.T.) কিন্তু দিন রাত্রি হিসাবে, রাত ঘন্টাখানেক মাত্র। সকাল আটটায় পথে নেমেছি আর এখন রাত দশটা। মাঝে ঘন্টাখানেক দুপুরে বিশ্রাম আর ঘন্টাখানেক সর্দ্দারের বাড়ীতে চা-পান ও বিশ্রাম—মোট বারো ঘন্টা এক নাগাড়ে হেটেছি প্রায় চব্বিশ পঁচিশ মাইল ঐরকম বন্ধুর চড়াই, উৎরাই রাস্তায় চলেছি। শক্তির শেষ সীমায় এসে পৌছেছি। কিছুক্ষণ পরেই মহম্মদ শা ঘরে ঢুকে আমার হাত, পা, গা টিপে দিতে লাগলো। বাধা দিলেও মানলো না। বললো তার সাথে এতটা রাস্তা অল্প সময়ে খুব কম যাত্রী পার করতে পেরেছে তাই গা, হাত পা ব্যথা না হয়। এই দলাই, মলাই আমার নাকি প্রয়োজন। সত্যিই ওই বিরাট শক্তিশালী হাতে গা টিপুনীতে, আমি অনেক সুস্থ বোধ করতে লাগলাম। তারপর ও গিয়ে আমার জন্য দু-খানা নান্ রুটি ডাল ও ঝোল আলা মাংসের শবজী নিয়ে এলো। খেয়ে নিলাম। তারপর ও নির্ভয়ে ঘুমুতে বলে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেলো। যাবার সময় কাল ভোর ছটা নাগাদ বেরোতে হবে, সে কথা বলতে ভুললো না।

চারপাইতে শুয়ে এই অভিযানের কথাটা চিন্তা করছিলাম—পরিশ্রান্ত থাকা সত্ত্বেও ঘুম আসছিল না। বাইরে অন্যান্য মুসাফিরদের কথাবার্ত্তা, হাসি, এমন কি গানের রেশও ভেসে আসছিল। ওর ভিতরে মহম্মদ শার কণ্ঠস্বরও শুনতে পাচ্ছিলাম। অদ্ভুত এই পাঠান বেলুচিরা। আগ্নেয় অস্ত্র ছাড়া পথেই বার হবে না কিন্তু দেখলে উগ্র বোলে মনে হলেও বস্তুতঃ কিন্তু ওরা মোটেও উগ্র নয়। কর্কশ বা উগ্রস্বরে কাউকেই কথা বলতে শুনি নাই। ...এদিককার হাটবাজারের রাস্তাঘাটে যে কদর্য্য ভাষায় উচ্চৈস্বরে গালাগালি—মারামারি চেঁচামেচি—যা প্রায়ই দেখা যায়, সেরূপ একটি দৃশ্যও আমার চোখে পড়েনি যদিও সুদীর্ঘকাল আমি ওদের দেশে যত্র তত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। কথাবার্ত্তায় আলাপ ব্যবহারে সংযত, অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ এবং বিদেশীকে সাহায্য করবার প্রবণতা ওদের বোধহয় সহজাত। আমার সঙ্গে কেউ কখন কোন প্রকার অশালীন, অভব্য ব্যবহার করেনি। অথচ এত স্বাধীনতা প্রিয় জাতি আর আছে কিনা সন্দেহ।

ইংরেজদের শাসনে প্রায় একশত বৎসর থাকা সত্ত্বেও ইংরেজরা তাদের বাগ মানাতে পারেনি। সম্পূর্ণ এলাকাটাই নামে মাত্র ইংরেজের অধীন ছিল। এসব কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙ্‌লো মহম্মদ শার ডাকে। চোখ মেলে দেখি মহম্মদ শা ধূমায়িত এক বিরাট মগ চা হাতে দাঁড়িয়ে—উঠিয়ে সাব্, বোলে হাতে চায়ের মগ ধরিয়ে দিলো। বাইরে তখন বেশ অন্ধকার। হাত ঘড়িতে দেখি প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। বেশ ঠাণ্ডা। সবই নিস্তব্ধ। মহম্মদ শার তাড়ায় তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলাম। ওকে বলতে এক মগ গরম জল এনে দিল। মহম্মদ শার সাথে বেরিয়ে পড়লাম ঐ ভোর রাতে। চারিদিক নিস্তব্ধ। মহম্মদ শার কথায় আমার

ঝুলি, এমন কি পয়সা কড়ি সমেত ঐ ঘরে রেখে গেলাম—ফিরবার পথে নিয়ে যাবো। মহম্মদ শা বললে কই ডর নেই সাব।

পথে বেড়িয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই বুঝলাম যে হালকা হয়ে বেরিয়ে কত ভাল করেছি। সিধে চড়াই। অতিকষ্টে হাঁফাতে হাঁফাতে চড়াই ভাঙতে লাগলাম। ততক্ষণে পূর্ব্বদিগন্তে আলো দেখা দিয়েছে। সে পথকে রাস্তা বলা ভুল। পাহাড়ের গা বেয়ে জায়গায় জায়গায় প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হচ্ছিল অতি কষ্টে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক এইভাবে চলার পরে মোটামুটী একটা সমতল ভূমিতে এসে পৌঁছলাম। দেখে মনে হলো যে পাহাড়ের চূড়া কেটে এই সমতল ক্ষেত্রটি তৈরী।

একটু দূরে ছোট পাহাড়ের একটা কুয়াসাবৃত ছায়া চোখে পড়লো আমার সঙ্গী বলে উঠলো "আ গ্যায়া সাব"। জনমানবহীন প্রান্তর।

কিঞ্চিৎ নীচে পাহাড়ে ঘেরা বেশ একটি বড় হ্রদ। লম্বায় আনুমানিক মাইল তিনেক, চওড়ায় মাইল খানেক কিংবা তার কিছু বেশী—মোটামুটী ডিম্বাকৃতি। এই হচ্ছে হামাম মঞ্জিল হ্রদ। যারা নৈনিতাল গিয়েছেন তারা বেশ বুঝতে পারবেন চারিদিক উঁচু পাহাড়ে ঘেরা নৈনি হ্রদের মত। এরকম ছোট ছোট হ্রদ বেলুচিস্তানে আরও কয়েকটি দেখেছি। কোয়েটার কাছেই মাইল দশেক দূরে এমন একটি ছোট হ্রদ দেখেছি। হামাম-মঞ্জিলের হ্রদের গভীরতা কত জানিনা তবে দেখে গভীর বলেই মনে হলো। আর একটু এগিয়ে সেই ছোট পাহাড়টির কাছে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম যে তার গা ঘেঁসে একটি ছোট নদী উত্তর পূর্ব দিক আফগানিস্থান হতে প্রবাহিত হয়ে ঐ হ্রদে ঝরণার মতন এসে পড়ছে আর সেই সঙ্গমের নিকটে একটি ধ্বংসপ্রায় স্তুপ। ঐ স্তুপই হচ্ছে মন্দির। নদীটির নাম আমার পুরোহিত, মহম্মদ শা শাস্ত্র-বিদ্ "বরা" বোলে জানালেন। নদীটির নাম উচ্চারণ বৈষম্যে 'বরাহ'কে বরা বোলে শুনলাম নাতো?

স্তুপটিকে আমার বৌদ্ধ স্তুপ বোলে মনে হলো। শুনেছি আফগানিস্থানের বহুস্থানে বৌদ্ধ স্তুপ ও বৌদ্ধমন্দির আবিস্কৃত হয়েছে। পাহাড় কেটে তৈরী বা পাহাড়ের গায় খোদাই করা বহু বুদ্ধমূর্ত্তি, আফগানিস্থানের যত্র তত্র ছড়িয়ে আছে। এই জায়গাটা হামাম-মঞ্জিল—বিগত ব্রিটিশ বেলুচিস্থান আর স্বাধীন আফগানিস্থানের সীমান্ত রেখার অতি নিকটবর্ত্তী। সুতরাং বৌদ্ধমন্দির হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আমার পুরোহিত মহম্মদ শা শাস্ত্রী আমাকে জুতো মোজা খুলে, হাত মুখ ধুইয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হাতে জল দিয়ে বিচিত্র ভাষায় কিছুমন্ত্র উচ্চারণ করে, আমাকে বার বার অঞ্জলিবদ্ধ জল—আমরা যাকে দেবতীর্থে বলি—সেইভাবে নদীতে অঞ্জলি দিতে বললেন। কয়েকবার এইভাবে জল দিলাম আমার মনে হলো যেন আমাকে দিয়ে পিতৃতর্পণ করালেন। বালির মণ্ড তৈরী ক'রে নদীতে নিক্ষেপ করতে বললেন—পিণ্ডদান নয়তো? তারপরে আমাকে স্তুপের কাছে নিয়ে গেলেন। স্তুপটি খুব বড় না হলেও খুব ছোটও নয়। কিন্তু প্রায় সম্পূর্ণটাই ভেঙ্গে পড়েছে। বোধহয় বিধর্ম্মীর হাতে ধ্বংস হয়েছে। আর যুগ, যুগ ধরে ঐ স্তুপের পাথরগুলো

নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ গৃহনির্ম্মাণের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। সমস্ত স্তূপটি আগাছার জঙ্গলে ভরা। ভাল করে দেখবার উপায় নাই। স্তূপটিকে বেষ্টন করে তিনবার প্রদক্ষীণ করালেন। তারপরে ঐ স্তূপের মধ্যে ভাঙ্গা ভাঙ্গা সিড়ির মতন এক গলিপথ দিয়ে আস্তে আস্তে পুরোহিতের পিছনে পিছনে প্রায় ফুট তিরিশেক উপরে উঠলাম। উঠে দেখি যে একটা গুহার মতন স্থান—তার তিন দিক বেষ্টন করে পাথরের দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে আর তার মাথার উপরে ছাদ তখনও ভেঙ্গে পড়েনি। পিছনের দেওয়ালে পাথরের উপর খোদাই করা একটি মূর্ত্তি। ভেতরটা অন্ধকার। ভাল কোরে বোঝা যাচ্ছিল না। আমার পুরোহিত মহম্মদ শা শাস্ত্রবিদ্ ভিতরে প্রবেশ করে মোমবাতি জ্বালালেন। তারই অস্পষ্ট আলোকে দেখলাম চতুর্ভূজ একটি নারীমূর্ত্তি। দাঁড়াবার ভঙ্গিমা দেখে বৌদ্ধ বজ্রযানের তারামূর্ত্তি বোলে মনে হলো—মূর্ত্তির মাথাটি নেই, তাছাড়া প্রায় অক্ষতই ছিল। একটি স্তনের অর্দ্ধেকটা ভাঙ্গা ছিল। আমাদের পরিচিত কোন হিন্দুদেবীর সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম না। বরঞ্চ দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখে অজন্তা গুহার নারী চিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সর্ব্বাঙ্গে সিন্দুর লেপা। পুরোহিত আমাকে দিয়ে, তার মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে পূজো করালেন—মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে যেন বেশ কয়েকবার "ওঁ" এবং "বজ্রতারা" শব্দটি শুনতে পেয়েছিলাম বোলে মনে হলো। পুরোহিত মোমবাতি দিয়ে আরতি করলেন তারপর সেই শিখা আমাকে স্পর্শ করতে বললেন। সুগন্ধি ধূপকাঠি দিয়ে আরতি করলেন। পূজা উপকরণ একমাত্র বরানদীর জলছাড়া আর কিছুই ছিল না। পুষ্প পত্রাদি নৈবেদ্যাদি—এ সমস্ত ছিল না। পূজা শেষে পুরোহিত যেন মন্ত্র উচ্চারণের সাথে শান্তি বারি আমার মাথায় ছড়িয়ে দিয়ে আমাকে প্রণাম করতে বললেন। মন্ত্রের মধ্যে পরিষ্কার "ওঁঙ্কার" ধ্বনি, "ওঁ স্বাহা" এই দুটি স্বর বার বার বুঝতে পারছিলাম।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ করতে শাস্ত্রবিদ্ মহাশয় বোধহয় মিনিট পনের সময় নিয়েছিলেন। পরিস্থিতিটা চিন্তা করলে এখন আশ্চর্য্য বোধ হয়—পাঠান মুসলমান পুরোহিত স্যালোয়ার কামিজ, ওয়েষ্টকোট, পাগড়ী পরিহিত এক পুরুষ আর আমি অখণ্ড ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে, একযাত্রী অখণ্ড ভারতের পশ্চিম প্রান্তে কোন দেবীর আরাধনা করলাম? চারিদিক নিস্তব্ধ।

ঐ মন্দিরের ধারে কাছে কোন বসতি নাই, বটে তবে কিঞ্চিৎ নীচে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা তখন পর্য্যন্ত ঐ স্থানটিকে "পূণ্যভূমি" বলে, মাঈকী স্থান বিবেচনায় সম্ভ্রম করে এবং যাত্রীরা এলে, তাদের যথাসম্ভব সাহায্য করে। তারা জানে যে প্রাচীনকালে, তাদের পূর্বপুরুষরা এই দেবীর স্থানে তীর্থ করতে হজ্জ করতে যেতেন। যদিও তারা এখন ধর্ম্মে মুসলমান, তথাপি তাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট সম্ভ্রম সমীহ বোধ ছিল।

একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি যে দেবস্থান নির্মাণ করতে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ অতি নির্জ্জন মনোরম স্থান নির্বাচন করতে ভুল করতেন না। এই দুর্গম গিরি প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বার

বার এই কথা মনে আসছিল। উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, যে দিকেই তাকাই, সেখানেই দেখছি পাহাড়ের পর পাহাড়—কোনটা ধূসর, কোনটা শ্যামল—সব নির্জ্জন প্রকৃতি। দূরে আফগানিস্থানের বরফ মণ্ডিত হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার শিখর সমূহ, পশ্চিমে সেই বিশাল হ্রদ। পায়ের তলে বরা নদীর কুল কুল ধ্বনি। সব মিলিয়ে সেই প্রাতে যেন আমার কাছে স্বপ্নলোক সৃষ্টি হয়েছিলো।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম যে বহুযুগ আগে, এই সংঘারামে কত বৌদ্ধ-ভিক্ষু, শ্রমণ, স্থবির বাস করতেন—বুদ্ধং শরণম গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণম্ গচ্ছামি, সংঘম্ শরণম্ গচ্ছামি এই ধ্বনিতে আকাশ বাতাস পূর্ণ হতো। হয়তো বা এই গিরিপথ দিয়েই তারা দক্ষিণ গান্ধার এবং উত্তর ইরাণে বুদ্ধের বাণী প্রচার করতে গিয়েছিলেন। হয়ত বা এই গিরিসঙ্কট দিয়েই আর্য্য, হূণ শক্ জাতীয় লোকও ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলো। যারা মহেঞ্জদরো সভ্যতার পত্তন করেছিলেন, তারা নিশ্চয়ই যদি বিদেশী হন, এই পথ দিয়েই এসেছিলেন। পট পরিবর্ত্তন হল। কনিষ্ক যুগের পরে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আর গুপ্ত সম্রাটদের আনুকূল্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুজ্জীবনের সময়ে হয়তো এই সংঘারাম হিন্দুমন্দিরে পরিণত হয়েছিলো। বজ্রযান বৌদ্ধদেবী বজ্রতারা হিন্দু শক্তি দেবীতে পরিণত হয়েছিলেন। এই স্থানটি সাধন ভজনের উপযুক্ত—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই..... এই সব কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কল্পনা করছিলাম। মহম্মদ শার ডাকে, সাব চলিয়ে,—সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখি যে সে যাবার জন্য প্রস্তুত। বাক্য ব্যয় না করে, তার অনুসরণ করলাম—ফিরে চললাম। তখন প্রভাতের সূর্য্য ঝলমল করছে—বেলা দশটা।

এবার ফিরবার পালা। সরাইখানা যেতে প্রায় বেলা বারোটা বেজে গেলো। মহম্মদ শা জানালো যে যদি আজই যেতে হয়, তবে এখনই রওনা হওয়া দরকার। কারণ পথে আর কোন সুবিধা মতন রাত কাটাবার স্থান নেই। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সরাইখানার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে রওনা হলাম। মহম্মদ শা তার ঝুলিতে ডজনখানেক পেল্লায় বেলুচি রুটি আর সের দুই রান্না করা শুকনো মাংস, সাথে লবণ খানিকটা নিতেও ভুলল না। মহম্মদ শা জানালো যে নুস্কি পৌছতে প্রায় রাত বারোটা হবে, তবে ওদেশের রাত বারোটা খুব বেশী রাত নয় কারণ বিকালে রাত নটা পর্য্যন্ত সূর্য্য আলোর রেশ থাকে। আর ওদিককার লোকেরা অনেক রাত পর্য্যন্ত সরাইখানা, হোটেল ইত্যাদিতে আড্ডা মারে।

তারপর অনবরত পথচলা। মাঝে একজায়গায় ঘন্টাখানেক খাওয়ার জন্য বিশ্রাম নিয়েছিলাম—প্রায় রাত বারোটায় নুস্কির ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম—ষ্টেশন নির্জ্জন কারণ রাত্রে ঐ লাইনে ট্রেন চলাচল করে না। ষ্টেশনের বেয়ারা ওয়েটিংরুম খুলে দিল—দেখি আমার চারপাই আর শয্যা প্রস্তুত। ষ্টেশন মাষ্টারের সৌজন্যে কোন অসুবিধেই হল না। হাতে, মুখে জল দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম—মহম্মদ শা আমার গা হাত পা বেশ কোরে দলাই মলাই কোরে, কাল সকালে আবার আসবে বলে বিদায় নিল। আশ্চর্য্যের কথা এই যে ও একবারও পয়সা কড়ির কথা জিজ্ঞেস

করেনি বরঞ্চ মাঈকীস্থান হতে সরাইখানায় ফিরে এসে, কিছু দিতে চাইলে ও বললো যে তীর্থগুরু হিসাবে তাকে'ত কিছু নিতেই হবে নচেৎ ইয়াত্রীর কল্যাণ হবে না কিন্তু সে পরে হবে।

দুই দিন ওর সাথে ঘুরেছি। এমন সহজ সরল সিধে লোক খুব কমই দেখেছি—অতি নির্লোভ প্রকৃতির। আমার সুখ সুবিধের দিকে তার যত্নের ত্রুটি ছিল না এবং ঐ সব জায়গায় যতটা সম্ভব সবই করেছে। বিনা আহ্বানে নির্দ্বিধায় এসে আমার হাত পা টিপে দিয়েছে কারণ ও জানতো যে এইরকম বন্ধুর পার্বত্য রাস্তায় এতক্ষণ একসঙ্গে পায়ে চলার অভ্যাস আমার নেই। নিষেধ শোনে নাই—এসে আমাকে দলাই মলাই করে চাঙ্গা করে তুলেছিলো। রাস্তায় অনেক কথা হয়েছে—ওদিককার সম্বন্ধে। কত কিংবদন্তী, কি কোরে ওরা মুসলমান হলো তার ইতিহাস, কী কোরে ঐ মাঈকী স্থান ধ্বংস হলো ··· সে আমাকে বলেছিলো। তার কথা কিছু কিছু বুঝতে পেরেছিলাম. ,কিছু কিছু আন্দাজে বুঝেছিলাম আর কতকটা বুঝতেও পারিনি। বার বার বলতে লাগলো হাজার হাজার বছরের পুরোণো এই দেবস্থান আস্তে আস্তে লুপ্ত হতে চলেছে। আগে তার বাপ, পিতামহ'র আমলে অনেক ইয়াত্রী আসতো, সে দেখেছে কিন্তু ক্রমশই সেটা কমে যাচ্ছে। এখন (অর্থাৎ তখন) বছরে পাঁচ সাতশ'র বেশী ইয়াত্রী হয় না। ওর কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল যে বোধহয় ভাদ্র অমাবস্যায় একবার আর শ্যামাপূজার সময় আর একবার—এই দুইবার মাঈকী স্থানে যাত্রী সমাগম হত। যাত্রীদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু বেলুচি পাঠান, আর সিন্ধু. রাজস্থান, গুজরাট হতেই যাত্রীরা আসতেন। মহম্মদ শা যে জাতের ব্রাহ্মণ এবং মাঈর পূজার অধিকারী—একথা সে বারংবার গর্ব্বের সঙ্গে বলেছে। দুঃখের সঙ্গে বলেছে যে, সে গরীব, কী করে এই পবিত্র স্থান রক্ষা করবে? মন্দির ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছে—তার চোখের সামনে কিন্তু সে অসহায়. করবার কিছুই নেই। ওদিককার লোকেরা স্থানটিকে পবিত্র মনে করলেও, রক্ষার দায়িত্ব নিতে রাজী নয়—ধর্ম্মে আঘাত লাগবার আশঙ্কায়। সরকার উদাসীন, তাই এই পবিত্র স্থান ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে, তার জীবিত অবস্থাতেই। বারংবার ক্ষেদোক্তি করতে লাগলো। তার গলায় পবিত্র মাদুলী পুরুষানুক্রমে তার কাছে এসেছে—সেই মাদুলী তার বড় পুত্রকে আনুষ্ঠানিক ভাবে দেবার আগেই বোধহয় এই দেবস্থান সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবে। কোন ইয়াত্রি আসবে না। কেউ মাঈকে পানি চড়াবে না। সব শেষ হয়ে যাবে। এইসব শুনতে শুনতে আমি পথ চলছিলাম আর ভাবছিলাম ক্যাস্পীয়ান সী'র পূর্ব্ব তীর হতে কাপিসা, বাহ্লীক, গান্ধার ইত্যাদি দেশ থেকে ইতিহাসের অমোঘ নির্দ্দেশে হিন্দুসভ্যতা ক্রমে ক্রমে সিন্ধুর পূর্ব্বতীরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিলো। ১৯৪৭ সালের রাষ্ট্রবিপ্লবের পর সম্পূর্ণ সিন্ধু প্রদেশ ও পঞ্চনদের সিংহভাগ মুসলমান রাষ্ট্র অর্থাৎ পাকিস্থান হয়ে গিয়েছে। মুষ্টিমেয় সামান্য কিছু হিন্দু এখন সেখানে আছেন। সম্পূর্ণ ভাবে ইস্লাম রাষ্ট্র। সেখানে ঐসব মুষ্টিমেয় ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হিন্দুদের পক্ষে দেবস্থানগুলি রক্ষা করা অসম্ভব। কয়েকটি শিখ পবিত্রস্থান পশ্চিম পাঞ্জাবে আছে এবং সেখানে ঐ কয়েকজন গ্রন্থি এখনও ধর্ম্মস্থানগুলি আগলিয়ে

আছেন কিন্তু লোকেরার স্বাধীনতা বিশেষ নাই। ঐসব স্থানগুলিতে এখনও ভারত ও পাকিস্থান গভরমেন্টের অনুমতি সাপেক্ষ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শিখ তীর্থ করতে যেতে পারেন। কিন্তু হিন্দু দেবস্থানগুলি রক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। রাওলপিণ্ডি এবং পেশোয়ারে বড় বড় দুইটি কালীবাড়ী ছিল। দুইটিই পাকিস্থান সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন বলে শুনেছি। বহু চেষ্টাতেও তাদের বর্ত্তমান অবস্থা জানতে পারিনি। এইভাবেই লুপ্ত হয়েছে। সরকারের আনুকল্য না পেলে, এইসব পবিত্রস্থান রক্ষা করা যায় না। মহম্মদ শা'র মাঈকীস্থান নিশ্চয়ই এতদিনে. ইতিহাসে হারিয়ে গেছে। আজ আমি কল্পনাই করতে পারি না কোন হিন্দু ইয়াত্রী সেই অতি দুর্গম দেবস্থানে তীর্থ করতে গেছে। মহম্মদ শার ভবিষ্যৎ বাণী নিশ্চয়ই এতদিনে ফলে গেছে। জানিনা মহম্মদ শা তার মাহুলী তার বড় পুত্রকে দিয়ে গেছে কিনা কিংবা তার পুত্র এখনও বছরে দুইবার মাঈকী স্থানে জল চড়াতে যায় কিনা।

ভোর বেলায় ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের লোক চা নিয়ে এসে ঘুম ভাঙ্গালো। তার কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক নিজে এসে তার সাথে তাঁর বাড়ীতে নাস্তা করতে অনুরোধ করলেন। সে অনুরোধ আমাকে রাখতেই হলো। অতি সজ্জন ও অমায়িক লোক। আমাকে যথেষ্ঠ সাহায্য করেছিলেন। দুঃখের বিষয় মাষ্টার মহাশয়ের নামটা মনে নাই ঠিক—বোধহয় আহ্‌মেদ শা মঙ্গোল যদিও তার চেহারায় মঙ্গোলিয়ান ছাপ বিন্দুমাত্র ছিল না। তার কিছুক্ষণ পরে শোয়াস্ত-বিদ্ মহাশয় —বোধহয় শাস্ত্র বিদ হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন এবং আমার গায়ে দরদ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন আরও বললেন "সাব্বাস" দুইদিনে এই পথ যাতায়াত করতে তিনি কোন ইয়াত্রীকে বিশেষ দেখেন নাই—। তারপর আমার গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাদি করলেন। তারপর আমি সঙ্কোচের সহিত দশ টাকার একখানি নোট বের করে, তীর্থগুরু হিসাবে তাকে দক্ষিণা দিলাম। পূর্বেই আমি মাষ্টার মশাইকে এই অভিযানে কত দিলে উচিত হবে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিন চার টাকা দিলেই যথেষ্ঠ। কিন্তু মন মানে নি তাই দশটি টাকা দিয়েছিলাম।

মহম্মদ শা'র মুখখানা হাসিতে ভরে উঠলো। সে আমাকে তার গ্রামে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। সে আগেই জেনেছিলো যে আমি ঐ দিনটি মুস্কিতেই বিশ্রাম করবো। শরীরও ক্লান্ত ছিল। তাই মহম্মদ শা'র কথায় তখন রাজী হতে পারিনি। সে কিন্তু আমার সঙ্গ ছাড়লো না। সে সারাদিনই আমার ফাই ফরমাস্ খাটবার জন্য ওয়েটিংরুমে হাজির ছিলো। কিজিলবাস সাহেব এসে হাজির হলেন। আমার কুশলাদি বিনিময়ের পরে আমার ইয়াত্রা কেমন হলো ইত্যাদি অনেক কথাবার্ত্তা হলো। আমি তাকে বললাম যে আমি আকৃমাস্ হয়ে জাহিদান যেতে চাই। উনি বললেন—মুস্কির পশ্চিমে স্থানীয় অধিবাসী ছাড়া অন্যান্য ভারতীয়দের বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন এবং সেটা এই মুস্কিতে করিয়ে নিতে হয়। আমার প্রোগ্রাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, কাল সকালের গাড়ীতে আমি আকৃমাস্ যেতে চাই। সেখানে বেলা দুপুর, বারোটা নাগাদ পৌছুবো! সেদিনটা ওখানে কাটিয়ে তারপরের দিন ঐ ট্রেন চেপে জাহিদান যাবো।

একদিন জাহিদান থেকে তারপরের দিন সন্ধ্যায় নুস্কি ফিরে আসবো। তারপর দিন কোয়েটা ফিরে যাবো। কিজিলবাস সাহেব হিসাব কোরে বললেন—আপনাকে তবে চারদিনের পাশ করিয়ে দিচ্ছি। তারপর লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করে অফিসে চলে গেলেন। আমিও মহম্মদ শাকে নিয়ে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। দেখবার বিশেষ কিছুই নেই—সরকারী এলাকাটা কিঞ্চিৎ ফিট্‌ফাট্ ছিম্‌ছাম্ কিন্তু বাজার ও দেশী বস্তিগুলি ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মত। ধুলো, বালি, খোলা নর্দ্দমা। চা ও খাবারের অনেক দোকান চোখে পড়ল এবং সে সব দোকানে ভীড়ও বেশ দেখলাম।

কিজলিবাস সাহেবের সাথে লাঞ্চ সেরে ওয়েটিংরুমে ফিরে এসে বিশ্রাম নিতে লাগলাম। বেলা চারটে নাগাদ মহম্মদ শা এসে হাজির—এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কলকাত্তাইয়া ইয়াত্রীকে তার বাড়ী নিয়ে যাবেই। তার গ্রামের সবাই নাকি বাঙ্গালীসাবকে দেখতে উৎসুক। যেতেই হলো তার সাথে। নুস্কি হতে প্রায় মাইল চারেক দূরে তাদের গ্রাম। আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে মহাসমারোহে খাটিয়ার উপরে (বেশ পুরু গালিচা বিছানো) বসালো। আগেই বলেছি যে ওদিককার সব বাড়ীই মাটীর দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। মহম্মদ শার বাড়ীও সেইমত ঘেরা। ভিতরে বেশ বড় উঠান আর তিনদিকে তিনটি বড় বড় ঘর। দেখতে দেখতে আমার চারপাশে ভীড় জমে গেলো। গাঁয়ের মুরুব্বিরা একে একে সবাই এসে জড়ো হলো। অনেকগুলি খাটিয়া পাতা ছিল। সবাই সেসব খাটিয়ায় বসলেন। মহম্মদ শায়ের বৃদ্ধামাতাও এই বাঙ্গালী ইয়াত্রিকে দেখতে এবং মাঈকীর দোয়া মাঙ্‌তে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং ওদের ভাষায় আমাকে আশীর্ব্বাদ করলেন। বুড়ীর কী রং, কী সুন্দর দেখতে! বাচ্চাগুলি—সবাই দুধে - আলতায় রং, সুদৃশ্য মুখশ্রী। রক্তিম কপোল।

দেখতে দেখতে ওদের সাথে আমার আড্ডা জমে উঠলো। মহম্মদ শা এই দুই তিন দিনেই, আমার জগা খিচুরী ভাষা কিছুটা বুঝতে শিখেছিলো। সেই আমার দোভাষীর কাজ করতে লাগলো। পর্দ্দা প্রথার কড়াকড়ি দেখি নাই। যদিও মেয়েরা ঐ ভীড়ের কাছে আসছিলেন না, তারা দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিলেন। মহম্মদ শা তার ছেলেদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। গর্বভরে নিজের মাদুলিটা আর তার বড় ছেলেকে দেখিয়ে বললো যে—তার পরে বড় ছেলেই হবে মাঈকীর সেবায়েৎ। বড় ছেলের গলায় কালো গোল মসৃণ পাথরের গোলক, কালো সুতো দিয়ে মাদুলীর মত গলায় ঝুলতে দেখলাম। মহম্মদ শাহ ঐ পাথরটি দেখিয়ে বললেন যে মহম্মদ শার পরে, যখন ওর মাদুলীটা বড় ছেলের গলায় যাবে, তখন ঐ পাথর তার বড় নাতির গলায় দেওয়া হবে। এই প্রথাই ওদের বংশে পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। ছেলেটিকে কাছে ডেকে ঐ কালো গোলকটা ভাল করে লক্ষ্য করলাম। ঐ পাথরটির ভিতরে ছিদ্র কোরে, কালো সুতো দিয়ে গলায় ঝোলানো। দেখে মনে হলো বোধহয় শালগ্রাম-শিলা। সব ব্যাপারটাই যেন আশ্চর্য্য মনে হয়। প্রায় হাজার বছর আগে এই সব দেশ ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী জাতি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এরা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য

হয়েছিলো কিন্তু কিসের প্রেরণায় মাহুলীর ভিতর পৈতে রেখে, শালগ্রাম শিলা গলায় ঝুলিয়ে, মাঈকী স্থানের সেবা চালিয়ে যাচ্ছিল! হয়তো বা সে পূজা শাস্ত্রানুমোদিত নয় কিন্তু তাতে কি আসে যায়? পুরুষানুক্রমে এই যে নিষ্ঠা—তার চেয়ে বৃহৎ অর্চ্চনা আর কী হতে পারে? আজ অর্দ্ধশতাব্দীর কিঞ্চিৎ অধিককাল পর এবং অতি বৃহৎ রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে—যার পটভূমিকা হিন্দু মুসলমান দুই জাতিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত—কী অবস্থা জানিনা। মহম্মদ শা এবং তার বংশ-ধরগণ এখনও তাদের পুরুষানুক্রমে বংশগত প্রথা বজায় রেখেছেন কিনা কে জানে? না থাকাই বেশী সম্ভব। কারণ এখন কি নিশ্চয়ই কোন হিন্দুযাত্রী সেই অতি দুর্গম মাঈকী স্থানে তীর্থ করতে যায়? বোধহয় যায় না। কারণ পাকিস্থান হিন্দু শূণ্য বললেই চলে।

এর মধ্যে চা একগাদা শুকনো ফল, মেওয়া এবং ঘরে তৈরী বিস্কুটের মতন অতি শক্ত একটি খাদ্য—থালায় করে নিয়ে এসে আমার সামনে রাখলো এবং মাতব্বর ব্যক্তিদের দিল। চা পানের পর আমি সবার কাছ থেকে বিদায় চাইলাম। পশ্চিম দিগন্তে তখন সূর্য্য হেলে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মহম্মদ শা বাক্যব্যয় না করে আমাকে নিয়ে ফিরে চললো। কী সমাদরই না ওরা আমাকে করেছিল। সবাই বারংবার আমাকে সেলাম করছিল এবং আমার হাতে হাত মেলাচ্ছিলো। পুনঃপুনঃ আমাকে আবার আসবার জন্য নিমন্ত্রণ জানাচ্ছিল।

সবাই খুব সুন্দর, সহজ ও সরল। আমি যে বিধর্ম্মী এবং অন্যজাতীয়, ভিন্ন ভাষী, সেকথা একবারও ওদের মধ্যে ঘন্টা দুই থেকেও মনে হয়নি। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে সত্যিই আমার কষ্ট হচ্ছিল। সন্ধ্যা আটটা নাগাদ মহম্মদ শা আমাকে নুস্কী শহরের ওয়েটিংরুমে পৌছে দিয়ে গেল। যাবার সময় আমার জন্য বারংবার মাঈকী দোয়ামাঙতে লাগলো। বারবার সেলাম কোরে আল্লার দোয়া মেগে ছল ছল চোখে বিদায় নিল। যাবার সময় বল্লে কাল সকালে এসে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে যাবে। আবার ফেরার পথে নুস্কীতে দেখা করবে। মাঈকী স্থান দেখবার পর্ব এইখানেই শেষ। আকুমাস্ জাহিদান—সে অন্যপর্ব। অন্যত্র সুযোগ পেলে বলবো।

পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। স্মৃতির উপর নির্ভর কোরে লেখা। স্থান, কাল, সময় দুরত্ব কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ হতে পারে। তবে বোধহয় আমিই একমাত্র হিন্দুবাঙ্গালী যে নুস্কি, আকুমাস্ জাহিদান মাঈকীস্থান দেখে এসেছি। ব্যাপারটার কিছু অভিনবত্ব আছে, তাই লিখলাম।

ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের পঞ্চাশ বছরে

ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু

শুধুই আশ্চর্য হওয়া—
কাজের কথাই নয় কোনো।
কী করে চতুর বীজ
নির্বোধ তরুতে পায় পরিণতি,
কী করে ধরায় ফল,
কী করে আবার সেই
পরিণত গাছে ধরে ঘুন,
ফলে লাগে পোকা—

সে কথাও কম আশ্চর্যের নয়।

উঁচুতে উঠেই কাজ—
মই ফেলে দেওয়া;
পিছনের পদচিহ্ন মুছেই ত'
মানুষ এই বর্তমান মহিমা জেনেছে!
নিকেলে করুণা ঝলে, প্লাষ্টিকে মমতা।

করার কিছুই নেই!
যারা এই স্বভূমিকে
বাসযোগ্য স্বাধীনতা দিতে
দেহের সর্বস্ব শুধু নিংড়ে দিয়েছে,
সদর দরজা থেকে দূরে তারা
তারা আজ বনে' গেছে
ক্ষুধিত আর্দালি, কিংবা বঞ্চিত শাবক।
অথচ তোমরা? মঞ্চাসীন মহাত্মন্
বামহস্ত প্রসারিত বঙ্কিম দালাল
প্রাকৃতিক কাকলির মতো পিয়ানো বাজাও—

আস্তা কুঁড়ে দেশপ্রেম গড়াগড়ি যায়।

।। রবীন্দ্র-জীবনে-সৃজনে ও মননে 'শরণাগতি' ।।

রণজিৎ কুমার সেন

রবীন্দ্র-কাব্য সৃষ্টিতে 'সন্ধ্যা সঙ্গীতের' পর তবে 'প্রভাত সঙ্গীত'। সূচনায় রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন : 'কড়ি ও কোমল' রচনার পূর্বে কাব্যের ভাষা আমার কাছে ধরা দেয়নি। ···'কড়ি কোমলের' পর থেকেই আমার কাব্য রচনা ভালো মন্দ সব কিছু নিয়ে একটা স্পষ্ট সৃষ্টির ধারা অবলম্বন করেছে। 'সন্ধ্যা সঙ্গীতের' পর্বে ছিল শুধু হৃদয়াবেগ, 'প্রভাত সঙ্গীতের' ঋতুতে দেখা দিতে শুরু করেছে এক আধটা মননের রূপ'। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এই 'প্রভাত সঙ্গীতের'ই অন্তর্গত প্রথম দিকের কবিতা। তারপরের কবিতাই 'প্রভাত উৎসব'। এক নতুন চেতনায় মানসিক উদ্বোধন। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক জগতের সঙ্গে বিশ্ববোধকে মিলিয়ে মনের যে ব্যাপ্তি —তা এখান থেকেই শুরু রবীন্দ্রনাথের। অনন্ত জীবন, অনন্ত মরণ ও প্রতিধ্বনি সম্বন্ধে একটা গভীর উপলব্ধিও এই সময়ে তাঁকে বিশেষভাবে আপ্লুত করে। 'প্রতিধ্বনি'র উদ্দেশে বলতে গিয়ে বালক কবি রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গতঃ বলেছেন—

'এই বিশ্বজগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া
বাজাইবি সৌন্দর্যের বাঁশি,
অনন্ত জীবনপথে খুঁজিয়া চলিব তোরে,
প্রাণমন হইবে উদাসী।'

এই যে প্রতিধ্বনি, এই যে অদৃশ্য অনন্ত—তাঁকে খুঁজে চলার ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের চিত্তে 'প্রভাত সঙ্গীত' রচনাকাল থেকেই দেখা দেয়, তাঁকে আকুল করে, উদাসী করে। পরবর্তী কাব্য 'ছবি ও গান'—যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'এটা বয়ঃসন্ধিকালের লেখা, শৈশব-যৌবন যখন সবে মিলেছে। ভাষার আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর। ··· 'কিন্তু মনে হয় আরও কিছু বেশী! পূর্বের প্রতিধ্বনি এখানে আরও গভীর প্রশ্ন হয়ে এসেছে মনে। প্রশ্নের শুরু হয়েছে 'কে' দিয়ে। —

'আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো!
সে যে ছুঁয়ে গেল সুয়ে গেল রে,
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।' ·····

পরে এই মহাপ্রশ্ন 'কে' সুরে রূপায়িত হয়ে সঙ্গীতে স্থায়ী আশ্রয় পেয়েছে! এখানেই মনে করা যেতে পারে—রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক গীতি কবিতা বা গানের জন্ম। এরপরেই

দেখা দিল 'ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। ২০টি পদের ৬ষ্টটিতে পদাবলীকার বলছেন—

'বঁধুয়া, হিয়া'পর আও রে,
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু-মৃদু ভাসয়ি,
হমার মুখ 'পর চাও রে'!...

পূর্বের 'প্রতিধ্বনি' বা 'কে'র পর অনন্তের প্রতি মনের আকুলতা 'শ্যাম' নামে সম্বোধিত হয়ে গীতসুধারসে ঝরে পড়েছে।

এরপরেই কবির লেখনীতে ফুটে ওঠে 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুচ্ছ। 'কবির মন্তব্য' সূচক গ্রন্থসূচনায় রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন: "যৌবন হচ্ছে জীবনের সেই ঋতু পরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। 'কড়ি ও কোমল' আমার সেই নব যৌবনের রচনা। ...এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টি প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বার বার প্রবাহিত হয়েছে—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,—

যা 'নৈবেদ্যে' আর একভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।"

কিন্তু 'প্রভাত সঙ্গীতের' কালেও তাঁর কাছে আমরা বার্তা পেয়েছি অনন্ত জীবন, অনন্ত মরণ ও প্রতিধ্বনির। মৃত্যু এখানে মৃত্যু নয় মৃত্যু এখানে জীবনদর্শনের এক অনবদ্য শুদ্ধ স্তর। তা যেমন চিত্তকে নম্র অনন্ত অসীমের প্রতি নিবেদিত ও প্রশান্ত করে, তেমনি জীবনকে নবনব ভাবে গতিমুখি করে ও তাকে পূর্ণতার স্পর্শ দেয়।

'কড়ি ও কোমল' রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেন তাঁর মেঝদাদা সত্যেন্দ্রনাথকে। এই গ্রন্থে প্রাণ, কাঙালিনী, প্রিয়নাথ সেনকে লেখা পত্র, মঙ্গলগীত, আহ্বানগীত প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে বহু সনেট যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি সংযোজন ঘটেছে উল্লেখযোগ্য কিছু গীতি-কবিতার; এখানে তাদের নানা নামে চিহ্নিত করা হলেও পরবর্ত্তী কালে এসব কবিতা বিশুদ্ধ গান হিসেবে 'গীত বিতানে' স্থান পেয়েছে। এই গীতিকবিতা বা গানগুলি হচ্ছে—'কখন বসন্ত গেল, এবার হলো না গান', 'ওগো শোনো কে বাজায়', 'আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন আকুল নয়ন রে',

'হেলা ফেলা সারা বেলা, একি খেলা আপন মনে', আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে কী জানি পরাণ কী যে চায়', 'তুমি কোন্ কাননের ফুল', 'ওগো কে যায় বাঁশরী বাজায়ে,''এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা', 'কেন চেয়ে আছো গো মা মুখপানে', এবং 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না'। —বলতে বাধা নেই যে, সাধারণ কবিতার চাইতে এখানে গীতি কবিতাগুলিই অধিক উজ্জ্বল। পরবর্তী কাব্য 'মানসী' তে (১৮৮৮-১৮৯০) 'মেঘদূত' বা 'অহল্যার প্রতি'র মতো কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা স্থান পেলেও কবিচিত্ত বিশেষভাবে নিমগ্ন হয়েছে 'ধ্যান' ও 'অনন্ত প্রেমের' মতো ভাববাদী কাব্যে। 'ধ্যান' কবিতার কিয়দংশ, যথা—

'নিতা তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি ;
তুমি আছ মোর জীবন-মরণ
হরণ করি'
তোমার পাই নে কূল—
আপনা মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাই নে তুল।' ...

তেম্‌নি 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় কবির উক্তি—

'তোমারেই যেন ভালো বাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার'।

অনন্তের প্রতি কবিচিত্তের এই ব্যাকুলতা, এই শরণাগতি আমরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কম বয়সের 'প্রভাত সঙ্গীত' কাব্যকাল থেকেই লক্ষ্য করে আসছি।

এক অদৃশ্য শক্তি, এক ভুবনমোহিনী প্রাণসত্তা অলক্ষ্য থেকে কবি—হৃদয়কে কেবলই তার প্রতি আকর্ষণ করছে, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কবি বলছেন—

'তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন
চঞ্চল অনিবার—
যতদূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার'।

যে বয়সে যত বিচিত্রভাবের কবিতাই রবীন্দ্রনাথ লিখুন, এবং তার মধ্যে নিসর্গ, প্রকৃতি, স্বদেশ ও প্রেম যতখানি স্থান জুড়ে থাকুক, সবকিছুকে মিলিয়ে এক অধ্যাত্মবোধ সর্বদা কবিচিত্তকে

আবিষ্ট করে রেখেছে। এই অধ্যাত্মবোধই কখনো অনন্ত, কখনো মানস-সুন্দরী, বধূ বা প্রিয়া, কখনো অপরিচিতা, কখনো বা অসীমকালের কাণ্ডারী হিসেবে রূপ নিয়েছে। 'সোনার তরী'তে তাঁর উদ্দেশ্যেই কবি বলেছেন—

'....এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে,
সকলি দিলাম তুলে
ঝরে বিথরে—
এখন আমারে লহ করুণা করে।'

ফাল্গুন ১২৯৮ থেকে অগ্রহায়ণ ১৩০০ সালের মধ্যে রচিত 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের ৩০ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে রচিত; পরিণত রচনা। 'তোমরা ও আমরা', 'হিং টিং ছট্', 'পরশ পাথর', 'বৈষ্ণব কবিতা', 'দুই পাখি', 'যেতে নাহি দিব', 'সমুদ্রের প্রতি', 'মানস সুন্দরী', 'বিশ্বনৃত্য', 'ঝুলন', 'পুরস্কার', 'বসুন্ধরা' প্রমুখ নানা উল্লেখযোগ্য কবিতা ও বিভিন্ন শিরোনামে কয়েকটি গান এই গ্রন্থে পেয়েছে। সর্বশেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় কবি প্রথম কবিতার রেশ মনে রেখেই যেন বলেছেন—

'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?
বলো, কোন পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?'...

'চিত্রা' কাব্যে (১৩০২) এসে এই ভাবটি পূর্ণতা লাভ করলো। জগতের মাঝে যিনি বিচিত্ররূপিনী, তিনিই 'চিত্রা'।—

'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিনী।
... ...
অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।'

তাঁকেই 'অন্তর্যামী' রূপে উপলব্ধি ক'রে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা বলে উঠেছে—

'এ কি কৌতুক নিত্য নতুন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।....'

আবার 'সাধনা' কবিতায় ভক্ত বলেছেন—

'দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি।
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।'

তেমনি 'জীবনদেবতা' শীর্ষক কবিতায় কবি তাঁর সেই অন্তর্যামী পুরুষের উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন তুলে ধরেছেন—

'ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।' ···

রবীন্দ্র-জীবনের 'জীবনদেবতাতত্ত্বের' প্রকৃত সূত্রপাতও এখান থেকেই। বহু নামী কবিতায় 'চিত্রা' সমৃদ্ধ, যেমন—'প্রেমের অভিষেক', 'এবার ফিরাও মোরে', 'উর্বশী', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'বিজয়িনী', '১৪০০ সাল', 'সিন্ধুপারে' প্রভৃতি। তারমধ্য থেকেই বিস্ময়করভাবে উঠে এসেছে 'চিত্রা' 'অন্তর্যামী', 'সাধনা' ও 'জীবনদেবতা'। 'কল্পনা' (১৩০৪) গ্রন্থের 'মানসপ্রতিমা'তেও সেই একই সুরের ভিন্নরূপ, যেমন—

'তুমি সন্ধ্যায় মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা
মম শূণ্য-গগন-বিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম-গগন-বিদারী।' ····

এই গ্রন্থেরই বিশেষ তিনটি গানেও কবির এই 'জীবনদেবতা'র প্রতি আকুতি মূর্ত হয়ে উঠতে লক্ষ্য করা গেছে, যেমন—

(১) 'ভয় হতে তব অভয় মাঝারে
নূতন জনম দাও হে।' ···

(২) 'সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি
আপনি সে মন নিয়েছ।' ···

(৩) 'জানি হে যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা-তরণী
লইবে মোরে ভব-সাগর-কিনারে।' ···

'কল্পনা'র পর 'ক্ষণিকা' পেরিয়ে আমরা একেবারে 'নৈবেদ্য'য় এসে পৌঁছাই। কিন্তু 'ক্ষণিকা'রই কিছু কবিতায় পরিচয় থেকে গেছে কবির 'অন্তরতমের'। যেমন— 'কল্যাণী', 'অন্তরতম' প্রভৃতি। 'নৈবেদ্য' কাব্যে এই অন্তরতমই কখনো জীবনস্বামী, ভুবনেশ্বর, অন্তর্যামী, প্রভু, কখনো জীবননাথ, হৃদয়রাজা, পূর্ণ, বিশ্বরাজন, কখনো মহারাজ, দেব, রাজেন্দ্র, মঙ্গলময়, কখনো পরম ঈশ্বর, মহেশ, রাজাধিরাজ, প্রিয়তম, স্বামী, আবার কখনো বা দীনবৎসল। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে—'রূপং রূপং শতরূপো বভূবঃ', অর্থাৎ—ঈশ্বর নানারূপে বিরাজিত। তেমনি ভক্ত বা মানুষের কাছে তিনি নানা নামেও অধিষ্ঠিত। সেই নানা নামের এক একটি বিমুগ্ধ বা আর্ত সম্বোধন ভেসে উঠেছে—'নৈবেদ্য'র নানা গানে ও কবিতায়। কবির চিত্ত এতদিনে এসে যেন পূর্ণরূপে নিবেদিত হতে পারলো তাঁর জীবনবল্লভের পায়ে। 'নৈবেদ্য' মোট ১০০টি গীতিকবিতা ও চৌদ্দ চরণের সনেটে সমৃদ্ধ। অধিকাংশই ভক্তিবাদী রচনা। গ্রন্থের নামের মধ্যেই তার পরিচয় স্পষ্ট। গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেছেন তাঁর পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রীচরণকমলে। যোগ্যগ্রন্থ যোগ্যপাত্রে উৎসর্গীকৃত। কাল—১৩০৮ সাল। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার কাল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চল্লিশ। শৈশবে পিতৃদেবের কাছে শিক্ষা ও পরে উপনিষদিক প্রজ্ঞালাভ এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রার্থনাকালীন ভাষণ দান—যা পরবর্তীকালে 'শান্তিনিকেতন' নামেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, তারমধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবি-দার্শনিক চিত্ত প্রকৃতিপ্রেমের সঙ্গে বিশ্ব-স্রষ্টা তথা জীবনবল্লভের প্রতি পুরোপুরি উৎসর্গীকৃত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল; আর সেই স্বাভাবিকতাই বাস্তবে রূপায়িত হয়ে জগজ্জনের জন্যে স্থায়ীভাবে রেখে গেলেন তিনি অজস্র ভক্তিবাদী রচনা—যার মধ্যে রয়েছে 'উৎসর্গ', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও গীতালি, সহ যাবতীয় পূজা ও প্রেম পর্যায়ের গান, নানা কবিতা, শান্তিনিকেতন ও অন্যান্য ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়। অবশ্য এই ভক্তিবাদের বীজ রবীন্দ্রচিত্তে উপ্ত হয়েছিল তাঁর কাব্যসাধনার গোড়া থেকেই। 'আমার ধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন: আমার রচনার মধ্যে যদি কোন ধর্মতত্ত্ব থাকে ত তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ; যে-প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আর-একদিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ, আর একদিকে মিলন, একদিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে, এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে'।

আমরা তাই তাঁর এই পরমাত্মিক ধর্মীয় ভাবটি ধরতে চেষ্টা করেছি 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' ও 'প্রভাত সঙ্গীতের' কাল থেকেই। ক্রমে পর্যায়ক্রমে এসে পৌঁছেছি নৈবেদ্য (১৩০৮), গীতাঞ্জলি (১৩১৩-১৭) ও অপরাপর সঙ্গীতে এবং গদ্য রচনায়। 'নৈবেদ্য'র গোড়াতেই তিনি বলেছেন—

'প্রতিদিন আমি হে জীবন-স্বামী
দাঁড়াবো তোমারি সম্মুখে,
করি জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াবো তোমার সম্মুখে।'...

'উৎসর্গের' (১৩০৯-১০)—১৩, ১৬, ১৯, ২০, ২২ ও ৩৯নং কবিতার মূল সুরটিই এই ভুবনেশ্বর বা বিশ্বদেবগত। সমস্ত বক্তব্য মিলিয়ে একটি প্রাণের আবেগই মাত্র স্ফুরিত, তা হচ্ছে—

'হে চির পুরাণো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া,
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া।'

তেম্‌নি 'খেয়া' (১৩১২-১৩) কাব্যের দান, বাঁশি, মিলন, ভার, প্রতীক্ষা, প্রচ্ছন্ন, অনুমান, বর্ষাসন্ধ্যা, খেয়া প্রভৃতি কবিতায় সেই একই সুরের রেশ।

গীতাঞ্জলি (১৩১৩-১৭) গীতিমাল্য (১৩১৬-২১) ও গীতালিতে ১৩২১ এসে কবিচিত্তের পূর্ণাহুতি ঘটে, ঘটে পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার আত্মসমর্পণ।

'তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে,
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।'...

সহসা প্রশ্ন জাগে—

'কে গো অন্তরতর সে।
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,
বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ
কত সুখে দুখে হরষে।'... (গীতিমাল্য)

তারপরেই আবার ভক্ত হৃদয়ের সকৃতজ্ঞ নিবেদন—

'সারা জীবন দিল আলো
সূর্য গ্রহ চাঁদ—
তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু
তোমার আশীর্বাদ।'... (গীতালি)

অন্যভাবে 'শান্তিনিকেতন ভাষণে' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'আমরা হয়তো মনে করতে পারি, পৃথিবী যে আমাকে টানছে, সেটা পৃথিবীরই টান। কিন্তু তাই যদি হবে, পৃথিবীকে টানে কে? সূর্যকে কে আকর্ষণ করছে? এই যে বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের জোরে গ্রহ-তারা-নক্ষত্রকে ঘোরাচ্ছে, কাউকে নিশ্চল থাকতে দিচ্ছে না। সেই বিরাট কেন্দ্রাকর্ষণের কেন্দ্র তো পৃথিবীতে নেই। একটি পরমাগতি আছে, যা আমারও গতি, পৃথিবীরও গতি, সূর্যেরও গতি। —এই পরমাগতির কথা স্মরণ করেই উপনিষৎ বলেছেন : 'কোহ্যেবান্যাৎ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ;' —কেই বা শরীর চেষ্টা করতো, কেই বা জীবিত থাকতো—যদি আকাশ পরিপূর্ণ ক'রে সেই আনন্দ না থাকতেন। সেই আনন্দই বিশ্বকে অনন্ত গতি দান ক'রে বলেছেন, আকাশপূর্ণ সেই আনন্দ আছেন বলেই আমার চোখের পাতাটি আমি খুলতে পারছি। ...আমার সমস্ত গতিতে সেই পরম গতিকে, আমার সমস্ত সম্পদে সেই পরম সম্পদে, আমার সমস্ত আশ্রয়ে সেই পরম আশ্রয়কে, আমার আনন্দেই সেই পরম আনন্দকে এষঃ ব'লে জানব—একেই বলে পার হওয়া।' বলেছেন : 'এইজন্য প্রতিদিনই প্রার্থনা করি : নমস্তেঽস্তু। তোমাতে আমার নমস্কার হোক, সুখ আসুক, দুঃখ আসুকঃ নমস্তেঽস্তু। মান আসুক, অপমান আসুক : নমস্তেঽস্তু। তুমি শিক্ষা দিচ্ছ এই জেনে : নমস্তেঽস্তু। তুমি রক্ষা করছ এই জেনে : নমস্তেঽস্তু। তুমি নিত্য নিয়তই আমার কাছে আছ—এই জেনে : নমস্তেঽস্তু। তোমার গৌরবেই আমার একমাত্র গৌরব, এই জেনেই : নমস্তেঽস্তু। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকালের অধীশ্বর তুমিই 'পিতা নোঽসি'—এই জেনেই নমস্তেঽস্তু নমস্তেঽস্তু। বিষয়কেই আশ্রয় বলে জানা ঘুচিয়ে দাও : নমস্তেঽস্তু। সংসারকে প্রবল বলে জানা ঘুচিয়ে দাও : নমস্তেঽস্তু। আমাকেই বড় বলে জানা ঘুচিয়ে দাও : নমস্তেঽস্তু। তোমাকেই যথার্থরূপে নমস্কার ক'রে চিরদিনের মতো পরিত্রাণ লাভ করি।'

এই চিরস্মরণ, চিরমনন শরণাগতিই রবীন্দ্রনাথকে চিরকাল নানা কর্ম থেকে কর্মে লিপ্ত করেছে, সাধনায় একাগ্র ও ধর্মে স্থিত করেছে, সাহিত্য থেকে শুরু ক'রে দর্শনে বিজ্ঞানে অনুপ্রবিষ্ট করেছে, কৃষি ও সমবায় ভাবনা থেকে শুরু ক'রে শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় প্রাণিত করেছে এবং বার বার বিশ্বপরিক্রমায় নানা বিচিত্র মানুষের সঙ্গে যোগযুক্ত ক'রে এই ভুবনের কণক-আর্শিতে ভুবনেশ্বরের অপরূপ রূপমাধুর্য দর্শনের অধিকারী করেছে। তাই অনায়াসে তিনি বলতে পেরেছেন —

'তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নিচে,
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হতো যে মিছে ॥''

রজনীকান্তের গান ঃ বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য

—বসুমিত্র মজুমদার

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের গানের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই দেখা দরকার তাঁর সৃষ্টিশীলতার মেয়াদ কতদিনের ছিল। আর তিনি সেই মেয়াদে কতগুলি সংগীত রচনা করেছিলেন।

আমরা জানি যে, কবি রজনীকান্তের জীবনাবসান হয় মাত্র ৪৫ বছর বয়সে (১৮৬৫-১৯১০), দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের ফলে। কিন্তু এই স্বল্পায়ু জীবনের মধ্যে তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের মেয়াদ কতটুকু ছিল? এর কোন সঠিক বা নিশ্চিত উত্তর না পেলেও, অনুমানের ওপর নির্ভর করে কতকটা কাছাকাছির উত্তর পাওয়া যেতে পারে। একটা হিসেবে দেখা যাচ্ছে, তাঁর বি. এল. পরীক্ষার আগেই 'আশা' শীর্ষক তাঁর একটি গীতিকাব্য 'আশালতা' নামক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রজনীকান্ত বি. এল. পরীক্ষা দেন ১৮৯১ সালে। অর্থাৎ তাঁর বয়ক্রম যখন ২৬ বৎসর। কিন্তু বি. এল. পরীক্ষার আগেও যে তিনি কাব্য রচনা করতেন এ কথা বোঝা যায় তাঁর প্রতিভা সম্পর্কিত আত্ম-আলোচনায়। তিনি লিখেছেন—

> "আমি যদি পড়তাম তবে স্পর্ধা করে
> বলতে পারি যে, কেউ আমার সঙ্গে Compete
> কত্তে পারতো না। আমি গান গেয়ে নেচে
> হেসে পাশ হয়েছি।"

এই উক্তি থেকে এবং তার এন্ট্রান্স, এফ. এ. বি. এ, বি. এল প্রভৃতি সমস্ত পরীক্ষায় পাশ করার ধরণ দেখে এটাই অনুমান হয় যে তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই বাংলা কবিতার রসাস্বাদন এবং রস বিতরণের প্রয়াসও শুরু করেন। এই হিসেবে মোটামুটি ভাবে ১৮ থেকে ২০ বছরকে যদি তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের সূচনাপর্ব হিসেবে ধরা যায়; তা হলে তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের মোট আয়ু ধরা যেতে পারে ২৫ থেকে ২৭ বৎসর। এই সময়ের মেয়াদে তাঁর সৃষ্টি-সংখ্যাও খুবই কম, কবিতা ও গান মিলিয়ে সর্বসাকুল্যে প্রায় চারশ' মাত্র। যেখানে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কমবেশি বাইশ বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে রচিত শুধু গানের সংখ্যাই প্রায় তিন হাজার। পরি-সংখ্যানের দিক থেকে কবি রজনীকান্তের রচনা সম্ভার নিতান্তই অল্প। কিন্তু এত অল্প সংখ্যক গান রচনা করেও তিনি যে বাংলা গানের জগতে একটি স্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছেন এটাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়।

এই স্থায়ী আসন লাভ করার অন্যতম প্রধান কারণ তাঁর গানের কথায় অপূর্ব আত্ম-

নিবেদনের ভঙ্গি এবং সুরের দিকে অননুকরণীয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। তবে শুধু আত্মনিবেদনের বা পূজার গানই তাঁর সমস্ত রচনার একমাত্র বিষয়বস্তু নয়। সেখানে প্রেমের গান যেমন আছে, তেমনি হাসির গান, দেশাত্মবোধক, প্রকৃতি বিষয়ক এবং আনুষ্ঠানিক সংগীতও সেখানে বর্তমান। অবশ্য এই সঙ্গে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, রজনীকান্তের এই সব রকম গান আমাদের ঠিকমত শোনা হয়ে ওঠে নি, বা শেখা হয়ে ওঠে নি। তা রুচির কারণেও যেমন, প্রচার কার্পণ্যেও তেমনি। আবার যথার্থ শিক্ষক, শিক্ষার্থীর অভাবের কারণেও কতকটা বটে। কিন্তু সে যাই হোক, তাঁর কমবেশি চারশ' রচনার মধ্যে যে ক'টি পর্যায়ের গান পাওয়া যায় সে বিষয়ে এখানে দু'চার কথা নমুনা সহ আলোচনা করা যাক।

রজনীকান্তের গানের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ভক্তিকেন্দ্রিক। এই ভক্তিগীতির মধ্যে দেখা যায় যে গানগুলি বেশির ভাগই ব্রহ্মসঙ্গীতের আদলে রচিত। ঈশ্বর এখানে কখনও নিরাকার। তুমি শব্দযোগে সম্বোধিত। তিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, পরম শক্তিমান। আবার দেখা যায় সনাতন ধর্মমতানুযায়ী কোন কোন গানে ঈশ্বর সাকার। কখনও তিনি 'হরি', কখনও 'মা' সম্বোধনে উদ্দেশ করেছেন। এই পর্যায়ের গানে যে শুধু পূজা ভক্তি নিবেদনের কথাই বর্ণিত হয়েছে তা নয়। আত্ম সমালোচনা, প্রেম, মুগ্ধতা, বৈরাগ্য, ক্ষোভ, অভিমান, হতাশা, নতুন উদ্যম এবং আত্মনিবেদন সমস্তই ফুটে উঠেছে ভক্তিগীতির মধ্যে। এই পর্যায়ের কয়েকটি গান—

'তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে' (ভৈরবী)
'আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে' (মিশ্র কানাড়া)
'(আমি) অকৃতি অধম বলেও তো কিছু' (বেহাগ)
'(তোমারি) দেওয়া প্রাণে' (মিশ্র আলেয়া)
'(আমি) দেখেছি জীবন ভরে চাহিয়া কত' (হাম্বীর)
'কোলের ছেলে ধুলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে' (ভৈরবী)
'পাতকী বলিয়া কি গো, পায়ে ঠেলা ভাল হয়' (মিশ্র বেহাগ)
'কেন বঞ্চিত হব চরণে' (মিশ্র খাম্বাজ)
'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব' (বেহাগ) ইত্যাদি।

এর পরে আসে প্রেম সংগীত বা কাব্যগীতির কথা। নরনারীর নিতান্তই পার্থিব প্রেমের কথা এই পর্যায়ের গানে ফুটে উঠেছে। প্রেমের আনন্দ, বিরহের বেদনা, পূর্বরাগের স্বপ্নদর্শন অনুভূতি প্রভৃতি এই সব গানের মূল আস্বাদ্য বিষয়। এই পর্যায়ের কিছু গান—

স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি (মিশ্র কানাড়া)
মধুর সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায় (বেহাগ)
ফুটিতে পারিত গো ফুটিল না সে (লাউনি)

সখি রে ! মরম পরশে তারি গান (মিশ্র ভূপালী)
পরশ-লালসে, অবশ-আলসে (বেহাগ)
প্রাণের পথ ব'য়ে গিয়েছে সে গো (মিশ্র মল্লার)
যারে মন দিলে আর ফিরে আসে না (সিন্ধু) ইত্যাদি।

একটা সময় ছিল যখন প্রায় সমস্ত গীতিকবিরাই হাসির গান রচনা করতেন। আজ-কালকার কবিদের রচনায় হাস্যরসাত্মক কবিতা ও গান প্রায় দুর্লভ বললেই চলে। খুব সম্ভব বর্তমান যুগের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, রুঢ়তা প্রভৃতি বিঘ্নিত অনুভাবই এর অন্যতম প্রধান কারণ। তা সে যাইহোক, কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের রচনায় অনেকগুলি হাসির গান পাওয়া যায়। সে হাসি কখনও বিদ্রুপাত্মক, কখনও অনাবিল আবার কখনও বা কোন বিখ্যাত গানের প্যারোডি।

রজনীকান্তের হাসির গান লেখার সূত্রপাত কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান শুনে। শোনা যায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও' গানটির প্যারোডি লিখেছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সেই প্যারোডি গান রাজসাহীতে দ্বিজেন্দ্রলালের কণ্ঠে শুনেই রজনীকান্ত হাসির গান লেখা শুরু করেন। এই গানের প্রেরণায় রজনীকান্ত যে গানটি লিখেছিলেন তা হ'ল—

"আমরা রাঁধিয়া বাড়িয়া আনিয়া দেই গো
আর তোমরা বসিয়া খাও
আমরা দু'বেলা হেঁসেলে ঘামিয়া মরি গো
আর (খেয়ে দেয়ে) তোমরা নিদ্রা যাও।"....

এর পরেই একে একে অনেক হাসির গান তিনি রচনা করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটির প্রথম লাইন—

আঃ যা কর আস্তে ধীরে (কীর্ত্তন-ভাঙা সুর)
আমাদের ব্যবসা পৌরোহিত্য (ডি. এল. রায়ের গানের সুর)
চাহিয়া দেখ এনেছি আজ জড়োয়া মতিমালা (মনোহরসাই)
তোমাতে যখন মজে আমার মন (ভৈরবী)
বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা (মিশ্র সিন্ধু)
আমার এমন কি বয়সটা বেশি (বিভাস)
যদি কুমড়োর মত, চালে ধ'রে র'ত (মনোহরসাই) ইত্যাদি।

রজনীকান্তের দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য গান—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় (মুলতান)
তব চরণ-নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা (ভৈরবী)

তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত (জংলাসুর)
আয় ছুটে ভাই হিন্দু মুসলমান (সংকীর্তনের সুর)
নমো নমো নমো জননী বঙ্গ (সুরট-মল্লার ইত্যাদি।

এরপরে আসে কিছু আনুষ্ঠানিক ও প্রকৃতি বিষয়ক গানের কথা। প্রকৃতি বিষয়ক গান রজনীকান্তের খুবই অল্প এমন কি ঋতু পর্যায়ের গানও নেই বললেই চলে। শুধু একটা গান পাওয়া যায়, শরৎকালের কিঞ্চিৎ আভাস যার মধ্যে লক্ষিত হয়। গানটি 'আগমনী' গ্রন্থে সংকলিত মিশ্র বিভাস সুরে আধারিত—

"শারদাগমনে নগরবাসিজনে
প্রতিদিন এসে বসে দলে দলে
নাই অন্য বারতা, শুধু, মা, তোর কথা
পুর্ণ গিরি-ভবন, হর্ষ-কোলাহলে।"

এছাড়া আর একটি গান পাওয়া যায় বসন্ত ঋতু বর্ণনকারী। গানটি কাফি-সিন্ধুরাগের মিশ্রণে সুরারোপিত—

"ধীরে ধীরে বহিছে আজি রে মলয়া
হাসি', বিরাজে গগনে
থরে থরে মনোরঞ্জন, দীপ্ত, উজল, তারা।"

স্মৃতি কথকদের থেকে এমন অনেক তথ্যই পাওয়া যায় যে, রজনীকান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় কোন অনুষ্ঠানে গেলে, তাৎক্ষণিক ভাবে সেই অনুষ্ঠানে গীতযোগ্য গান বাঁধতে পারতেন। এই রকমই ছিল তাঁর অসাধারণ সৃষ্টিশীল প্রতিভা। তবে আপাতত গান রচনার সেই সব আশ্চর্য ইতিহাস সরিয়ে রেখে রজনীকান্তের কিছু আনুষ্ঠানিক গানের প্রথম পংক্তি উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করা যাক। এই পর্যায়ের গানগুলি—

'স্বস্তি! স্বাগত! সুধি, অভ্যাগত' (মিশ্র রামকেলি)
'শারদ-শশি-রুচির-বরণ, সজ্জন-চিত-কুমুদ-রমণ' (বেহাগ)
'দীন নিঝর, ক্ষীণ জলধারা' (পূরবী)
'সাঁঝে একি এ হরষ কোলাহল' (নিকট কপট তুহুঁ শ্যাম)
'প্রভাতে যাহারে হৃদয় মাঝারে' (মিশ্র খাম্বাজ) ইত্যাদি।

এরপরেও আছে কিছু বাউল গান। বাউল সুরে বাউল গানের মতই মনের মানুষের অনুসন্ধান, দেহতত্ত্ব বিষয়ক রচনা। এমনই কয়েকটি গান—

'এই দেহটার ভিতর বাহির ছাই'
'তারে ধর্‌বি কেমন করে'

'তুই লোকটাতো ভারি মস্ত'

'ভাসা রে জীবন-তরণী ভবের সাগরে'

'তুমি আমার অন্তস্তলের খবর জান' ইত্যাদি।

রজনীকান্তের গীত রচনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেমন দেখা যায় তৎসম শব্দের ব্যবহার, অপূর্ব গীতিময় শব্দের ঝংকার, পুনঃ পুনঃ যুক্তাক্ষর যুক্ত শব্দ তেমনি দেখা যায় একেবারে আ-কার ই-কার বর্জিত মৌলিক অক্ষর যুক্ত শব্দ চয়িত বাক্যে বিন্যস্ত গীতিকার্য। যেমন—

"তুমি নির্ম্মল কর, মঙ্গল করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে
তব পূণ্য কিরণ দিয়ে যাক্, মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।"

কিম্বা—

"তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা
উর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্চলা
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।"

তেমনি পাওয়া যায়—

"শমন-ভয়-হর, পরম-শরণ-ভব ধব!
(তব) চরণ-তল-পরশ-ফল-অভয়-বর লব।
সবল কর অবশ মন হর সকল ধনজন
অঘ-অনল-দহন-ভয়-হরণ-পদ তব।"

সম্পূর্ণ গানটির মধ্যে কোথাও কোন আ-কার, ই-কার বা যুক্তাক্ষর নেই। এর থেকে রজনীকান্তের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আবার এমন গানও আছে যার বাণী অত্যন্ত সাদামাটা ভাবে রচিত যেন মুখের কথাটাই বেমালুম লেখা হয়েছে—

"আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে
তুমি অভাগারে চেয়েছ
আমি না ডাকিতে, হৃদয় মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ!
চির-আদরের বিনিময়ে, সখা
চির অবহেলা পেয়েছ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে দু'হাত পসারি
ধ'রে টেনে কোলে নিয়েছ

'ও পথে যেওনা, ফিরে এস' বলে
কানে কানে কত ক'য়ছ ;
(আমি) তবু চলে গেছি ; ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।"

আজকের আধুনিক কবিতার মধ্যে যে ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায়—কোন কথা আভাসে ইঙ্গিতে না বুঝিয়ে, একেবারে সোজাসুজি পরিস্কার করে বলা। এই বিষয়টা রজনীকান্তের গানের বাণীতে অত্যন্ত স্পষ্ট।

এবারে আসি সুরের কথায়। সুরের দিক থেকে রাগাশ্রয়ী, ঠুংরী, বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী সুর ছাড়াও অন্য অনেক গানের সুরানুগ গান রজনীকান্তের সংগীত সম্ভারে মেলে। নীচে মুল গানসহ কান্তকবির গানের একটি তালিকা দেওয়া হল—

মূল গান		রজনীকান্তের গান
নিপট কপট তুহুঁ শ্যাম	—	(মা গো) এ পাতকী ডুবে যদি যায়
ঐ	—	তিমির নাশিনী, মা আমার
ঐ	—	সাঁঝে এ কি হরষ কোলাহল
আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই	—	আমাদের ব্যবসা পৌরোহিত্য
ঐ	—	দেখ, আমরা দেওয়ানী হুজুর
ঐ	—	আমরা 'Dey' কি 'Ray' কি 'Sanyal'
ঐ	—	দেখ আমরা জজের Pleader
ঐ	—	আমরা মোক্তারি করি ক'জন
স্মরগরল খণ্ড নং	—	আজি শিথিল সব ইন্দ্রিয়
দাঁড়াও আমার আঁখির আগে	—	শুনাও তোমার অমৃতবাণী
তোর নাম রেখেছি হরিবোলা	—	ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে
রে গঙ্গামাঈ—প্রাতে দরশন দে	—	রে তাঁতী ভাই, একটা কথা
তোমার কথা হেথা কেহ ত কহে না	—	আমি সকল কাজের পাই হে সময়
তোমারি রাগিনী জীবন-কুঞ্জে	—	ভীতি-সঙ্কুল এ ভবে সদা তব
হেলে দুলে নেচে চল গোঠ বিহারি	—	কত ভাবে বিরাজিছ বিশ্বমাঝারে
মাতঃ শতসুতা	—	ভারি সুনাম করেছে নিধিরাম
উঠ গো ভারতলক্ষ্মী	—	আকুল কাতর কণ্ঠে প্রভু
পাখী ঐ যে গাহিলি গাছে	—	(ওমা) এই যে নিয়েছ কোলে

তুমি গতি তুমি সার	—	বেলা যে ফুরায়ে যায়
ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে	—	ছুটো একটা নয় রে, ও ভাই
সোনার কমল ভাসালে জলে	—	যদি পার হতে তোর মন থাকে
বাঁশের দোলাতে উঠে	—	যে পথে, মরা ছেলে, যাচ্ছে নিয়ে
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে	—	জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান সেব্য
ঐ ভৈরবে বাজিছে বিকট ভয়াবহ	—	(মধু) মঙ্গল-গোধুলি-পরিণয়
কেন বঞ্চিত হব চরণে	—	তুমি সত্য কি যাবে চলিয়া

রজনীকান্তের সুরের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বর্তমান এবার সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করে প্রবন্ধ শেষ করব। রজনীকান্তের গান মূলত অলংকার বর্জিত সাদামাটা সুরের গান। অনেকটা যেন গরীব ঘরের মেয়ের মতো—সাজসজ্জার দৈন্য যার ঢাকা পড়ে অপূর্ব লাবণ্যে। কিম্বা অন্যভাবে বলা যায়, পূজোর উপচারটা তাঁর কাছে বড় নয়, আসল উপলক্ষ অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা। এর কারণ হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের রচনার মতোই ব্রাহ্মধর্মীয় সংযম বোধ। উচ্ছ্বাস রহিত আনন্দ প্রকাশ। কী রাগরাগিনীর গান, কী বাউল, কীর্তন কিম্বা প্রসাদী সুর সর্বত্রেই তিনি এই বৈশিষ্ট্যে গান বেঁধেছিলেন। রজনীকান্তের গানের এই সংযমী বৈশিষ্ট্যই তাঁর গায়কী। তাঁর গানের আরো একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল এর পাঠছন্দ ও গীতছন্দ এক। বিরল দু'একটি গান আছে এর ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। নচেৎ যদি কোন গানের পাঠছন্দ থাকে চতুর্মাত্রিক চালে তা হলে সে গান গীত হয়ে থাকে কাহারবা, কাওয়ালী কিম্বা ত্রিতালে। আবার যদি গানের পাঠছন্দ থাকে ত্রিমাত্রিক বা ষন্মাত্রিক পর্ব বিশিষ্ট তা হলে সে গানের গীত ছন্দও হবে দাদরা বা একতালা-এ নিবদ্ধ।

এই সব নানা বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে ঋদ্ধ রজনীকান্তের গান আজ নানা কারণে তেমন ভাবে প্রচারিত হচ্ছে না। এ বড়ই দুঃখজনক বিষয়। অথচ অন্যান্য গীতিকবি সুরকারদের তুলনায় রজনীকান্তের গান অত্যন্ত বেশি পরিমাণে আন্তরিক অর্থাৎ আমাদের অনুভববেদ্য মনের কাছাকাছি বলেই, মাত্র চারশ' গানের বিনিময়ে আজও তিনি অমর হয়ে আছেন। এবং থাকবেনও ভাবী কালে॥

প্রফেসর ডাঃ জি. সি, মুখার্জী ও ডাঃ (মিসেস) কবীর প্রণীত—

''ডায়াবিটিসের জীবন ও চিকিৎসা''

(দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য—১৫ টাকা

ডায়াবিটিস রোগী, নার্স, সেবিকা প্যারা-মেডিকেল কর্মীদের জন্য সাবলীল সোজা বাংলায় লিখিত।

প্রকাশক : ন্যাশনাল ডায়াবিটিক এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া (ইষ্ট ইণ্ডিয়া)

৬, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০১

প্রাপ্তিস্থান—'আভা' কার্যালয়', ৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৬

নবজীবন (গল্প)

—কালীশঙ্কর মল্লিক (নয়া দিল্লী)

হাওড়া ষ্টেশন থেকে দিল্লীগামী রাজধানী এক্সপ্রেস ছাড়ল ঠিক পাঁচটা বেজে পাঁচে।

ওই ট্রেনের শীততাপনিয়ন্ত্রিত চেয়ারকারে অসীমা ও তার চার বছরের ছেলে অমিত দিল্লী যাচ্ছিল। ষ্টেশনে অসীমার বাবা, মা, দাদা ও ছোটভাই সী অফ্ করতে এসেছিলেন। আর এসেছিল তার বান্ধবী গীতা।

বাবা ও মা বলেছিলেন দিল্লী যাচ্ছ। খুব সাবধানে থেকো। একে মেয়েছেলে তার উপর সঙ্গে ছোট ছেলে। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব বলতে কেউ সেখানে নেই। পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। ফট্ করে কাউকে বিশ্বাস কোরো না। ভেবেচিন্তে কাজ করবে।

গীতা বলল আবার নতুন করে জীবন শুরু করিস। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে দুঃখ করিস না। যদি পারিস তবে আবার বিয়ে থা করে সংসারী হোস। জীবনযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিস না।

রাজধানী এক্সপ্রেস তীব্রগতিতে ছুটে চলেছে। অসীমা আকাশের দিকে চেয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জীবনে পরপর দুটো মানসিক আঘাত পেয়ে কলকাতায় থাকা তার পক্ষে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। সে মনে মনে কলকাতা ছেড়ে অন্য যে কোন জায়গায় চাকরী নিয়ে চলে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। আজ সেই সুযোগ এসে গেল।

অভিতের সঙ্গে ডাইভোর্স হবার পর সে বি. এড. কোর্সে যোগ দেয় ও দু'বছর বাদে পাশ করে যায়। বিয়ের আগেই সে ইংলিশে এম এ পাশ করেছিল। এখন বি. এড পাশ করায় শিক্ষিকার পদে চাকরী পাওয়া সুগম হয়ে গেল। লরেটো স্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করায় সে ইংরাজীটা খুব ভাল করে রপ্ত করেছিল। তারপর সে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে শিক্ষিকার পদের জন্য আবেদন করতে লাগল।

অনেক জায়গা থেকে ইন্টারভিউয়ের জন্য চিঠি এসেছিল। দিল্লীর একটা স্কুল থেকে পাওয়া ইন্টারভিউয়ের চিঠিটাই তার সব থেকে বেশী পছন্দ হল।

সে মাসখানেক আগে দিল্লীতে গিয়ে ইন্টারভিউ দিয়েছিল। সে ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হল। একমাস বাদে তার কাজে যোগ দেওয়ার কথা। সেই কাজেই যোগদানের জন্য সে দিল্লী যাচ্ছে।

বেতন দেড় হাজার টাকা। থাকার জন্য শিক্ষিকাদের হোষ্টেল আছে। সেখানে বিনা ভাড়ায় থাকার জন্য একখানা পৃথক ঘর পাবে। খাওয়ার খরচ অবশ্য তাকে দিতে হবে। অমিত সেই স্কুলে বিনা বেতনে পড়তে পারবে।

অসীমা একটা ইংলিশ জার্নাল খুলে দেখতে লাগল। কিন্তু জার্নালের দিকে চোখ থাকলেও আসলে মন তার অতীতের চিন্তায় বিভোর হয়ে গেল।

জীবনে প্রথম আঘাত এলো দীপকের কাছ থেকে। দীপক তার জীবনে প্রথম প্রেমিক। প্রায় চার বছর ধরে তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা চলেছিল। কিন্তু শেষে দীপক একদিন এক বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে শ্বশুরের আনুকুল্যে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত চলে গেল।

দীপকের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল স্কটিশ কলেজে যখন সে বি. এ ক্লাশের ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে। দীপক ওই কলেজেই পড়ত বি, এ ক্লাশের থার্ড ইয়ারে। দীপকের ছিল ইকনমিক্সে অনার্স আর অসীমার ছিল ইংলিশে অনার্স।

দীপক ছিল কলেজের ষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের কালচারাল বিভাগের সেক্রেটারী। কলেজে কতগুলো সোস্যাল ফংসান হতো সেই ছিল প্রধান উদ্যোক্তা। সেবার বর্ষোৎসব উপলক্ষ্যে কলেজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলেজের হলে একটা জলসার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যেই দীপকের সঙ্গে অসীমার আলাপ হল। অসীমা সুন্দর রবীন্দ্র সংগীত গাইতে পারত। সেই দিনের অনুষ্ঠানে সে চারখানা রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেছিল। তার গান শুনে সকলেই খুব প্রশংসা করেছিল।

অনুষ্ঠানের শেষে দীপক বলেছিল আপনার গান শুনে খুব আনন্দ পেলাম। আপনার গলা খুব মিষ্টি।

অসীমা ধন্যবাদ জানাল।

মেম সাব চা।

রাজধানী এক্সপ্রেসের বয়ের ডাকে অসীমার অতীতের স্মৃতির রোমন্থনে বাধা পড়ল। বয় সামনের সীটের সঙ্গে আঁটা খাবারের টেবিলটাকে টেনে তার উপর এক ফ্লাক্স চা ও বিস্কুট ও অমিতের জন্য বিস্কুট দিয়ে গেল। অসীমা চা ও বিস্কুট খেতে লাগল ও অমিতকে বিস্কুট খেতে দিল।

চা খাওয়ার পর অসীমা আবার অতীতের চিন্তায় বিভোর হয়ে গেল।

কলেজে দীপকের সঙ্গে তার প্রায় রোজই দেখা হত। দীপকই তার সঙ্গে কথা বলবার জন্য এগিয়ে আসত। এরপর দুজনে মাঝে মাঝে কফি হাউসে যেত। কোনদিন গঙ্গার ধারে বেড়াতে যেত। কখনও বা ম্যাটিনী শোতে সিনেমা দেখতে যেত। এইভাবে মেলামেশার ফলে একে অপরকে ভালবেসে ফেলেছিল।

দীপক বলেছিল এম. এ পাশ করে সে অধ্যাপনা করবে নয়ত সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ফাইনান্স বিভাগে অফিসারের চাকরী করবে।

অসীমাও বলেছিল সেও বি. এ পাশ করে বি. এড পড়বে। বি. এড পাশ করে শিক্ষিকার চাকরী নেবে। দুজনের মিলিত রোজগারে তাদের সংসার বেশ ভালভাবেই চলবে।

দীপক ভালভাবেই ফার্ষ্টক্লাশ পেয়ে বি. এ পাশ করল ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিক্স এ এম. এ ক্লাশে ভর্ত্তি হল।

এক কলেজ থেকে বিছিন্ন হলেও তাদের অন্তরঙ্গতা আগের মতই চলতে লাগল।

এর দুবছর বাদে দীপক ফার্ষ্টক্লাশ পেয়ে এম. এ পাশ করল আর অসীমাও ফার্ষ্ট ক্লাশ পেয়ে বি. এ পাশ করল। দুজনের আনন্দের সীমা রইল না। একে অপরকে কনগ্রাচুলেশন জানাল।

কয়েকদিন বাদে দীপক অসীমাকে জানাল যে সে অনেক জায়গায় চাকরীর আবেদন করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই সে আশা করছে চাকরী পেয়ে যাবে ও তারপর তাকে বিয়ে করবে।

একদিন সে জানাল যে সে একটা কলেজে চাকরীর ইন্টারভিউ দেবার জন্য এলাহাবাদ যাচ্ছে। সেখানে তার ভগ্নিপতি থাকেন। তাঁর খুব প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। তিনি চেষ্টা করলে সে চাকরীটা পেয়ে যেতে পারে। সেজন্য তাকে এলাহাবাদে কিছুদিন থাকতে হবে। অসীমা যেন চিন্তা না করে।

সপ্তাহ খানেক বাদে অসীমা দীপকের কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। তাতে দীপক লিখেছে যে সে একটা কলেজে ইন্টারভিউ দিয়েছে। চাকরীটা পাওয়ার খুব সম্ভাবনা। এর দিন পনেরো বাদে অসীমা আর একটা চিঠি পেল। তাতে সে লিখেছে ওই কলেজে তার চাকরীটা হল না। কলেজ কর্তৃপক্ষ পি. এইচ ডি ডিগ্রীধারী এক ব্যক্তিকে ওই পদে মনোনীত করেছে। ও আর একটা কলেজে ইন্টারভিউ দেবে। অসীমা যেন চিন্তা না করে।

এরপর একমাস কেটে গেছে। অসীমা দীপকের কাছ থেকে আর কোন চিঠি পেল না। সে চিঠি লিখল কিন্তু তার কোন উত্তর পেল না। সে তখন দীপকের কলকাতার বাড়ীতে খোঁজ নিল। সেখানে জানল দীপক এলাহাবাদেই আছে। কবে ফিরবে তার কোন ঠিক নেই।

অবশেষে দীপকের এলাহাবাদ যাবার তিনমাস পরে অসীমা দীপকের কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। চিঠিটা এসেছে বিলেত থেকে। তাতে দীপক লিখেছে

অসীমা,

অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম যে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে গেলে কেরিয়ারটা ভালভাবে তৈয়ারী করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কেরিয়ারটা তৈয়ারী না করে সাধারণ একটা চাকরী করে তোমাকে বিয়ে করে সাধারণভাবে জীবনটা কাটিয়ে প্রেমের জয়গান করার মধ্যে কোন মহত্ত্ব নেই। আমি দুটো কলেজে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। কিন্তু দুজায়গাতেই বিফল হলাম। দুটো কলেজেই পি, এইচ, ডি ডিগ্রীধারীরাই মনোনীত হল। আমাকে পরাজয়ের গ্লানিমা নিয়ে ফিরে আসতে হল। তখনই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমাকে পি. এইচ ডি করতেই হবে। সুযোগও এসে গেল। আমার ভগ্নীপতির এক আত্মীয় কেন্দ্রীয় সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনিই আমাকে গভর্ণমেন্টের একটা স্কলারশিপ পাইয়ে দিয়েছেন। তার ফলেই আমি আজ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পি, এইচ. ডি করবার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু তার জন্য তাঁর মেয়েকে বিয়ে

করে এর প্রতিদান দিতে হয়েছে। আশাকরি আমার অবস্থা বিবেচনা করে তোমাকে বিয়ে করতে না পারার জন্য আমাকে ক্ষমা করবে। তুমি আমাকে ভুলে যেও ও শীঘ্রই বিয়ে করে সংসারী হয়ো। তাহলেই আমি আন্তরিক খুশী হব।

ইতি

দীপক

এই চিঠি পাবার পর অসীমা সাতদিন ভালভাবে খাওয়া দাওয়া করেনি। কারো সঙ্গে ভালভাবে কথা বলেনি। সারাদিন শুয়ে বসেই কাটিয়ে দিল। দীপক যে এইভাবে তার সঙ্গে প্রতারণা করবে তা সে ভাবতেই পারেনি।

সাতদিন পর থেকে অসীমা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশে এম, এ ক্লাশে ভর্ত্তি হল ও নিয়মিত ক্লাশ করতে লাগল। যে লোকটা তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে তার জন্য নিজের জীবনটা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

অসীমা এবার স্থির করল আর কোনো ছেলের সঙ্গে ভাব করবে না। বাবা মায়ের পছন্দ করা ছেলেকেই বিয়ে করবে।

এরপর কয়েক জায়গা থেকে অসীমার জন্য সম্বন্ধ এলো। কিন্তু হয় পাত্র পক্ষের অসীমাকে পছন্দ হল না নয়ত পাত্রী পক্ষের পছন্দ হল না।

এইভাবে দুবছর কেটে গেল। অসীমা ইংলিশে এম, এ পাশ করল। সে এবার বি, এড ক্লাশে ভর্ত্তি হল। এর কয়েকমাস বাদে একটা সম্বন্ধ এলো। পাত্র আমেরিকায় চাকরী করে। মাসে পনেরো হাজার টাকা বেতন পায়। এখানে বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকায় চলে যাবে। পাত্র একমাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছে।

অসীমার বাবা ও মা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে স্থির করলেন এরকম পাত্র হাতছাড়া করা মোটেই উচিত হবে না। তারা মেয়েকে দেখাতে রাজী হলেন। পাত্রপক্ষ ও পাত্র নিজে এসে অসীমাকে দেখে পছন্দ করলেন। দিন পনেরো বাদেই বিয়ের দিন ধার্য হল।

বিয়ে বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন হল। সকলেই এটা অসীমার সৌভাগ্য বলেই বিবেচনা করলেন।

অসীমার বাবা মা বিয়েতে প্রচুর খরচ করলেন। বিয়ের দিন পনেরো বাদে অসীমার স্বামী অজিত আমেরিকায় চলে গেল ও বলে গেল অসীমার জন্য পাশপোর্ট ও ভিসা তৈয়ারী হয়ে গেলেই তাকে আমেরিকায় নিয়ে যাবে।

প্রায় তিনমাস বাদে অসীমার পাশপোর্ট ও ভিসা তৈয়ারী হয়ে গেল। অজিত নিজে এসে অসীমাকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকায় চলে গেল।

মেম সাব ডিনার। বয়ের ডাকে অসীমার আবার চিন্তায় ছেদ পড়ল।

সে ও অমিত নৈশভোজ সেরে নিল। কিছুক্ষণ পরে জোরালো আলো কমে গিয়ে খুব নিস্প্রভ হয়ে গেল। গাড়ীর সকলে ঘুমোবার উদ্যোগ করতে লাগল। অসীমা ও অমিত গায়ে একটা চাপা দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করল। অমিত প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু অসীমার চোখে ঘুম এলো না। মন আবার সেই পুরাণো চিন্তায় ফিরে গেল।

আমেরিকায় ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছে অসীমার কিছুদিন খুব আনন্দে কাটল। বিশাল সুন্দর বাড়ীঘর, প্রশস্ত ঝকঝকে তকতকে রাস্তা, সন্ধ্যায় শহরে আলোকসজ্জা দেখে মনে হল যেন স্বপ্নপুরীতে এসেছে। অজিতের ফ্ল্যাটটাও ছোট হলেও বেশ চমৎকার। তাছাড়া আছে অর্থ ও সব জিনিষের প্রাচুর্য্য। তার বেশ ভালই লাগল।

কিন্তু তার স্বপ্নভঙ্গ হতেও বেশী দেরী হল না। কিছুদিন বাদেই জানতে পারল অজিতের লেখাপড়া বেশীদূর এগোয় নি। আণ্ডার গ্রাজুয়েট। অফিসে টাইপিষ্টের কাজ করে। কিন্তু বেতন সত্তাই মাসে পনেরো হাজার টাকা।

সে আরও জানতে পারল বছর পাঁচেক আগে কলকাতায় বি. এ পরীক্ষায় ফেল করে অজিত কি করবে ভাবছে সেই সময় খবর পেল তার এক সহপাঠি বন্ধু প্রবীর আমেরিকায় চাকরী করে সে কিছুদিনের ছুটিতে কলকাতায় এসেছে। অজিত তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে দেখা করে ও তাকে বলে আমেরিকায় তারজন্য একটা চাকরী জোগাড় করে দিতে পারবে কিনা। প্রবীর অনেক চেষ্টা করে টাইপিষ্টের চাকরী জোগাড় করে দেয় ও তার জন্য গ্যারান্টর হয়। প্রবীরের চেষ্টায় অজিত আমেরিকায় যেতে সক্ষম হয়।

অসীমা আরও জানতে পারল অজিত বিয়ের আগে বহু আমেরিকান মেয়ের সংস্পর্শে এসেছে। কিন্তু আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করতে ভয় পায়। কারণ আমেরিকান মেয়েরা ভারতীয় মেয়ের মত স্বামীর বাধ্য নয়। কথায় কথায় ডাইভোর্স করে। এইসব ভেবেচিন্তে অজিত কলকাতায় গিয়ে অসীমাকে বিয়ে করে এনেছে।

অজিত প্রতিদিন মদ্যপান করত! অসীমাকে বলত যে দেশে যে রকম প্রথা সেটা মেনে চলতে হবে। প্রথম প্রথম অল্পের মাত্রায় পান করত। অসীমা সেটা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু মদ খাওয়ার মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল। মদের নেশায় অসীমাকে গালাগালি করত। অসীমা বাধা দিলে তাকে মারধোর করত। এজন্য অজিতের সংস্পর্শ অসীমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

বিয়ের বছরখানেক বাদে অসীমা জানতে পারল যে সে মা হতে চলেছে। একথা অজিতকে জানাতে সে খুব খুশীর ভাব দেখাল। একদিন অজিত অসীমাকে বলল এ সময় তোমার কলকাতাতে বাপের বাড়ীতে থাকা উচিত। আমি একা কোন দিক সামলাব।

অসীমার এ পরামর্শটা ভালই লাগল। সেও কিছুদিন ধরে মনে মনে বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাকবার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছিল। সে বলল তবে তাই হোক। ডেলিভারীর পর চার পাঁচ মাস কলকাতায় থেকে তারপর আমেরিকায় চলে আসব।

এর কিছুদিন বাদে অজিত অসীমাকে কলকাতাগামী প্লেনে চড়িয়ে দিল। অসীমা একাই কলকাতায় এসে বাপের বাড়ীতে গিয়ে উঠল। অসীমা অজিতকে অনেক করে বলেছিল যেন দু' সপ্তাহ অন্তর একটা করে চিঠি দেয়।

অজিত প্রথম প্রথম দু সপ্তাহ অন্তর একটা করে চিঠি দিত। তারপর মাসে একটা। তারপর দু তিন মাস অন্তর একটা।

যথাসময়ে অসীমার একটা ছেলে হল। অসীমার বাবা অজিতকে টেলিগ্রাম করে শুভ সংবাদ জানাল। অজিতও কনগ্রাচুলেশন জানিয়ে অসীমাকে একটা টেলিগ্রাম করল।

এরপর ছ'মাস কেটে গেল। অসীমা অজিতকে চিঠি লিখে কলকাতায় এসে তাদেরকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করল। কিন্তু অজিত উত্তর দিল তার পক্ষে এখন কলকাতায় যাওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ অফিস থেকে ছুটি পাবে না। যখন সুবিধা হবে তখন কলকাতায় এসে তাদেরকে নিয়ে যাবে।

আরও তিনচার মাস কেটে গেল। অজিত কিন্তু ওদেরকে নিয়ে যাবার জন্য কলকাতায় এলো না অথবা কোন চিঠি দিল না।

তখন অসীমা বাবাকে বলল ও যখন আসছে না তখন আমিই ছেলেকে নিয়ে আমেরিকায় চলে যাই।

অসীমার বাবা উপায়ান্তর না দেখে এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। আমেরিকায় যাবার প্লেনের টিকিটও কেটে দিলেন। অজিতকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলেন অসীমা কোন ফ্লাইটে ক্যালিফোর্ণিয়ায় পৌঁছবে। সে যেন এয়ারপোর্টে উপস্থিত থেকে স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে যায়।

নির্দ্দিষ্ট দিনে যথা সময়ে অসীমা ছেলেকে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছল। কিন্তু এয়ারপোর্টে অজিতকে দেখতে পেল না। সে তখন একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাটে গেল। সেখানে গিয়ে শুনল অজিত ফ্ল্যাট বিক্রী করে দিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারল না।

অসীমা অকূল পাথারে পড়ল। কী করবে কিছুই ভেবে পেল না। ওদের ফ্ল্যাটের কাছে এক বাঙ্গালী পরিবার থাকেন। অসীমা সেখানে গিয়ে সব কথা খুলে বলতে তাঁরা বললেন অজিতবাবু মাসখানেক হল ফ্ল্যাট বিক্রী করে কানাডায় চলে গেছে।

অসীমার এই বিপদে তাঁরা যথেষ্ট সাহায্য করলেন। ওনারা অসীমাকে কলকাতায় ফিরে যাবার উপদেশ দিলেন। যতদিন না কলকাতায় ফিরে যাবার ব্যবস্থা হয় ততদিন অসীমাকে ওদের ফ্ল্যাটে আশ্রয় দিলেন।

ভদ্রলোক অসীমাকে নিয়ে ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে অসীমার দুরবস্থার কথা বলে ওদেরকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু ভারতীয় দূতাবাস এ ব্যাপারে তাদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। নিরুপায় হয়ে অসীমা তার বাবার কাছে কলকাতায় ফিরে যাবার প্লেনের ভাড়ার টাকা পাঠাবার জন্য টেলিগ্রাম করল। যথাসময়ে তার বাবার কাছ থেকে টাকা এলো। সেই টাকায় প্লেনের টিকেট কেটে অসীমা ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলো।

অসীমার বাবা ও দাদা অজিতের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁরা অসীমাকে ডাইভোর্স করবার পরামর্শ দিলেন। অসীমার মা কিছুটা ইতঃস্তত করছিলেন। কিন্তু অসীমা ডাইভোর্স করার সিদ্ধান্তে অটল রইল। যে তাকে এইভাবে প্রতারিত করেছে তার সঙ্গে কোন রকম সংস্পর্শ রাখতে রাজী হল না।

এরপর অসীমা হাইকোর্টে ডাইভোর্সের জন্য স্যুট ফাইল করল। তার পক্ষে একটা সুবিধা ছিল যে সে তখনও পর্যন্ত আমেরিকান সিটিজেনশিপ পায়নি। সে এক তরফা ডিক্রী পেয়ে গেল। অজিতের সঙ্গে তার ডাইভোর্স হয়ে গেল।

এবার অবশ্য অসীমা ভেঙ্গে পরেনি। মনের জোরে সে বর্ত্তমান অবস্থা মেনে নিল। দুবার প্রতারিত হয়ে সে ঠিক করল বিয়ে আর করবে না। শিক্ষকতা করে ছোট ছেলেমেয়েদের মানুষ করবে।

রাজধানী এক্সপ্রেস তীব্রগতিতে ছুটে চলেছে। বাইরে ভোরের আলো একটু একটু করে ফুটে উঠছে। অসীমা প্রায় সারা রাতই নিজের অতীতের চিন্তায় বিভোর হয়ে না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিয়েছে। পাশের সিটে অমিত অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

অসীমা এবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

মেম সাব চা।

বয়ের ডাকে অসীমার ঘুম ভাঙ্গল। বয় বেড টি দিয়ে গেল। চা পানের পর অসীমা প্রাতঃকৃত্য সেরে নিল ও অমিতকে সারিয়ে নিল।

এরপর বয় প্রাতরাশ দিয়ে গেল। খাওয়ার পর অসীমা আবার ফিল্ম জার্নাল পড়তে লাগল। ট্রেন যত দিল্লীর কাছে আসতে লাগল তত একটা অজানা আশঙ্কায় মন আতঙ্কিত হতে লাগল।

ঠিক সাড়ে দশটার সময় রাজধানী এক্সপ্রেস নতুন দিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছল। ট্রেন থেকে নামবার সময় দেখতে পেল স্কুলের দুজন শিক্ষিকা এসেছেন। স্কুলে ইন্টারভিউ দেবার সময় অসীমা এঁদেরকে দেখেছিল। তাঁরা অসীমাকে দেখে নমস্কার করে স্বাগত জানাল। অসীমাও প্রতি নমস্কার করল।

কুশলাদি প্রশ্নের পর লাগেজ ভ্যান থেকে মালপত্তর খালাস করে ষ্টেশন থেকে বেড়িয়ে এসে স্কুলের বাসে চড়ে তারা স্কুল অভিমুখে রওনা হল। স্কুলটা রামকৃষ্ণপুরমে। ষ্টেশন থেকে দশ মাইল দুরে। বাসে চড়ে যেতে যেতে অসীমা চারিপাশের দৃশ্য দেখতে লাগল। পরিস্কার

পরিচ্ছন্ন শহর। ফাঁকার ওপর। চওড়া চওড়া সুন্দর পীচের রাস্তা। কোথাও খানাখন্দ নেই। রাস্তার দুপাশে গাছের শ্রেণী। প্রত্যেকটা বাড়ীর সামনে বাগান। সুন্দর সুন্দর ঝকঝকে তকতকে বাড়ীঘর। অসীমার মন আনন্দে ভরে গেল।

বাস স্কুলে এসে পৌঁছল। বিরাট দোতলা বাড়ী। বিরাট কম্পাউণ্ড। স্কুল বাড়ী ছাড়িয়ে অনতিদূরে আর একটা বিরাট দোতলা বাড়ী। সেটা শিক্ষিকাদের হোষ্টেল। স্কুল ও হোষ্টেল বাড়ী দেখে অসীমার খুব ভাল লাগল।

অসীমাকে যে দুজন শিক্ষিকা ষ্টেশনে রিসিভ করতে গেছলেন তাঁদের একজন হলেন মিসেস্ মালহোত্রা আর একজন মিস্ সুন্দরম। তাঁরা অসীমাকে হোষ্টেলে নিয়ে গিয়ে তার ঘর দেখিয়ে দিল। সুন্দর সাজানো গোছানো মাঝারি সাইজের ঘর। অসীমার ঘর পছন্দ হল। স্কুলের চাকর তার মালপত্র ঘরে রেখে গেল।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে স্নান সেরে তাজা হয়ে চা ও জলখাবার খেয়ে নিল। অমিতও খেল। এরপর তারা হোষ্টেলটা ঘুরে ফিরে দেখল। দোতলা বাড়ী। মোট কুড়িটা ঘর। শিক্ষিকার সংখ্যা পঞ্চাশজনের মত। হোষ্টেলে পঁচিশ জন শিক্ষিকা থাকেন। বাকীরা দিল্লীর নানা জায়গায় তাঁদের পরিবারের সঙ্গে থাকেন। একটা হল ঘরে লাইব্রেরী। সেখানে প্রচুর ইংরাজী ও হিন্দী বই আছে। আর একটা ঘর কমনরুম। সেখানে কালার টি. ভি আছে।

কিছুক্ষণ পরে মিস্ সুন্দরম বললেন অসীমাদি, হোষ্টেল সুপারিনটেনডেন্ট আপনাকে ডাকছেন।

আসুন।

অসীমা হোষ্টেল সুপারিনটেনডেন্ট মিস্ কাউলের সঙ্গে দেখা করলেন।

মিস্ কাউল বললেন আমাদের হোষ্টেল কী রকম দেখলেন? পছন্দ হয়েছে তো?

অসীমা বলল আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

মিস্ কাউল বললেন এবার স্কুলটা দেখে আসুন। মিস্ সুন্দরম্ আপনাকে দেখিয়ে আনবে।

অসীমা মিস্ সুন্দরমের সঙ্গে স্কুল দেখতে গেল। সেখানে প্রথমে হেডমিসষ্ট্রেসের ঘরে গিয়ে হেডমিসষ্ট্রেস্ মিসেস চোপড়ার সঙ্গে আলাপ করল। তারপর টিচার্সরুমে গিয়ে অন্য শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলাপ করল।

অসীমা দেখল এই স্কুলে ভারতের প্রায় সব রাজ্যেরই লোক আছে। পাঞ্জাবী, ইউ পি ওয়ালা, কাশ্মীরী, তামিল, মারাঠী। বাঙ্গালী সে ছাড়া আর একজন আছেন। কথাবার্ত্তা হয় ইংরাজীতে নয়ত হিন্দীতে। কখনও কখনও ইংরাজী ও হিন্দী মিশিয়ে। নানাজাতের হলেও একই পরিবারভুক্তের মত।

অন্য যে বাঙ্গালী শিক্ষিকা আছেন তার নাম দীপিকা বোস। বয়স চব্বিশ পঁচিশের মত। তার সঙ্গে অসীমার বেশ ভাব হয়ে গেল।

তারপরের দিন থেকে অসীমা স্কুলে যোগদান করল। অমিত স্কুলেরই কে, জি ক্লাশে ভর্ত্তি হল। অসীমার ওপর ভার পড়ল ক্লাশ সেভেন ও এইটের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। সেজন্য তার সুবিধা হল। তার পড়ানো ছেলেমেয়েদের বেশ ভালই লাগল।

স্কুলের পড়ানোর পর অন্য সময়টা অমিতকে পড়িয়ে, অন্য শিক্ষিকাদের সঙ্গে গল্প করে, টি, ভি দেখে ও লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে পড়ে বেশ ভালভাবেই সময় কাটতে লাগল। রবিবার ও অন্য ছুটির দিনগুলো দিল্লীর নানা দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো ঘুরে দেখতে লাগল।

দিল্লীর সুন্দর প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই তার ও অমিতের স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হল। মনও ভাল হল।

অন্য শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলেও স্বাভাবিকভাবেই দীপিকার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা গভীর হল। তারা তাদের মনের কথা একে অপরের কাছে ব্যক্ত করত।

দীপিকার কাছে অসীমা তার ডাইভোর্সের কথা বলেছিল। দীপিকাও বলেছিল তার বাবা মা নেই। এক দাদা আছেন। তিনি দিল্লীর একটা কলেজের অধ্যাপক। দাদার বিয়ে হয়েছিল এক ধনীলোকের মেয়ের সঙ্গে। সে ছিল ভীষণ খরচে। দাদার যা রোজগার তাতে বেশ ভাল ভাবেই সংসার চলে যাবার কথা। কিন্তু বৌদির খরচ অনেক বেশী। সেজন্য দাদাকে খুব কথা শোনাত। বছর খানেক ঘর করবার পর সে একদিন দাদার সঙ্গে ডাইভোর্স করে দাদারই এক পাঞ্জাবী ধনী ব্যবসায়ী বন্ধুকে বিয়ে করেছে। সে বন্ধুর সঙ্গে অবশ্য দাদার বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

একদিন দীপিকার দাদা সমর এলো দীপিকার সঙ্গে দেখা করতে। দীপিকা অসীমার সঙ্গে সমরের আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল অসীমাদি খুব ভালো রবীন্দ্র সংগীত গাইতে পারে।

সমর শুনে বলল তাই নাকি। তবে তো একদিন আপনার গান শুনতে হবে। আমাদের একটা সাংস্কৃতিক ক্লাব আছে। নাম চলোর্মি সংঘ। সেখানে মাসে একটা করে সভা হয়। তাতে সদস্যরা তাদের লেখা গল্প প্রবন্ধ, কবিতা পাঠ করেন। অনেকে গান গেয়ে শোনান। আপনিও আমাদের সংঘের সদস্যা হয়ে যান। স্ত্রী, পুরুষ সবলেই যোগ দিতে পারেন। অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে। বেশ ভাল লাগবে।

অসীমা রাজী হল। তারপর একদিন চলোর্মি সংঘের আমন্ত্রণ পত্র এলো। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস পালনের। অসীমা সেই সভায় গেল। অনেক সভ্য ও সভ্যা স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন। অনেকে রবীন্দ্রনাথের লেখার ওপর নানা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করলেন। অনেকে কবির কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। অনেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করলেন। অসীমাও কয়েকখানা রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনাল। সকলেই তার গানের প্রশংসা করলেন।

এরপর প্রত্যেক মাসিক সভায় অসীমা রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করত।

ক্রমে দুর্গাপুজা এসে গেল। রামকৃষ্ণপুরমের বাঙ্গালী বাসিন্দারা প্রত্যেক বছরের মত এ বছরের দুর্গাপূজার আয়োজন করল। দুর্গাপুজা উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অসীমা রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনাল। সমরই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

এইভাবে অসীমা ও সমর উভয়ে বেশ ঘনিষ্ঠ হল। কিন্তু অসীমা বেশ আড়ষ্ট থাকত। স্বাভাবিকভাবে মিশতে পরত না। অতীতে দুবার সে প্রতারিত হয়েছে। সেই স্মৃতি মনে থাকায় সে খুব ভেবেচিন্তে প্রতি পদক্ষেপ ফেলত।

অসীমার দিল্লী আসার এক বছর পূর্ণ হল। এক শনিবার সন্ধ্যায় সংঘের সভার পর সমর বলল কাল বিকেলে কি আপনি ফ্রি আছেন?

অসীমা বলল হ্যাঁ।

সমর বলল তাহলে কাল বিকেল ছটার সময় কনট সার্কাসে ওয়ার্ল্ডরক রেষ্টুরেন্টে চা পানের নিমন্ত্রণ রইল।

অসীমা এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল।

পরদিন রবিবার বিকেলে অসীমা ভালভাবে সাজগোজ করে ঠিক ছটার সময় ওয়ার্ল্ডরফ রেষ্টুরেন্টে উপস্থিত হল। সমর কিছুক্ষণ আগে এসে তার জন্য রেষ্টুরেন্টের সামনে অপেক্ষা করছিল। অসীমাকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

তারপর তারা রেষ্টুরেন্টে প্রবেশ করল। নামজাদা অভিজাত রেষ্টুরেন্ট। খুবই সুন্দর সাজানো গোছানো। মৃদু আলো জ্বলছিল। সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে কনসার্ট বাজছিল। একটা স্বপ্নিল পরিবেশ রচিত হয়েছিল। প্রতি টেবিলের দুপাশে নরম গদীওলা সোফা। ওরা একটা সোফায় পাশাপাশি বসল। ষ্টুয়ার্ড এসে অর্ডার নিল। সমর নানা খাদ্যসামগ্রী ও চায়ের অর্ডার দিল।

বয় খাদ্যসামগ্রী ও একটা পটে চা দিয়ে গেল। তারা খাবার খেতে খেতে নানা গল্প করতে লাগল।

সমর একসময় বলল আপনি আবার বিয়ে করছেন না কেন?

অসীমা বলল ভয় করে। তাছাড়া আমার মত ডিভোর্সিকে কে বিয়ে করবে। আমার আবার ছেলে আছে।

সমর বলল যদি বলি আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী আছি? তোমার মত আমিও ডিভোর্সি। এক বছর ধরে আমাদের মেলামেশা হয়েছে। আমাকে বিয়ে করতেও কী তোমার ভয় করবে?

অসীমা বলল, না। কিন্তু আমার ছেলেকে কী তোমার ছেলে বলে মেনে নিতে পারবে?

সমর বলল নিশ্চয়ই। তোমার ছেলে আমারও ছেলে।

অসীমা সমরের কাছে আরও ঘেঁষে বসল ও তার হাতের ওপর নিজের হাত রাখল।

জেনারেশনের হাত

(রম্যরচনা)

নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়

ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড—কথাটা ভারী সুন্দর ; কতো শান্তির। এজন্যে টমাস হার্ডিকে খুবই রোম্যান্টিক লাগে।

এতোদিন স্বপ্ন দেখেছি—কবে আমার 'ধন নয় মান নয় এতোটুকু বাসা'—হবে ? 'আশার' ছলনায় ভুলে পলিটিক্স পীড়িত দেশের ক্লেশ নিয়েই জীবন কাটিয়েছি।

• • • • •

সাধারণতঃ যে কোন বাড়ীতেই একটা কলিং-বেল্ থাকে। এতোকাল একতলায় ছিলুম। কলিং বেল্ এর জীবনেও উত্থান পতন ছিল। ভিখিরীরা বেল্ দিয়ে ভিক্ষে চাইত ; চাঁদা আদায়কারী কিংবা জিভ্ কাটা বোবা মেয়েদের আবেদনপত্র সরাসরি হাত বাড়াতে পারতো দরজা খোলা মাত্রই ! নয়তো বেল্ এর ও বারোটা বাজতো ! ঢিলের আঘাতে আহত নিহত দুই-ই হতো !

অনেক কষ্টে দোতলার ফ্ল্যাটের সংস্থান হলো। একতলায় সারি সারি হাত দেখতে দেখতে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলছিলুম। শিব, দুর্গা, সরস্বতী থেকে শুরু করে বিদেশিনী সন্তোষী মা পর্যন্ত কুমারীদের বর খুঁজে দেবার অছিলায় অসংখ্য চাঁদার হাত তৈরী করেছিলেন।

• • • • •

দোতলায় উঠতে গিয়ে প্রথমেই বিরাট হাতের ধাক্কা—অর্থাৎ প্রোমোটারের পাতা হাতে বিনা রসিদেই ছয় অঙ্কের উপহার ! তারপর পাড়া যতো দক্ষিণে যাচ্ছে—ততোই ধর্মের দাক্ষিণ্য ! কালি, শনি, শীতলা, মনসা, জয়মঙ্গল, ইতুর সঙ্গে বড়ো বড়ো কুলীন দেবদেবী রকমারি চাঁদার খাতা খুলে ধরলেন ! এক নাগাড়ে চলছে। এ ম্যারাথন থামবার নয়।

বারোয়ারী বাড়ীর মার্বেলের সিঁড়ি, চকচকে ফ্লোর ; বাথরুম—রান্নাঘরের মডার্ণ চেহারা ; অনেক টাকা না হলে কি এসব রাখতে পারে কেউ ? সুতরাং এদের অনেক টাকা। লজিকে কোন ভুল নেই। তাই শত শত টাকার হুমকি। নয়তো রাস্তায় বেরোলেই দেখে নেবে পাড়ার দেশ-উদ্ধার-কর্তারা ! এদের গলার জোর, বুকের জোর, কব্জির জোর সবই রাজনৈতিক মদত পুষ্ট। ভীত, সন্ত্রস্ত, কাপুরুষ বাঙালী কি না দিয়ে পারে ? দশতলায় উঠলেও পারে না।

দেওয়াই সৌজন্য ; দেওয়াই মনুষ্যত্বের চরম প্রমাণ। বাস, ট্যাক্সি, টেম্পো, লরীর অন্তরীক্ষ-ফাটানো হর্ণ আর কানে আসছে না। কানের পর্দা আগে থেকেই আহত হয়ে রয়েছে। রাস্তার

আওয়াজ নেই বলেই বোধ হয় এবারে দোতলায় প্রোমোশন পেয়ে টমাস হার্ডির রোম্যান্টিকতা অনুভব করার সুযোগ হলো? কিন্তু না। তেরাত্তির লাগাতার নাটক, চব্বিশঘণ্টা ভজন, বিয়েবাড়ীর হিন্দিগান, শনিপুজোর মাতব্বর রিক্সাওয়ালাদের সামান্য আনন্দবিনোদনের জন্যে মাইকের যে রকম বুকফাটা আর্তনাদ শুনতে পেলুম—তাতে কান, বুক, নিশ্বাসের যন্ত্র বন্ধ হবার জোগাড়।

* * * * *

ম্যাডিং ক্রাউড থেকে দূরে এলেই হয় না। পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের একটা উপায় করতে হয়। সুতরং টেলিফোন অফিসে হাঁটাহাঁটি। রাশীকৃত টাকা জমা দিয়ে হার্ডল করতে করতে হেড-দপ্তরে পৌঁছতে হবে। সবাই বলছে কিছু ছাড়তে হবে। ধাপে ধাপে হাত পাতা আছে। হাতের গ্যাপ বন্ধ করতে পারলে সিঁড়ির শেষে ওঠা যাবে! তবেই না তারের মাধ্যমে পৃথিবী আসবে আমার হাতে! মন্দিরের পাশে অনেক দুঃস্থ, দরিদ্রকে ধন বিতরণ করতে করতে তবেই না দেবতার সিংহাসনের পাদপীঠে পৌঁছনো যায়? সেখানেও ঘুষ। জোড়াপাঁঠা থেকে সোনার নথ গড়িয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি পেলেই দেবতা চোখ মেলে দেখবেন;—কিছুই শুনবেন না। দেবমূর্তিকে নির্বিকার দেখাই আমাদের অভ্যাস। রূপং, জয়ং ইত্যাদি দেহি দেহি করবার আগে ই তো দিতে হয়! এইভাবেই আমরা দেওয়ার দক্ষতা লাভ করছি। 'মা ফলেষু' কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করছি।

* * * * *

ম্যাডিং ক্রাউড থেকে দূরে গেলেই কি লোড-শেডিং রেহাই দেবে!

রাত-দুপুরে জেনারেটর চলতে শুরু করলো গাঁক গাঁক করে। মাস্তানদের ঘুম গেলো ভেঙ্গে। ওদের মাথার ওপর ফ্যান নেই। ছাতে কিংবা রোয়াকে শুয়ে রাত কাটায়। ঘুম ভেঙ্গে গেলে কিছু তো করতে হবে। না হয় হামলাই করা যাক্। এপাশ ওপাশ থেকে ছুটে এলো মাস্তানরা। নতুন ফ্ল্যাট বাড়ীর এতো স্পর্ধা? মাস্তানদের ঘুম ভাঙ্গায়? তারা তো জেনারেটর ছাড়াই ঘুমোয়? তোমরা পারবে না কেন? নতুন বাড়ীর নতুন বাসিন্দা—তাতে হলো কি? নতুন দেয়ালেই লিখে দিয়েছি না আমরা? আমাদের দাবী মানতে হবে—জেনারেটর বন্ধ করতে হবে। নয়তো ঢিল মেরে জেনারেটরের বারোটা বাজাবো। তোমাদের কপালের লিখন যাবে উল্টে। কথা বলতে এলে গলা টিপে দেবো।

ফ্ল্যাট বাড়ীর বারোয়ারী জেনারেটর বন্ধ হলো। নেমে এলো সদ্য ঘুম ভাঙ্গা বিরক্ত কর্তারা।

জিনস্, লুঙ্গি, শর্টস, পাজামার ওপর চকরা বকরা জামা গিজগিজ করছে চোখের সামনে। এরা কারা? ইতু পুজো, ঘেঁটু পুজোর হিড়িকে চাঁদার খাতা খুলে পথ আটকায় আর মাইকের মারফৎ হিন্দি-ফিল্ম-গীত শুনিয়ে তাবৎ স্বর্গ, মর্তা, পাতালের ঘুম ভাঙ্গায়? এরাই তো?

ওদের হাত ভরানো দরকার। তবেই মুখ বন্ধ হবে। টাকা দিয়েই ভরাতে হবে। টাকাই শান্তি কিনতে পারে। ঘুম ও।

কর্তারা নিজেদের মধ্যে নীচু সুরে কথাবর্তা বলতে লাগলেন। হাত ভরানোর উপাদান জানা আছে। দিতে হবে। আমাদের দেবারই কথা। দিতে দোষ কি? ট্যাক্সির মিটারে নির্দিষ্ট ভাড়ার চেয়ে কি বাড়তি দিচ্ছি না? পুজোর সময় ডাক-পিওনরা দল বেঁধে এসে হাত পাতে—দিতে হয়। নয়তো জরুরী চিঠিপত্র ঐ হাতেরই কায়দায় নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দেবে।

বখশিস দেবারই বস্তু। ওদের নাম লেখা আছে অফিসের খাতায়। মাইনে পায়। বোনাস্ ও। তবে মাইনে, বোনাস আর বখশিস কি একই হলো? ওদের মতো মনুষ্যত্বের লম্বা হাত আমাদের নেই। তবে মানুষের কথা চিন্তা করতে হবে বৈ কি? আমরা ছাড়া সে চিন্তাটা করবে কে?

রাজনীতি পুষ্ট মাস্তানদের দোষ নেই; ভিটামিন-হীন দেহে ব্যাঘ্র বিক্রম। ওরা ব্যাঘ্র গর্জনে ইংরিজি মিশিয়ে অনবদ্য বাংলায় বললো—

—কিছু তো ছাড়তে হবে। আমাদের এই লোক্যালিটি ছেলেদের কাঁচা ঘুম ভাঙ্গালে এমনি প্যাঁদানি চলবে তখন ফাদার কি—ফোর্টিন ফাদারের লাশ ফেলে দেবো!—

বিশ্ববিদ্যালয় এর চেয়ে সাধুভাষা ওদের ঝুলিতে আর দিতে পারে নি।

কণ্ডারা পার্স খুললেন। বড়ো মাস্তানকে বললেন—এই নাও ভাগ করে নাও তোমরা। তোমরাই তো নেকস্ট জেনারেশন; তোমরা দেশের ভবিষ্যৎ।

* * * * *

জেনারেশন-গ্যাপ ভরাতে গিয়ে এমনি করেই আমরা এক জেনারেশন আর এক জেনারেশনের হাত ভর্তি করতে করতে সমগ্র বাঙালী জাতটাকেই ভিখিরি বানিয়ে দিচ্ছি।

কুছ্ পরোয়া নেই।

জেনারেটর পুনরায় গাঁক গাঁক করে চলতে লাগল।

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের বিশেষ কবিতাগুচ্ছ

প্রেমকে, মৃত্যুকে চিনে

মূল্য—১৫·০০

পরিবেশক : এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ।

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির আসলি চেহারা

(নিবন্ধ)

জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকসভায় ইদানীং লোকসভায় প্রায়ই সদস্যগণ নিজ রাজ্যের স্বার্থ চিন্তায় বেশি ব্যাপৃত লক্ষ্য করা যায়। গোটা ভারতবর্ষের চিন্তা গত চল্লিশ বছর ধরে বিলুপ্ত হয়েছে। কেবল আতঙ্কবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অপরাধি করলে হবে কি। এ চিন্তাটা বাঙ্গালীর জীবনে সামান্য সাড়া জাগালেও মস্তিষ্কে ঢুকতে পারেনি। দুর্বল জাত বলে হয়ত পারেনি। তবে অন্য একটা কারণও আছে।

ভারতে স্বাদেশিকতা ও জাতিয়তাবাদ বাঙ্গালি ইংরেজ চরিত্রের উত্তরাধিকারী হয়ে সর্বপ্রথম ভেবেছিল ; পাশ্চাত্য শিক্ষা অর্জন করেছিল। স্বভাবত আবেগ প্রবণ বাঙ্গালি সেই উত্তরাধিকারকে ভুলতে পারেনি। দ্বিতীয়ত অর্থে ও শরীরে অন্য সব ভারতীয়ের চেয়ে বাঙ্গালি দুর্বল বলে। এ কারণে স্বাধীনতালাভের সময় প্রশাসন মূলত এদের হাতে থাকলেও, নিজেদের কোন যোগ্যতা কাজে লাগাতে পারেনি। অপরপক্ষে আগাগোড়া আত্মমগ্ন জাতিগুলি স্বাধীনতার পরে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েই স্বার্থচিন্তায় প্রথম থেকে হন্যে হয়ে উঠল। দুর্বল বাঙ্গালি আবেগের শিকার হয়ে দুর্বলতর হল।

স্বাধীনতার পর ভারতীয় সামাজিক মানচিত্রে ছবিটা তাই বদলে গেল। অন্য ভাষাভাষী রাজ্যগুলির আর্থিক শোষণের তাগিদ ও শাসকের ভূমিকালাভের মোহ বাঙ্গালিকে পরাস্ত করল সম্পূর্ণ। রিপুতাড়িত মনুষ্যকুলে এসব থাকবে সেটা স্বাভাবিক। হুজুগপ্রিয় বাঙ্গালির তা নেই বলেই যত সমস্যা। কিন্তু সবচেয়ে রূঢ় সত্য হল, অবাঙ্গালিরা জাতিগতভাবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দ্রুততর দক্ষতায় সভ্য, শিক্ষিত, একতাবদ্ধ, শ্রমজীবী ও অর্থশালী যে হয়েছে, এসত্যে কোন ফাঁক নেই। বাকসর্বস্ব বঙ্গজ অধিকতর বাকপটু, রুচি সংস্কৃতিহীন, অসভ্য, কর্মে অদক্ষ বলে সর্বত্র পরিগণিত হয়ে উঠল। এমনকি এই চল্লিশ বছরেই কলকাতা ভারতের সপ্তম গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে নিম্নস্থানাধিকার করেছে! এমন কেন হল ?

আজকের বাঙ্গালীর রাজনীতির আসলি রূপ—

এই স্থানাবনতির জন্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান দায়িত্ব বর্তমান বাম ও দক্ষিণ রাজনীতির প্রহসনের 'আস্‌লি' রূপ! দেশপ্রেমের ভণ্ডামীর মুখোশ পরে রাজনীতিকেরা 'আপন প্রেমে' নিমজ্জিত হয়ে বাঙ্গালির সামাজিক ও চরম দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে অনৈক্যের ও সর্বনাশের পথে স্বজাতিকে এগিয়ে দিয়েছে। যত শীঘ্র মানুষ এ সত্য বুঝবে ততই মঙ্গল।

ভারতের অন্যত্র সর্বত্র যখন রাজনীতিকেরা দলীয় বিতর্ক ও রাজনীতিকে বাড়ির বৈঠক-খানায় ঠেকিয়ে রাখছে, এখানে তখন অবৈজ্ঞানিক অসভ্য রাজনৈতিক কোন্দলকে অন্দরের হেঁসেল

পর্যন্ত টেনে এনেছে। আর নেতারা 'ন্যাতা' হয়ে যথাসম্ভব গুছোচ্ছে। ফলে মার খাচ্ছে সাধারণ মানুষ, মরছে সাধারণ মানুষ, অর্ধাশনে অনশনে থাকছে সাধারণ মানুষ। যেদিন এই মারখাওয়া সাধারণ জনগণ রাজনীতির বুজরুকী ভুলে এককাট্টা হতে পারবে, সেদিন যদি পরিবর্তন আসে! বাঙ্গালিকে জানতে হবে বুঝতে হবে যে, প্রকৃত কোন দেশহিতৈষীর জন্যে দেশপ্রেমিকের জন্যই তারা লড়ছে! না হলে সামনে আরো অন্ধকার!

সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালি রাজনীতিকের স্থান গত একশ' বছর যাবৎ কন্টকপূর্ণ। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পর্যন্ত একই ধারাবাহিকতা। বাঙ্গালী তথাপি সেই সত্য বিস্মৃত হয়ে বারবার পিছু হটছে এবং তা ভুলছে।

একথা সত্য যে ভারতবাসীকে বাঙ্গালি স্বাদেশিকতা, জাতিয়তা শিখিয়েছিল। কিন্তু পশ্চাতের অঙ্গুলী হেলনে সেই জাগ্রত বাঙ্গালির ইতিহাস 'তথতীয়' অনুশাসনে মুছে ফেলা হয়েছে। বারবার তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় অবাঙ্গালি নেতারা হুইপ দিয়েছেন; গান্ধী. নেহেরু এ থেকে বাদ যাননি। তথাপি বঙ্গজ 'ন্যাতারা' তাদের চাটুকার কিভাবে থাকেন, সেটা অবিশ্বাস্য। এই জাতীয় অপশাসনের বিরুদ্ধে মাত্র ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে আর ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার সোচ্চার হয়েছিলো। তাই শ্যামাপ্রসাদ খুন হয়েছিলেন এবং ডঃ মজুমদার অপাংক্তেয় অপুরস্কৃত বিদায় নিয়েছিলেন! চাটুকবিতার পরিণামে বাঙ্গালি রাজনীতিক সাধারণ নাগরিকদের মতনই তাদের ভৃত্য মাত্র। সহযোদ্ধা নন। এবং স্বভাবতই বৃটিশরাজের শূন্যবোতল হিন্দীরাজের আরকে পরিপূর্ণ হয়ে অবাঙ্গালি রাজনীতিকগণ অহংসর্বস্ব।

মনে আছে হয়ত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষার্ধে তৎকালিন বৃটীশ প্রধানমন্ত্রীর ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানের প্রচেষ্টার সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, উইনষ্টন চার্চিল, '...ভারতীয় রাজনীতির ঐ...মস্তানেরা স্বাধীনতা পাবার যোগ্যতা অর্জন করেনি। সাধারণ ভারতীয়েরা এখনো অশিক্ষার, অসভ্যতার, কুসংস্কারের কবলে নিমজ্জিত। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, ভবিষ্যতে এইসব অপদার্থ অযোগ্য রাজনীতিকদের হাতে পড়ে ভারতীয়দের শীঘ্রই পানীয় জল পর্যন্ত ট্যাক্সোদান করে পান করতে হবে।"... উক্তিগুলি তিনি কোন রাজনীতিকদের উদ্দেশ্যে করেছিলেন, আশাকরি তা বুঝিয়ে বলতে হবে না। আর সেই দলের বর্তমান পরিণতি কী, তা যে কোন অতি সাধারণ নাগরিকও মর্মে মর্মে জানেন। তখন কোন বাম রাজনীতির প্রাধান্য ছিল না এখনকার মতন! থাকলে কি হত বলতে পারি না। লেনিন, নেতাজীর উত্তরাধিকারীরা এখন কোন জাগতিক মহাজাগতিক মোহভঙ্গের দুর্নীতিগ্রস্ত বিপ্লবের বিস্তারচর্চা করছেন, ভুক্তভোগী মানুষ তারও যথেষ্ট পরিচয় রাখেন! চার্চিলের উক্তি তাদের কাছে বুর্জোয়া উক্তি। অথচ চার্চিলের দেশের জল না খেলে আজো কি দক্ষিণ কি বাম কোন ভারতীয় বা বাঙ্গালি রাজনীতিকের মুখশুদ্ধি হয় না!

আসলে বিশ্বজোড়াই রাজনীতিকদের চেহারা যে কী রূপ পরিবর্তিত তা যারা সংবাদপত্র

পাঠ করেন তারা বুঝতে পারেন। সর্বত্র রাজনীতিকদের মধ্যে একরকম আধিভৌতিক অস্থিরচেতনা এবং অর্থ সর্বস্বতা পরিব্যাপ্ত; তার মধ্যে দেশব্রতী কোন চেতনা নেই; কোন নৈতিকতার বালাই নেই; কেবল গদীর স্বার্থ আর নিজের আর্থিক উপার্জন। দেশের স্বার্থে রাজনীতির নাম গন্ধ নেই। এমন কি অতি বিপ্লবী দলগুলি এবং তাদের পীঠস্থানের মহিমাও ক্ষমতা ও গদী ঘিরে। সর্বহারাদের জন্য মার্ক্সের পূর্বে ঘোষণা করে কেউ কাঁদেনি; এখনও ঘোষণা করে কেউ কাঁদে না, নিজের ও অস্তিত্বের জন্য ঘোষণা করে বটে তবে কাঁদে না আর। সর্বহারাদের জন্যে কেঁদে কেঁদে সবাই এখন সর্বভুক; এমনকি নরভুকও!

এককথার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল সিধু কানু ডহরের সভাগুলিতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সকল 'ন্যাতা'ই বক্তৃতায় পাণ্ডিত্যের এবং জ্ঞানের এত ফলাও প্রচার করে থাকেন যে দেশে কোন ব্যাপারেই কোন কাল্পনিক ত্রুটীও থাকার কথা নয়। যারা ইদানীং শুনতে আসেন তাদের অধিকাংশে অজ্ঞান ও অশিক্ষায় জর্জরিত, সামান্য প্রাথমিক বই পড়তে অক্ষম তো পাণ্ডিত্য বুঝবে কি! আর বাকি ভগ্নাংশে শ্রোতা দলের হুকুমের পুতুল! তাই পঞ্চাশ বছর ত্রিশ বছর আগেও যে জনতা শ্রদ্ধাভরে রাজনীতিকদের কথা শুনতে যেতেন স্বেচ্ছায়, এখন লজ্জায় ঘৃণায় নাক কুঁচকে বাড়ি যান, বক্তৃতা শোনা দূরের কথা। এ যুগের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা, কথায় যা বলা কাজে ঠিক বিপরীত করা। মানুষ এসব দেখে বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু তারা ভীরু দুর্বল অসহায় ছাপোষা দরিদ্র, তাই বিদ্রোহ করতে ভীত। বিপ্লবের কথা এখন আভিধানিক মাত্র।

বাঙ্গালির বর্তমান সভ্যতা ও শিক্ষা—

একদা দু'শো বছর পূর্বে উর্বরমস্তিষ্ক বলে বাঙ্গালি ইংরেজের শাসন সহায়ক হয়ে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংরেজি শিক্ষায়, চিন্তায়, কাজে, দক্ষতায়, চরিত্রে পাশ্চাত্যের যান্ত্রিকতাসর্বস্ব সভ্যতার অংশিদার পরিগণিত হয়েছিল। সেটা কিছু দোষের ছিল না। ভাষা, সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মিলন বা সমন্বয় না ঘটলে কোন জাতি উন্নত হয় না। ইতিহাস তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সর্বাগ্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী উদার হয়, সেই জাতি নীতিজ্ঞানে মহৎ হয়। একসময় মধ্যবিত্ত বাঙ্গালিতা যে হয়েছিল সেকথা উনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিচরণকারি মানুষ মাত্রেই উপলব্ধি করে থাকেন।

কিন্তু বিগত পঞ্চাশের, পঞ্চাশেরও নয় যেন, চল্লিশের দশক থেকেই সেই পরিচয় ক্রমশঃ বদলাতে শুরু করল। একটা সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের যুগ এসে গেল। যেন নানা কারণেই। একশ' বছরের ঐতিহ্য বাহিত সমাজ কিছুমাত্র রেশ টেনেও চলেছিল। হঠাৎ ষাটের দশকে এইসব বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা সভ্যতা নীতিজ্ঞান বাঙালী যেন ভুলতে আরম্ভ করল। হিন্দীয়ানীর দাপটে এবং আর্থনীতিক হিন্দুস্থানী দৌরাত্মে বাঙ্গালি না পারল বাঙ্গালীর বিগত ঐতিহ্য বজায় রাখতে, না সম্পূর্ণরূপে

হিন্দুস্থানী ঐতিহ্যে রূপান্তরিত হতে; কেমন এক জগাখিচুড়িতে বদলে গেল ক্রমশ। ইংরেজি শিক্ষার বিলোপ যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই এই জাতিকে সর্বাংশে পরপদানত করতেই সাধিত হল। এখন বাঙ্গালি বিলুপ্ত সভ্যতার এক নীরব ও অক্ষম দর্শক মাত্র।

কর্মোদ্যমহীন, অন্তঃসার শূন্য বাঙ্গালির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখন ব্যবসাকেন্দ্র, শিক্ষক শিক্ষিকারা অধিকাংশ পাণ্ডিত্যহীন শিক্ষার এবং মনোবিকলনের শিকার; ছাত্রছাত্রীরা হুল্লোড়ে মশগুল, পড়াশোনায় বীতস্পৃহ এবং ব্যর্থ রাজনীতির ধ্বজা বাহক হয়ে যৌবনে রোজগার বিহীন সব বিপথগামী। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভয়াবহ রাজনীতির আখড়া, অধ্যাপকরা বেশিরভাগ ষড়রিপুর ক্রিয়ায় অধিকতর আচ্ছন্ন হয়ে বৃত্তিচ্যুত। পণ্ডিতবর্গ, সামান্য কয়েকজন যাঁরা আছেন, হয়ত সরকারী দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশায় মূক অথবা শোকে মুহ্যমান। বাঙ্গলার শিক্ষাব্যবস্থাই মূলত এবং রাজনৈতিক চরিত্রহীনতা সামাজিক অবক্ষয়ে পর্যবসিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে অন্তত তিনটি 'জেনারেশন গ্যাপ' ঘটিয়ে দিয়েছে।

জীবিকামুখী শিক্ষাব্যবস্থা কিছু হয়ে থাকলেও রাজনীতির চক্রান্তে এবং কর্মজীবনে বাঙ্গালি চরিত্র ভ্রষ্টতার কারণে পশ্চিমবঙ্গ বেকারের স্বর্গে পরিণত। এবং সমভাবেই ভিন্নরাজ্যবাসীদের জীবিকারাজ্য প্রসারিত এখানে। পশ্চিমবঙ্গের টিভিতে রেডিয়োতে পথে ঘাটে স্কুলে কলেজে, বাংলার স্থান বাঙ্গালি সমর্পণ করেছে হিন্দীকেই, ইংরেজিকেও নয়। ক'জনে ইংরেজি জানে? ক'জন বলতে পারে? আর লিখতে কেউ পারে না। হিন্দীও না। সুতরাং পরিকল্পনা মাফিক পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিকে অর্ধশিক্ষিতে পরিণত করতে রাজনীতির ব্যবসায়িরা সফলকাম। দোকানকর্মচারী বাসের ড্রাইভার কণ্ডাকটার হেল্পার এবং সামান্য ভগ্নাংশ অফিসে কাছারিতে চাকরি। ব্যস, স্বাধীনতা লাভ করে বাঙ্গালি স্বর্গলাভ করেছে!

পাশাপাশি অন্য রাজ্যবাসীদের দেখলে লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হবে। উদ্যমে, কর্মদক্ষতায়, শিক্ষায়, উচ্চশিক্ষায়, পদমর্যাদায়, ব্যবসা বাণিজ্যে, ঐহিকবিলাসে, সর্বত্র অবাঙ্গালিগণ কী না করছে! আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও জয় জয়কার করে ফিরছে। এজন্যে বাঙ্গালির শিক্ষা লাভ করা উচিত ছিল যখন, তখনও তারা নেতৃত্ববিহীন নিরুপায় হয়ে নোঙর ছেঁড়া নৌকোর মতন বাত্যাবিক্ষুব্ধ নদীতে পাক খেয়ে মরছে! বাঙ্গালিকে কে বাঁচাবে! কে টেনে তুলবে।

বাঙ্গালির বর্তমান সামাজিক চেহারা—

বর্তমানে বাঙ্গলার সামাজিক চেহারার কোন সঠিক সংজ্ঞা এককথায় দেওয়া অসম্ভব। সমাজ বলতে যা বুঝায়, সেরকম কোন অবস্থা এখন বাঙ্গালির সমাজে নেই; না শহরকেন্দ্রীক জীবনে, না গ্রামভিত্তিক জীবনে। বাঙ্গালি সমাজবদ্ধ গোষ্ঠী নয় বলে বোধ হয়, অন্য যে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীভুক্ত হয় খুব তাড়াতাড়ি। যেমন রাজনীতির গোষ্ঠী, কোন ধর্মীয় আশ্রমভিত্তিক, কিংবা কোন ধর্মীয় শাখাভিত্তিক এবং এমনকি তথাকথিত তপশীলভুক্ত শ্রেণীভিত্তিক।

কিন্তু কখনো বাঙ্গালি জাতি ভিত্তিক নয়। যেমনটি অন্তত মুসলমান বাঙ্গালির অথবা খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধ বাঙ্গালির খানিকটা সমাজবদ্ধতা দেখা যায় এখনো। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরে বাঙ্গলার বাইরে অন্তত বাঙ্গালি হিন্দুকে কালিবাড়ী স্থাপনা মাধ্যমেও সামাজিকতাবদ্ধ হতে দেখা যেত! আজ তারও কিছু অবশিষ্ট নেই; যদিও বা অতি সামান্যতম নিদর্শন কোথাও থাকে, তা কতিপয় কিংবা কোন একক ব্যক্তি প্রচেষ্টাপ্রসূত। বিদেশে বা ভারতে দুর্গোৎসবকে উপলক্ষ করে বাঙ্গালির যে সমাগম হয়, তাতেও কি সামাজিক যুথবদ্ধ জীবনের প্রকাশ বেঁচে আছে? নেই। কদিনের সমাগমে মেলামেশা দেখাসাক্ষাৎ হলেও, পূজাবসানে সব শেষ হয়ে যায়। সমাজবদ্ধ জীবনে একতার প্রকাশ থাকবেই। সেই 'একতাই' বাঙ্গালি জীবনের প্রধান ব্যাধিরূপে 'নিঃসঙ্গতা' হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই রোগ প্রধাণত পাশ্চাত্যের দান এবং অবশ্যই নগরজীবনে অব্যবস্থার। তথাপি পাশ্চাত্য বাসীদের সাপ্তাহিক সমাজ মিলনের ব্যবস্থা আছে। বাঙ্গালির সেরূপ নেই কিছু। গত শতাব্দী পর্যন্ত ধর্মধ্বজাধারী সমাজপতিদের নির্দেশে একটা নেতিবাচক সমাজ জীবন ছিল; যেহেতু এইসব সমাজপতিরা অধিকাংশই ধর্মকে অথবা সমাজকে স্বার্থে ও ব্যবসায় নিযুক্ত করত। যুগের পরিবর্তনে বিজ্ঞানসম্মত মুক্তচিন্তার প্রাধান্যে এখন বিনা প্রতিবাদে অন্যায় কাজে কিংবা অধার্মিক অসঙ্গত সামাজিক ক্রিয়াকলাপে সমাজপতির নির্দেশ প্রযোজ্য হবে না। তাই সমাজপতির যুগ অবশেষ। তথাপি মানুষে মানুষে সমাজে মিলন ঘটবেনা কখনো, কোন স্বার্থবিহীন অনুষ্ঠানে বিশ্বাস ও নির্ভরতা থাকবে না পরস্পরের মধ্যে, এ যেমন ভাবা যায় না; ঠিক তেমনি মেলামেশার ফল নেতিবাচক হলে বা নিন্দনীয় হলে সেটাও সমর্থনযোগ্য হবে না।

ইংরেজের শাসনে হিন্দুরা নানা জাতিভেদে, ধর্মভেদে, শ্রেণীভেদে, মুসলমানেরা জাতিগত ভাবে, ব্রাহ্মরা বৌদ্ধেরা এবং খ্রীষ্টানেরা জাতিগত সমাজবদ্ধ ছিলেন। স্বাধীনতার পরবর্তীযুগে ধর্ম-যাজকদের নানা ছলচাতুরীতে এবং উন্নত দৃষ্টান্তের অভাবে, বিশেষ করে হিন্দুদের সবকিছু বাঁধন শিথিল হয়ে পড়ল। ব্রাহ্ম অথবা বৌদ্ধ, কিংবা শৈব বা শাক্ত অথবা সহজিয়া কি বাউল ইত্যাদি কোনও শ্রেণীবদ্ধ সমাজ আর রইল না, যৌক্তিকতাও থাকল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলেই, সামাজিক ন্যায় নীতিবোধ নষ্ট হতে শুরু হয়েছিল। পরপর বিধ্বংসী অর্থনীতিক পরিবর্তনে, পঞ্চাশের মন্বন্তরে পঞ্চাশ লক্ষ নরনারীর অসহায় মৃত্যুতে, ছেচল্লিশের ও পরবর্তী সময়ে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় এবং সাতচল্লিশের বঙ্গবিভাগে, বাঙ্গালির বিশেষ ভাবে, সামাজিক বাঁধন ও অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ল। তারপর থেকে তাকে কোন প্রকার জোড়াতালি দেবার প্রচেষ্টাই শুধু দেখা গেছে; পুনর্জীবন দান করার জন্য কোন সাধু প্রচেষ্টা দেখা গেল না। এক কথায় সামাজিক কাঠামোটি নষ্ট হল কতযুগের জন্য কে জানে!

এই সময়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্রয়োজন প্রায় শেষ হয়ে গেল, সংস্কৃতনবীন পণ্ডিত কুলের প্রয়োজনও নিঃশেষ প্রায়। হিন্দুদের ধর্মাচার কুলাচার সামাজিক প্রথাগুলিও অবলুপ্ত প্রায়।

শুধুমাত্র বিবাহের অনুষ্ঠানে ও পারিবারিক শুভ কাজে মহিলাদের মনগড়া কিছু আচার অনুষ্ঠানই বজায় রয়েছে, যার কোন সামাজিক ভিত্তি নেই। কতকগুলি ধর্মীয় গুরুবাদের আশ্রমে সর্বশেষ অবলম্বনরূপে হিন্দু বাঙ্গালির সামাজিক পরিচয় রক্ষিত হচ্ছিল; যেখানে ধর্ম-ন্যায়-নীতি রক্ষার চেয়ে আনুষ্ঠানিক একগুয়েমী বজায় আছে মাত্র; এবং মনে হয় ঈশ্বরের ভজনার চেয়ে ঐহিক লাভের ভজনাই হয় বেশি। ধর্মীয় বন্ধনগুলি শিথিল হয়ে পড়ল, পুজো আর্চা প্রায় উঠেই গেল। সর্বজননী সামাজিক উৎসবরূপে কেবল যেটুকু বজায় থাকল। ফলে বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক অনুশাসনের অভাবে এবং নৈতিকতাশূন্য সামাজিক জীবনে, দুর্নীতি, ব্যাভিচার প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে।

অপরদিকে অবাঙ্গালি হিন্দুরা পাকাপাকিভাবেই ইংরেজ শাসকের স্থলাভিষিক্ত। নয়াদিল্লীর আশীর্বাদ ধন্য তারাই। বাঙ্গলায় সমাজজীবনেও তাদেরই পরোক্ষ আধিপত্য সর্বস্তরে বিস্তৃত হল। বাঙ্গালির সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের এই অবক্ষয়ের যুগে ঝটতি পড়তি 'ন্যাতারা' দিল্লীর সামান্য চরণামৃতের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরছে। তাদের সামাজিক নেতৃত্ব দেবার শক্তি ও ক্ষমতা নেই।

তাই এযুগে বাঙ্গালি সবদিকেই মার খেল এবং ভারতের একনম্বর জাতি থেকে চল্লিশ বছরেই ত্রিশ নম্বরে ঠেকেছে।

বিকৃত সংস্কৃতি চিন্তার পরিণাম—

বোধকরি প্রতি চারপাঁচশ' বছর বাদে বাদে এইরূপ একটা অবক্ষয় নেমে আসে আমাদের সমাজ জীবনে। আর চরম অনাচারে দুর্নীতিতে ভরে যায় দেশ। বর্তমানে ঠিক সেই চিত্রটি পরিস্ফুট পশ্চিমবঙ্গে।

যে কোন দেশের পরিচালনা ভার থাকে আমলাদের ওপর; ব্যাপারটা ঘটে পরোক্ষে। প্রত্যক্ষভাবে নীতি নির্ধারক থাকেন মন্ত্রীরা অর্থাৎ রাজনীতিকেরাই। প্রাচীনকালেও রাজারাজড়াদের আমলে এ নিয়ম ছিল; বর্তমানেও পৃথিবীর সর্বত্র প্রায়। কিন্তু অন্যত্র দীর্ঘকালীন স্বাধীন জাতিদের ক্ষেত্রে আমলাদের বিচার বুদ্ধির ও কর্মপ্রণালীর স্বাধীনতা প্রায় প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজনস্বীকৃত। সর্বজনীন ন্যায়দণ্ড কাজ করছে সেইসব দেশে। আমাদের দেশে ঠিক উল্টো। আমলাদের চলতে হয় 'ন্যাতা'দের প্রশাসনে; আর 'ন্যাতা'রা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের একনায়কতন্ত্রের ধারক ও বাহক! গোটা দলের মতামতের ওপর নির্ভর করে না একনায়ক; একনায়কের মতামতেরই ওপর নির্ভর করে দল ও দলের সদস্যরা।

মনীষী কার্ল মার্ক্স যাই বলে থাকুন না কেন, মানুষ এবং অবশ্যই সব পার্টির নেতৃবৃন্দও মূলত ষড়রিপুর দাসত্ব মুক্ত হতে পারে নি, হবেও না কোনদিন। সে কারণে দলগুলি, জনগণ, কেউ আজো একনায়কতন্ত্র থেকে মুক্ত হয়নি, তা সে দক্ষিণপন্থী কি বামপন্থী যেই হোন না। স্টালিন থেকে আরম্ভ করে গরবাচেভ-ইয়েলৎসিন, বুশ-ক্লিনটন, গান্ধী-জহরলাল, ইন্দিরা, নরসিংহরাও,

জ্যোতিবসু, নৃপেন চক্রবর্তী ইত্যাদি কেউ রিপুর দাসত্ব মুক্ত নন। অতএব জনগণের মুক্তি কেবল মার্ক্স-এঙ্গেলসের কল্পনাতেই রয়ে গেছে কেতাবে। দরিদ্র নারায়ণ মুক্তি পায় নি, এখনো পাচ্ছেনা, কোনদিনই পাবে না; যতদিন না মানুষের চরিত্র রিপুদোষ মুক্ত হয়। সাধারণ জনগণ চিরদিন অসহায়ের মতন বোফর্স, স্টক এক্সচেঞ্জ স্যামের দুর্নীতির বোঝা টেনে টেনে মরবে, মরে!

এহেন পরিস্থিতিতে যদি দেখা যায়, সেই একনায়কেরাও নানান্ সংস্কৃতি সংহতি উৎসবের প্রলোভনে জনতার চাটুকার হতে কুসংস্কৃতির শিল্পীদের সঙ্গে উৎসবে মাতেন, তবে সাধারণ মানুষ নির্বিচারে ক্যাবারে নাচের ভক্ত হবে, রাহাজানি খুন করবে, কিংবা মোটবাহক অশিক্ষিত লোকটি অধিকারিণীকে ধর্ষণ করবে! সে বেশি কথা কি!

আজকের বঙ্গললন ও ললনাদের, এমনকি বয়স্কদেরও ক্যাবারে নাচ নাচতে. পানীয়ের গেলাসে পরস্ত্রীর সঙ্গে চুমুক দিতে, যখন তখন পাড়ার মদের দোকানে লাইন দিতে এবং অশ্লীল ব্লু ফিল্ম ভিডিওতে ঘরে বসে দেখতে দেখা যায়! কাগজে খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ নৈমিত্তিক বিষয় হয়! আর আর্থিক দুর্নীতি? সে ত প্রত্যেকের রক্তে মজ্জায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে ওপরের 'ন্যাতার' দৃষ্টান্তে। সমস্ত বিষয়ে চিন্তায় পর্যন্ত বিকৃতি এসে পড়েছে! সীতার অগ্নিপরীক্ষার দৃষ্টান্ত শুনিয়ে কোন উচ্চতম পদাধিকারী 'ন্যাতা'ও কেটে পড়তে পারে! সংস্কৃতি আজ প্রহসন মাত্র।

এই যে অবক্ষয়ী বিধ্বংসী সমাজ চরিত্রের দর্পণ, এজন্যে কি রাজনীতির মিথ্যের বেসাতি এবং ভণ্ডামী দায়ি নয়? এই পরিণাম আর পরিণামে নরক গুলজার অবশ্যম্ভাবী!

বাঁচার উপায় কোনপথে

গণজাগরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন শ্রমজীবী সর্বহারাদের জন্য দুঃখে এবং ব্যথায় কার্লমার্কস, এঙ্গেলস। তেমনি এদের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন বিবেকানন্দও। এমন কি হাজার হাজার বছর আগে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গৌতমবুদ্ধ এবং যীশুও। তাঁদের দিন, সময়, মানুষ ও পরিবেশ অতীতের বিষয়! গবেষণার বিষয়। কিন্তু মার্কেসর চিন্তার ফসল কমিউনিষ্ট দুনিয়ায় সারা পৃথিবীতে যে ধসনামল, তারও একটা কারণ নিশ্চয় রয়েছে। সেটা হল, আগেই বলেছি, কমিউনিষ্টরাও সম্পূর্ণরূপে ষড়রিপুর দাস। মার্ক্স এই ফাঁকটুকু পূরণ করতে ভুলে গেছেন। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার নেতৃবৃন্দ হয়ত অধিকমাত্রায় কাম ক্রোধ লোভ ও মোহে আসক্ত, কমিউনিষ্ট দুনিয়াতেও সবই রয়েছে—পরিমিত মাত্রায় কোথাও কোথাও। মানুষ গোড়ায় মদ-মাৎসর্যের ঈর্ষা পরশ্রীকাতরতারও শিকার। এ থেকে কেউ যে মুক্ত হতে পারবেন না, সেটাই মার্কস সাহেব ভুলে বসেছিলেন। তাই আইনষ্টাইনের থিয়োরী অব রিলেটিভিটীর আলোকে দেখলে মনে হবেই, গণমুক্তির আগামী কোন না কোন শতকে যখন পরিবেশ ও মানুষ উপযুক্ত হবে, তখন কোন পরিশীলিত নতুন চেতনার জন্ম হবে। সেই অনাগত মুক্তিপথে মার্ক্সের চিন্তার সঙ্গে বুদ্ধের সততা ও অহিংসাযুক্ত চরিত্রগুণ, যীশুর সরল স্বচ্ছ

চারিত্রিক গুণ ও ঐশ্বরীয় প্রেম, বিবেকানন্দের মতো দেশনেতাদের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চরিত্র লাভ ; এ সবের মধ্যেই আসবে নতুন কোন নৈতিক মানবিক সাম্যবাদ—যে 'বাদ' প্রকৃতভাবেই মানুষের মঙ্গল সাধন করতে পারবে ; পারবে রাজনৈতিক ও সামাজিক নায়কদের রিপুদোষমুক্ত রাখতে !

কিন্তু আজকের এবং ভবিষ্যতের বাঙ্গালির আবার উন্নতির জন্যে তারও আগে যে গুণটির প্রথম প্রয়োজন হবে, এবং যে গুণ বিগত পঞ্চাশ বছরে সমূলে হারিয়ে ফেলেছে বাঙ্গালি, সেটি হল শ্রদ্ধা-ভক্তি। বাঙ্গালি চরিত্রে ভক্তি ও শ্রদ্ধা আজ কারো প্রতিই নেই। প্রতিটি বাঙ্গালি অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ; ভক্তিহীন জ্ঞানের প্রতি, দানের প্রতি, পরহিতের প্রতি, সংযমের প্রতি, এমনকি বোধহয় নিজের পরমাত্মার প্রতিও ! জীবনে সর্বস্তরে সর্বাগ্রে সর্ববিষয়ে ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ণ নিষ্ঠার প্রয়োজন আজ।

যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ

কৌশিক ভট্টাচার্য্য (গোপালপুর)

প্রণমি তোমারে বিবেকানন্দ
করুণাঘন বিগ্রহ
নিত্য শুদ্ধ যোগীবর তুমি
তুল্য তোমার নাহি কেহ।

চিন্তানায়ক তুমি হে মহান,
ভিতীক্ষা ত্যাগে তুমি বরীয়ান্
বিশ্বদরদী মানব প্রেমিক
ঘুচালে জাতির অন্ধ-মোহ।

জগৎ সভায় রামকৃষ্ণের
তুমি যে বার্তাবহ
আপন বক্ষে বহিলে
সবার বেদনা দুর্বিসহ।

সকল জীবেরে করি শিবজ্ঞান
আর্তে-পীড়িতে বাঁচাইলে প্রাণ
নবীন যুগের হে বীর সাধক !
মোদের শ্রদ্ধা-প্রণতি লহ ॥

গিরিবালা মহিলা নিবাস

ছাত্রী ও কর্মরতা মহিলাদের
আবাসিক ব্যবস্থা আছে।
ফোন : ৪৭৫-৮১৭২

"আগে যদি বুঝতাম"

(গল্প)

রমা গুপ্ত

"তুমি আমার এত বড় ক্ষতি করলে কেন? ভেবেছিলাম আর সকলের থেকে তুমি একটু আলাদা, কিন্তু দেখলাম পুরুষ জাতটা সব সমান। একই তাদের মনোভাব।" স্বাতী ফুঁসছিল রাগে. নাকটা ফুলে ফুলে উঠছিল তার। ক্ষোভে দুঃখে বেদনায় সে যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

রাস্তায় তখন বেশী লোক চলাচল সুরু হয়নি, আসলে এসব রাস্তা তো ঠিক সদর নয়। একটু গলির মধ্যে তাই ঠিক দুপুর বেলা এখনও তেমন ভীড় বাড়েনি। অবশ্য খানিক পরেই যখন স্কুলের ছুটির ঘন্টা পড়বে, তখন এসব গলিও আস্তে আস্তে বেশ ভীড় জমে উঠবে কারণ স্কুল যদিও রাস্তার ওপরে তবুও যেতে গেলে তো এই গলি দিয়েই যেতে হবে। যেমন কিনা, এযুগের ছেলে মেয়েরা যতই বাবামাকে অস্বীকার করুক, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করুক, জীবনের সন্ধিক্ষণে সেই বাবামার স্বীকৃতিটুকু বড়ই প্রয়োজন, তা না হ'লে যে দুহাত এক হয়েও হতে পারে না, এখনও আমাদের এসব সামাজিক প্রথাগুলি মেনে চলতে হয়।

স্বাতীর অভিযোগ শুনে থমকে দাঁড়ালাম। এইসব মেয়েদের ঠিক চিনতে পারি না। যেমন তাদের বেশভূষা. তেমনি তাদের কথাবার্ত্তা। এদিকে নাকে নাকছাবিটুকুও আছে, আবার মিনি স্কার্ট পরে আমার সঙ্গে সিগারেট খেতেও আপত্তি করে না। সিগারেট শুধু নয়, ভাল ই ড্রিঙ্ক করতে পারে, মাঝে মাঝে অফার দিয়ে দেখেছি তো, সোৎসাহে রাজী হয়ে যায়, তখন তো কই এই প্রাচীনার মত বুলি শুনি না!

যাক্, আমার তাড়া আছে। কি বলতে চায় ও, যদিও আমি এখন ওকে এড়িয়ে চলতেই চাই, কেন না দীর্ঘ দশ বছর ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেও আমি ওকে চিনতে পারিনি। সিনেমার নায়িকার মত আমার সঙ্গে ফ্লার্ট করতেও কমতি যায় না। আবার বেশীদূর এগোনও চলবে না, অমনি সুরু হয়ে যায় শাসন! এই তো মাস পাঁচেক আগের ঘটনা, আমার বাড়ির অবস্থা সে সবই জানে, তবুও কেবলি চাপ দিচ্ছে। কবে রেজেষ্ট্রী করব তার জন্য উত্তক্ত করে তুলছে।

প্রেম করা এক জিনিষ, আর বিয়ে করে দায়িত্ব নিয়ে ঘরে আনা আর এক জিনিষ, এইটেই আমি স্বাতীকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনা।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমার সঙ্গে পথ ছলছিল, হঠাৎ বলে উঠল, "দূর, এই ঘুরে বেড়ানো আর ভাল লাগে না, চল, কোথাও বসা যাক।" নিরিবিলি তো কোথাও নেই, তবুও. যেদিকে একটা বিশাল বাড়ি উঠছে, তার পেছনটা তখন বেশ ফাঁকাই ছিল। দুজনে গিয়ে বসলাম। স্বাতী গম্ভীর. কি যেন ভাবছে। আমি চুপ করে তাকিয়ে থাকি ওর দিকে। "দেখি কি বলে

আবার আজ, রোজ সেই এক কথা শুনে শুনে আর ভাল লাগে না, প্রেম করা যে ভীষণ দায়। আগে যদি বুঝতাম।" স্বাতী বলে উঠল কি ঠিক করলে, আর তো পারা যায় না এত লোককে কৈফিয়ৎ দিতে আমার ভাল লাগেনা।"

"ভাল লাগে না তো কি করব বল? পারবে তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে"? রেগে বলে উঠি। "পালিয়ে? কেন পালাব' কেন? আমাদের অপরাধ কি? প্রেম করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়? যুগে যুগে এ স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে আজ এমন কি হলো যে পালাতে হবে?"

"না স্বাতী তোমাকে বোঝানো যায় না, আমার পারিবারিক অবস্থাটা তুমি বোঝ? অন্ততঃ বোঝার চেষ্টা কর।" না, না, আমি বুঝতে চাই না পরিমল। তুমি জান না। মেয়েদের অনেক কিছু শুনতে হয়, বাবা মার কাছে কত মিথ্যা বলতে হয় তোমার জন্য তা জান?" 'তা বললেই বা, প্রেমের জন্য প্রেমিকের জন্য এটুকু করতেই হয় জান না সেই গানটা, আমারে ভালবেসে আমারি লাগিয়া, সয়েছ কত বাধা বেদনা অপমান? তবে"? "কি তবে", স্বাতী মুখটা গোঁমড়া করে বলল? ওর মাথাটা ধরে টেনে নিই, "ভালবাসলে অনেক সহ্য করতে হয় স্বাতী। পারবে তুমি আমার বাড়ি গিয়ে আমার মা বাবা ভাই বোন সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে? পারবে অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে? তুমি ধনীর আদরের দুলালী। ঘুম থেকে তো ওঠ বেলা আটটা। তিনতলা থেকে হাঁক পাড় চায়ের জন্য। যখন যা চাইছ বাড়ি থেকে পেয়ে যাচ্ছ, কিন্তু আমার বাড়িতে তোমার কোনও ইচ্ছাই পূর্ণ হবে না স্বাতী! জানতো, অভাব যখন দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ায়, ভালবাসা তখন জানালা দিয়ে পালায়"। তাই বলছিলাম, চল, আমরা পালিয়ে যাই। দূরে অনেক দূরে, যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না, কেউ কিছু বলবে না। "রাখ 'কাব্য রাখ', জীবনটা বাস্তব। এটা সিনেমা নয়, ভুল করেছি তোমার সঙ্গে মিশে। কাওয়ার্ড!" স্বাতীর নাকটা ফুলে ওঠে। আমার কিছু করার নেই, ঝট করে উঠে চলে যাই। এমন উদ্ধত মেয়ে নিয়ে জীবনে চলা যায়? সুখী হওয়া যায়? তবে কি প্রেম বলে কিছু নেই? সবই ফাঁকা বুলি?

স্বাতী এড়িয়ে চলে আমাকে, বুঝতেই পারি, আমারও যেন এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আর ভাল লাগে না। জীবনটা কঠোর বাস্তব। দুজনে হাত ধরে কলকাতার পথে পথে গল্প করে তো আর সারা জীবন কাটানো যায় না, আমি পুরুষ মানুষ, ক্ষুধা তৃষ্ণা সবই আছে। একটা মোহের বশে ওর হাতের খেলনা হয়ে তো আমি চলতে পারি না, নেভার, কখনই নয়। আমার রগের শিরা দপ্ দপ্ করে ওঠে। বাড়ি ফিরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি। আমার ঘরটা একপাশে, এদিকে বড় কেউ আসে না। জানতে পারে না কেউ, আমার যন্ত্রণা জ্বালা সমস্যাটা কি? কাকে বলব? সেই ছেলেবেলার মত মার কোলে শুয়ে মুখগুঁজে যদি থাকতে পারতাম! কোথায় সেসব দিন হারিয়ে গেল? মা বাবা ভাই বোন সবাই আছে, কিন্তু সবাই অপরিচিত কেউই এক বৃন্তে এসে দাঁড়াতে পারি না। সবাই ঘুরছে নিজের গড়া সমস্যায়। জর্জ্জরিত, বিব্রত, বিধ্বস্ত, এই হোল কঠিন রুক্ষ বাস্তব!

দেখতে দেখতে অনেক কিছুই ঘটে গেল আমার জীবনে। বাবা মা কি শুনেছেন কার কাছে জানি না আমার সম্বন্ধে, কিন্তু আমাকে না জানিয়েই একেবারে দিনস্থির করে আমাকে ডেকে বললেন, "পরি, তোমার বিয়ে বাগনানে ঠিক করেছি। মেয়েটি ভালই, শান্ত, এযুগের মেয়েদের মত উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া নয়। আশা করি তুমি আমার কথার অবাধ্য হবে না।"

বাবা তো বোমা ফাটিয়ে চলে গেলেন, আমি এখন কি করি? স্বাতীর কাছে যাব? দ্বিজেনের সঙ্গে পরামর্শ করবো? সে তো আমাদের ব্যাপারটা সবই জানে। না থাক, আমারও কেমন জেদ চেপে গেল। কারোর কাছে যাব না, ঐ গ্রামের মেয়েই আমি বিয়ে করবো, দেখিয়ে দোব স্বাতীকে! কেবল সব তাতেই না, না, আর শাসন! কটা মাস যে কেমন করে কাটল জানিনা, যত দিন যায়, বুঝতে পারছি ভুল করেছি, বাবার মতে সায় দিয়ে। কিন্তু আর তো ফেরা যাবে না, সমাজের চোখে বাবাকে তো হেয় করতে পারি না। আমার ভাগ্য আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে, আমি অন্ধের মত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলাম। আমি ধর্ম্ম, পরকাল কিছুই মানি না। বেপরোয়া এতদিন ছিলাম, প্রেম করেছি স্বাতীর সঙ্গে, কত জায়গায় গেছি ওর সঙ্গে, ওর সব আবদার মেনে নিয়েছি, কিন্তু আজ এমন একটা পরিস্থিতি যে মনের সঙ্গে ছলনা করে আমি বিয়েতে মত দিয়েছিলাম। আমার নিজস্ব সত্তা বলতে তখন কিছু ছিল না। আমি যেন সম্মোহিতের মত হয়েছিলাম। যে যা বলেছে মেনে নিয়েছি, প্রতিবাদ করিনি ঝড় তুলিনি, বন্ধুদের অনুরোধে গোয়া ঘুরে এলাম দুজনে, সবই যেন যন্ত্রচালিতের মত করে যাচ্ছিলাম। তবুও কি যেন একটা জ্বালা, না পাওয়ার যন্ত্রনা মনের মধ্যে অস্থির করে তুলত মাঝে মাঝে, তখন আমাকে ভুলে থাকতে হোত সব কিছু, রঙীন পানীয়ের মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চাইতাম। এতদিন যেটা জোর করে ভুলে যেতে চাইছিলাম, আজ স্বাতীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়াতে, আমাদের সেই পুরোন গলির মধ্যে আবার যেন নতুন করে সব কিছু মনের মধ্যে আলোড়ন তুলে দিল। বুঝলাম প্রেম মরে না, যত রাগ ঘৃণা অভিমান সব যেন একসঙ্গে স্বাতীর কথার মধ্যে ফুটে উঠলো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে নিজের মনটাকে চিরে চিরে দেখলাম। না স্বাতীকে ভুলিনি ভুলতে পারবোনা কোনওদিন। গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে স্বাতীকে দেখলাম। অনেক বদলেছে। কিন্তু রাগটা এখনও কমেনি, আমার ওপরেই তো ওর যত জোর। সব দাবী তো আমার কাছে। এই সত্যটা কেন ভুলেছিলাম? আগে যদি বুঝতাম, এখন তো আর ভুল সংশোধন করা যায় না, তাই সারা জীবন এই যন্ত্রণা নিয়েই আমাকে চলতে হবে, কোনও উপায় নেই। স্বাতীর রাগ আস্তে আস্তে কমে এল, কেমন একটা করুণ চাহনি দিয়ে, ও যেন আমাকে বলতে চাইল, "এত বড় ভুল তুমি কেন করলে?" আমি নীরবে ওর পাশ কাটিয়ে সরে গেলাম, এই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, এই করুণ পেলব চাহনি আমি আর সহ্য করতে পারি না! ওঃ আগে যদি বুঝতাম!

"বুদ্ধু"

আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়

আজ পাকা কথা !

পাখীর কিন্তু সকাল থেকে পাত্তা নেই। কন্যাপক্ষ উপস্থিত হতেই বাবা তাকে খুঁজতে বেড়িয়েছে পাড়ায়-পাড়ায়, বনে-বাদাড়ে ! —যে খেয়ালী ছেলে !

মা কাল রাতে পই পই করে বাড়ী থেকে বেড়োতে নিষেধ করেছে, আহা, তাদের একমাত্র ছেলে, বেশ সেজেগুজে, হাসি খুশী নিয়ে থাকবে—মেয়ে তরফের মানুষগুলোর সামনে যখন ধান-দুর্বা-চন্দন দিয়ে আশীর্বাদ এবং হুলুধ্বনিতে উপচে উঠবে অনাবিল আনন্দধারা—সে মুহূর্তগুলো যে কি মূল্যবান— ! ভাবতে গিয়ে মায়ের মনে যে কাল্পনিক দৃশ্য লোড শেডিং এর আওতায় পড়ে—'ছিঃ ছিঃ গেলো কোথায় ছেলেটা' ?

পাঁচটা মানুষ সকাল থেকে এসে ঠায় বসে আছে। বাবা খুঁজতে বেড়িয়েছে তো বেড়িয়েছে—তারও পাত্তা নেই। বড্ড বেহুঁশ মানুষ ! এসময় ক'দিক সামলাবে সে ? মনে মনে গাললন্দ কপচায় পাখির মা !

চা জলখাবার আগেই দে'য়া হয়েছে। ....তবু এটা ওটা ছুতো করে পাখির মা ওদের সঙ্গ দেয়, এক ঘেঁয়েমি দূর করার চেষ্টা করে—'চা দেবো আরেকটু ? জল পিপাসা পেয়েছে ? —দেখুন না ভাই—মানুষটারও দ্যাখা নেই—কি যে করি এখন' !

এক্ষেত্রে একতরফা গল্প করে বা বিড়ি সিগরেট ফুঁকে সময় কাটেনা—বিয়ে বলে কথা ! কত রকমের আট ঘাট বেঁধে তবে কাজে নামা ! তার আগে শুধু পাকা দেখা নয়—দেনাপাওনার ঝক্কি ঝামেলা নিয়ে কত দর কষাকষি—মন কষাকষি থেকে হৃদ্যতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়।

কন্যাপক্ষের কে যেন রসিকতা করে বলে। 'ছেলেকে খুঁজতে বাবা গ্যাছে এবার ছেলের বাপকে খুঁজতে বেয়ান লাঠি কাঁধে বেড়িয়ে পড়ুন আর আমরা তাক্ ডুমা-ডুম বাজাই—' !

মুচকে হেসে মুখে আঁচল ঢাকে পাখির মা। 'যা বলেচেন তবে সঙ্গে হবু বেয়াইদেরও পাহারাদার নেবো।'

ও পক্ষের কে যেন জবাব দেয়, 'হুকুমের অপেক্ষা।'

হ্যাঁ, এখন তো রসিকতারই সময়। পাকা দেখা থেকে আরম্ভ হয় বিয়ের পালাগান, চুকতে সেই অষ্টমঙ্গলা। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব পাত্র কন্যা পক্ষের রঙ্গ রসের এইতো প্রকৃষ্ট সময়। ....তা না এ যেন একটা মিনমিনে পরিবেশ ! আড়ষ্টতা বেড়ে যাচ্ছে ! ভেবে পায় না পাখীর মা এখন কি করবে। ও দিকে কত মেয়ে রান্না করছে—মাঝে মাঝে তার কাছে গিয়েও নির্দ্দেশ

দিতে হচ্ছে—'মাছের ঝোল যেন ট্যাস ট্যাসে করিস্‌নে বাছা। হুঁ, পায়েস একটু করতে হবে বৈকি! ...দই মিষ্টি তোর বাবা বাড়ী ফেরার পথে ঠিক নিয়ে আসবে!

পাড়ার দু পাঁচজন করে বউ-ঝি আসে। 'কি গো পাখীর বিয়ে দিচ্ছো? —দিন স্থির হোলো? দেনা পাওনা? —চণ্ডী পাড়ার সতিন মোড়লের মেয়ে ফুলইসির সঙ্গে বিয়ে হচ্চে তো? আমরা দেখেচি, বেশ মেয়ে, খাসা মেয়ে...লক্ষ্মী লক্ষ্মী গড়ন!

কথার জবাব দিতে দিতে হালাকালা হয়ে যায় পাখীর মা। এদিকে সাত সকালে জামাই আসার কথা, সে শালার ব্যাটারও দ্যাখা নেই। ওদিকে বাপ ব্যাটার অন্তর্ধান রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। ইস্—

বাড়ীর পাশে এমন কেউ নেই যে ওদের খোঁজে পাঠাবে—পার্টিবাজীর জন্য পরস্পর রেষারেষি!

ছেলেটার ঘর সংসার পেতে দিতেই হবে। কি একগুঁয়ে—'বিয়ে করলে আমার পাখীগুলো অনাহারে মরে যাবে যে'।

মা হেসে বলে, 'শোনো কথা! সে কি রে, তুই যখন বাড়ীতে থাকিস্ নে—উড়নচণ্ডী হয়ে বেপাত্তা হয়ে যাস দু-একদিন—তখন কে দানাপানি জোগায়?

'—দূর সে সব তুমি বুঝবে না, একটা ফেউ জুটিয়ে দিলে কি আর—'

হেসে গড়াগড়ি দেয় পাখীর মা, বটে? 'তোর কথা শুনে হাসবো না কাঁদবো ভেবে পাচ্ছি না!'

সেই পাঁচ বছর বয়েসে মামাবাড়ী গিয়ে কি যে পাখীর নেশা ধরলো ছেলেটার—। ওর মামা বন থেকে দুটো টিয়াপাখীর বাচ্চা ধরে নিয়ে এসেছিলো—ঝোঁক ধরলে সে একটা বাড়ী নিয়ে গিয়ে পুষবে।

মামা বাড়ীর আবদার পূরণ হলো।

বয়েস বাড়তেই কত তোষামোদ করে ছেলেটাকে স্কুলে পাঠানো হলো। পড়াশুনা করবে কি—সর্বক্ষণ পাখী পাখী রব। একদিন যায় তো তিনদিন পাখীর ধান্দায় থাকে। নাওয়া-খাওয়ার অবসর নেই, বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ...টিয়া, ময়না, কাকাতুয়া ইত্যাদি প্রায় ডজনখানেক পাখী খাঁচায় বন্দী। তাদের স্নানাহার, বুলি শেখানো নিয়ে মেতে আছে ছেলে—কাজের কি অন্ত আছে। পড়বে কখন?

ছোটবেলায় তারা নাম রেখেছিলো হলধর। পাড়ার ছেলেরা ডাকে 'পাখী' নামে—এখন কেউ হলধর ডাকলে চটে যায়, লজ্জায় কুঁকড়ে ওঠে। 'পাখী' ডাকলে ভাবে গদ্‌গদ—বাহারের নাম পেয়ে মন উল্লসিত হয়ে ওঠে।

গত ফাল্গুন মাসে শীতলপুর আর গোকুলবাটীর বনে দু' দিন দু'রাত কাটিয়েছে—কি অদ্ভুত গোঁয়াতুর্মি, কোকিল পুষবে। ...একটাও কোকিল ধরতে পারেনি বলে সে কি আপশোষ!

রান্নার তদ্বির করতে এসে মা মেয়ের কাছে ঝাল ঝারে। 'জামাই এলে তো মান থাকতো—এখন চাষবাসেরও সময় নয় যে কাজের ঝামেলা আছে। কি আর বলবো মা। দোষ আমার নেকনের।'

ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে মেয়ে বলে, যেমন দেখে দিয়েচো—'যেমনি তোমার পাখী তেমনি জামাই—একজনের পাখীর নেশা, অন্যজনের গাঁজায়।'

মা কড়া গলায় বলে, বাপকে বাদ দিলি কেন? সে হয়তো কোথাও তাড়ির আসর দেখে বসে পড়েছে। সেই যে কথায় বলে না, "যার বিয়ে তার মনে নেই—আর আমি মাগী বসে বসে আপ্তিয়ে মরি।" —হা হুতাশ করি ভদ্রলোকদের সামনে! কপাল আমার যমেও ছোঁয় না গো।

অনেক ভেবে চিন্তে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করতে হলো।

কন্যাপক্ষ অবাক। তারা ঢের ঢের সম্বন্ধ করেছে এমন কাণ্ড কোথাও দেখেনি—মুখে সব কুলুপ এঁটে বসে থাকা কতক্ষণ যায়? যেন বাপ ব্যাটার ম্যাজিক দেখতে এসেছে তারা।

খাওয়ার পর মেয়ের বাবা ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলে, 'খাওয়াটাই মুখ্য হলো। কি আর করবো, কাজের কাজ কিছু হলো না।'

পাখীর মায়ের কাঁদতে বাকী। তবু যাতে সম্বন্ধটা ভেঙে না যায়, বা ছেলে বেঁকে বসে তাই বিনম্র কণ্ঠে বলে, 'আপনি একটুও চিন্তা করবেন না মেয়ের বিয়ের জন্যে—হ্যাঁ হাজার দুয়েক টাকার মার পাঁচ হয়ে আছে—ওটা আর দিতে হবে না।'

'বলছেন? কিন্তু কর্তার মুখে না শুনলে—'

'আমরা কাল রাতে একমত হয়েই আপনাকে বলছি! তবে আমার নমস্কারী গয়নের শাড়ী—'

আশ্বস্ত হয়ে মেয়ের বাবা বলে, আটকাবে না। তবে ছেলের বাবাকে দু' তিনদিনের মধ্যে একবার পাঠিয়ে দেবেন কিন্তু—আমার বাড়ীতেই সবকিছু ফয়শালা করে নেবো।

ঠিক আছে!

* * * *

একটু পর পাখী আর তার ভগ্নীপতি সোল্লাসে বাড়ী ঢোকে।

শ্লেষকণ্ঠে পাখীর মা বলে, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ বাবুরা?'

জামাই বাবাজী মৃদুহেসে জবাব দেয়, কেন জানেন না? পরে পাখীর কাঁধে একটা কাঁকুনি দিয়ে বলে, 'কি রে বাড়ীতে বলিস্ নি কিছু? —মাঝপথে মামাবাড়ীতে নিমন্ত্রণ আছে বলে ধরে নিয়ে গেলি সে বড়? এঁ্যা?'

ম্লান হেসে পাখী বলে, 'আমার মনের কথা কেউ বুঝলে না জামাইবাবু, তাই এভাবেই জবাব দিতে হলো আমাকে। না - না বিয়ে করা আমার সইবে না।'

জামাই বাবাজী পাখীর মাথায় মৃদু চপেটাঘাত করে বলে, 'বুদ্ধু।'

একটি আশ্চর্য লীলা

নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক লীলার মধ্যে এটিও একটি ছোট ঘটনা। বেশ কয়েক বছর আগে উৎসব উপলক্ষে কাঁকুরগাছিতে বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের মুখ থেকে শোনা। রামকুমার দত্ত (বিবেকানন্দের আত্মীয়) ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে তখন প্রায়ই আসেন। ঠাকুরকে সাক্ষাৎ অবতার জ্ঞান করেন। উনি তখন ডাক্তারী পড়েন। একদিন এসে কথায় কথায় ঠাকুরকে অনুযোগ জানালেন—'আপনি ত' বলেন জোরে জোরে নাম করতে, কিন্তু এদিকে যে প্রতিবেশীরা বিরক্ত হন, নানা অসুবিধের কথা বলেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদুহেসে বল্লেন—'বেশ, এবার এমন একটা জায়গা খুঁজে বার কর দিকিনি. যেখানে একশ'টা খুন করে ফেল্লেও কেউ টের পাবে না।'

কাঁকুরগাছির বাগান কিনে ফেলা হ'ল। জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে বাগান করা হল। পুকুরটা ছিল—এখনো আছে। আর ছিল একটা কুঁড়ে ঘর। ধারে কাছে লোকবসতি নেই। মোটামুটি সাজিয়ে গুছিয়ে ঠাকুরকে প্রার্থনা নিবেদন করলেন—একবার দেখে আসার জন্য। ঠাকুরও সানন্দে রাজী হয়ে একদিন ভক্তসঙ্গে বাগান দেখতে গেলেন। গাড়ি থেকে নেমে সেই কুঁড়েঘরে গিয়ে বসলেন (এখন যেখানে পাকা ঘর)। রামকুমার থালায় করে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন এনে ঠাকুরকে নিবেদন করলেন। ঠাকুর পরমানন্দে গ্রহণ করলেন। ভক্তরাও প্রসাদ পেলেন। কিছুক্ষণ পর ঠাকুর সমস্ত বাগান ঘুরে ঘুরে দেখলেন। বললেন, বাঃ বেশ জায়গা, এখানে বেশ ঈশ্বর চিন্তা হয়।

বেশ কিছুদিন হল ঠাকুর অসুখে ভুগছেন। কোন চিকিৎসায়ই ফল হচ্ছে না। রামকুমার মাঝে মাঝেই ঠাকুরকে দেখতে যান। একদিন অনুরোধ করে বললেন,— আপনি যদি অনুমতি করেন ত' আমার পরিচিত একজন ভাল ডাক্তারকে দেখানোর ব্যবস্থা করি—কাঁকুরগাছির বাগান বাড়িতে। ঠাকুর অনুমতি দিলেন।

ঠাকুর কিছুক্ষণ আগেই কাঁকুরগাছিতে পদার্পণ করেছেন। রামকুমার ডাক্তারকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে আসার পথে ঠাকুরের প্রসঙ্গে বললেন. আজ যাঁকে দেখার জন্য তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি, তিনি একজন অবতার পুরুষ। ডাক্তার তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, রাখ তোমার অবতার টবতার। যদি ঈশ্বরভক্ত বল মানতে পারি। অমন অবতারকে কান মলে দিতে পারি। রামকুমার দু'হাত তুলে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে তিরস্কার করে বললেন, অমন কথা মুখে উচ্চারণ করতে নেই। একবার দেখ, পরে বিচার করবে। কথা বলতে বলতে গাড়ি এসে গেটের কাছে থামল। একটি

আট-দশ বছরের ছোট ছেলে দৌড়ে এসে ডাক্তারকে বলল, ঠাকুর আপনাকে ডাকছেন। ডাক্তার রামকুমারের দিকে চেয়ে বল্লেন, আমাকে চেনেন না, আমাকে কেন ডাকবেন? দেখ, তোমাকেই হয়ত ডাকছেন। রামকুমার মাথা নাড়লেন, না, ঠাকুর কখনো ভুল করেন না, তোমাকেই ডাকছেন। বাদানুবাদ করতে করতে দুজনে ঠাকুরের সামনে আসতেই ঠাকুর ঝুঁকে পড়ে ডাক্তারকে নমস্কার জানালেন। ডাক্তারও প্রতিনমস্কার জানালেন। ঠাকুরের গলায় যন্ত্রণা। তাই গলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন,—আগে গলাটা দেখবে (কানে হাত দিয়ে) পরে কানটা মলবে? নাকি আগে কানটা মলে দিয়ে পরে গলাটা দেখবে? ডাক্তারের মুখে আর রা নেই। লজ্জায় কথা বলতে পারছেন না। মুখ নীচু করে ভাবছেন, রাস্তায় নিভৃতে দুজনের ভেতর যে কথাবার্তা হল, এখানে বসে ঠাকুর কী করে সব জানতে পারলেন। সেদিন কোনরকমে ঠাকুরকে পরীক্ষা করে ডাক্তার বাড়ি ফিরে গেলেন। মন তোলপাড়। কী যেন একটা পরিবর্তন আসছে ভেতরে। সত্যিই কি অবতার পুরুষ আছেন! ডাক্তার পরে ঠাকুরের পরম ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

শরৎকাল

ডাঃ রামচন্দ্র গুপ্ত

শরৎ আসে বুঝতে পারি প্রকৃতি বদলায়
ভোরে পাখীরা মধুর স্বরে দল বেঁধে গান গায়
মাঠে ঘাটে কত রঙের ফল ফুলে ভরে যায়
রাশি রাশি শিউলি ফুল, সব আনন্দে কুড়ায়
মাথা দোলায় সাদা কাশ ফুল হাসি নিয়ে
সোনা সোনা রোদ যেন ওঠে ঝলমলিয়ে
দুর্গাপুজার বাজনা এবার ঐ বুঝি বাজে
সবুজ সবুজ চারিদিক, বেশ ভাল লাগে
রাত্রি বেলায় স্নিগ্ধ আলোয় মন কেমন করে
বৎসরান্তে উমা আবার এসেছেন মায়ের ঘরে
আগমণীর সুর যেন ছড়ায় চারিদিক
কচিদের মনে জাগে তাই খুসীর ঝিলিক
শরৎ এল গুনগুনিয়ে তাই তো ভ্রমর বলে
বুঝতে পারি প্রাকৃতিক ফুলের দেখা মেলে
ছল ছলিয়ে বয়ে চলে নদী পরিপূর্ণা
বন, নদী সবই হল নব যৌবনা
দুর্গা পূজার সময় এবার এল বুঝি কাছে
ছেলে বুড়ো সবার মন আনন্দেতে নাচে
আনন্দেরি হিল্লোল যেন দেখতে পাই আমি
শরৎ এল, তাইতো দেখি বদলে গেল সবি।

নেশার কান্না

(গল্প)

সুপ্রভাত লাহিড়ী

'বাবু, বিজয়ার প্রণাম। ভালো আছেন বাবু ? আপনাকে অনেকদিন পরে দেখলাম বাবু।'

এইবার মনে হল কে যেন আমাকে ডাকছে। পিছন ফিরে দেখি বিশ্বনাথ। ইংরেজি ২৬টা অ্যালফাবেট-এর অন্যতম 'ভি'-কে উল্টে দিলে যা দাঁড়ায় ওর অবস্থাটা এখন তাই। সর্বক্ষণ চলমান মানুষটাকে দেখেই ওর দিনটা কখন কেটে যায় তা ও নিজেই জানতে পারে না। প্রয়োজনে অতিকষ্টে মুখটা তুলে ধরে। সে মুখে কাতরতা ফুটিয়ে তোলার কোনোরকম প্রচেষ্টা নেই। সমস্ত শরীরের রক্ত তখন ওর মুখে। দু চোখের আশেপাশে তখন অজস্র রেখা-পড়া শিরার সমাবেশ। মনে হয় চোখ-দুটো যেন কোনো কুচক্রী মাকড়সার আক্রমণে এইমাত্র পরাস্ত হয়েছে। আর ও নিজে প্রায় নিয়ত এই চোখের দৃষ্টি দিয়ে পার্ক স্ট্রীট, লিণ্ড্‌সে স্ট্রীট, কার্জন পার্কের হাজার হাজার লোককে পরাস্ত করেছে।

শরীরটা ভেঙে গিয়ে এখন বুঝতে অসুবিধার সৃষ্টি করলেও একটু বিশেষ নজর দিলে ওর বয়সটা সহজেই অনুমান করা যায় আর তার পরেই নতুন করে ওর জন্যে বিচিত্র অনুভূতিতে মনটা ভরে ওঠে। মুহূর্তের জন্যে শরীরের কলকব্জাগুলো অকেজো হয়ে পড়ে।

বড়জোর ছাব্বিশ-সাতাশ বছর। খালি গা। পিঠ দেখে বুকে মাংস কতখানি আছে তা কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। হাতদুটো কোনোরকমে শরীরের সঙ্গে লেগে তার সম্বল রক্ষা করছে। প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে হাতদুটো সমান তালে আগুপিছু করছে। খেলার ট্রাফিক পুলিশের মতো। ফিকে সবুজ রঙের লুঙ্গিটা কোমরের সঙ্গে গিঁট বাঁধা রয়েছে। একমাথা চুলে গাছের পাতা থেকে পাখির পালক—সবই রয়েছে। এক সময়ে চুলের প্রতি যে যত্ন নেওয়া হত তা আমার মতো যুবক বোঝে! হাতে একটা চটের থলে। যখন যা পায় সব ঐ থলের মধ্যে চালান করে দেয়। কোনোরকম অবলম্বনের ধার ধারে না। লাঠি নিতে ওর ভীষণ আপত্তি। এ নিয়ে একবার প্রশ্ন তোলায় ও আমাকে গরম চক্ষু দেখিয়ে উত্তর দিয়েছিল—'কেন, আমি কি অথর্ব ?' আমিও একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ে ফেলেছিলাম, না, তা নয়। তবে একটা লাঠি থাকলে তোমার কাজের সুবিধা হয়। ও আর একবার আমার দিকে সেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আস্তে আস্তে সরে গিয়েছিল। সে চোখে আমার প্রতি কোনো রকম কৃতজ্ঞতার চিহ্নমাত্র নেই। আমি যেন ওর চাকরি করে দিয়ে একটা বিরাট অন্যায় করে ফেলেছি। অনেকের মুখ থেকে এও আমার কানে এসেছে যে ও নাকি চলে ভিক্ষে করে এর থেকে বেশি রোজগার করত। অথচ আমাদের ওখানে ও নেহাত খারাপ পেত না। সাড়ে তিনশো আর টুকিটাকি বকসিসে

ওর মতো একলার স্বচ্ছন্দে চলে যায়। মাথা গোঁজার ঠাঁইও অফিসের মধ্যে এক জায়গায় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।

আমি জানি মুখে ও যাই বলুক, মনে মনে ও আমার সম্বন্ধে অন্য ধারণা পোষণ করে। অন্তত অ্যাডভান্স নেবার প্রয়োজন যখন হয় তখন ওর কাছে আমি ভগবানেরও উপরে। আমার মতো সৎ ভদ্র এ অফিসে কেন এ দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া ভার।

মাইনে পাওয়ার দু-একদিনের মধ্যেই ও আমার কাছে এসে ঘ্যানর ঘ্যানর করত। 'স্যার সামনের মাসের কিছু টাকা আগাম পাইয়ে দিন না স্যার! আপনি না দেখলে কে আমাকে দেখে স্যার।' অথচ এটা বুঝবে না যে আমি ওকে বারে বারে অ্যাডভান্স দিই কী করে? অফিসটা তো আমার নিজের সম্পত্তি নয়। এমনিতে আমার উপর অফিসের সবাই একটু চটা। আমাদের ম্যানেজিং ডাইরেকটার আমাকে একটু বেশি স্নেহ করেন বলে আমি সেই সুযোগ নিই। তার ফলেই এই অদ্ভুত-দর্শন লোকটি স্টোরে কাজ পেয়েছে।...

হঠাৎ কেমন যেন ভীষণ রাগ হল ওর ওপর। অপুর ডান হাতটা আমার ডান হাতের মধ্যে চেপে ধরে বেশ একটু জোরেই হাঁটা দিলাম। কিছুটা দূর গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। আবার পিছন দিকে হাঁটা শুরু করলাম। বিশ্বনাথ আমার চলে-যাওয়া পথের দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়েছিল, হাত দুটো রাস্তায় ভর দিয়ে। আমার ফিরে আসা টের পেতে-না-পেতেই পকেট থেকে দুটো টাকার একটা নোট ওর সামনে ধরেছি। আস্তে আস্তে মুখটা আমার সামনে তুলে ধরল। ভাবলেশহীন একটা মুখ। হাতে পায়ে কেমন যেন একটা সংকোচের ভাব। এক হাতে ওর থলেটা ফাঁক করে অন্য হাতে নোটটা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। ও সেইখানেই বসে পড়ল।

জামার পিছনে টান পড়তে দেখি অপু আমার জামাটা ধরে টানছে। ওর সারা মুখ জুড়ে একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের ভাব। জামাটা না ছেড়েই ও ভুরু কুঁচকে বলল, 'দুটো টাকা দিলি?'

—'দিলাম। বেচারা!'

—'তুই ওকে চিনিস নাকি?'

ওর পিঠে আলতো করে হাতটা ছুঁইয়ে ইশারায় হাঁটা শুরু করতে বললাম।

—বিশ্বনাথকে আমি যখন প্রথম দেখি ও তখন হাসপাতাল থেকে সবে ছাড়া পেয়েছে। বেশিক্ষণ হাঁটতে পারে না। মাঝে মাঝে বসে আর হাঁপায়। ডানহাতটা ঠিক সামনের দিকে তোলাই রয়েছে।

অফিসের ছুটির পর আমি একটু পিছনের দিকে হাঁটি। সারাদিন অফিসের কাজকর্মের মধ্যে কেবলই মনে হয় আমরা কত এগিয়ে চলেছি। দিন দিন ব্যবসাপত্তর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে। আর ব্যবসাপত্তরের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সমস্ত দিকগুলোই বোধ হয় দিন দিন এগিয়ে চলেছে। অফিসে সারাদিনের কাজকর্মের পর পিছনের দিকে হেঁটে অন্য পরিবেশে চিন্তা করবার

চেষ্টা করি—আমরা সত্যিই এগিয়েছি কি না! আর অগ্রসর হলেও তার পরিমাণ কতটুকু। আসলে এ সমস্ত কিছুই নয়। অফিসের ছুটির পর পার্ক স্ট্রিট থেকে বাসে ওঠা আর সাহারার বালুকা সমুদ্রের ধারে বসে আম-ক্ষীর খাবার কল্পনা একই পর্যায়ে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে কার্জন পার্কের বাস-স্টপে এলে কয়েকটা ছ'নম্বর ছেড়ে একটু পা দেওয়ার জায়গা পাওয়া গেলেও যেতে পারে। তাও সব দিন না।

ও বসে বসে হাঁপাচ্ছিল। মুখের থেকে ফুটপাথের দূরত্ব বড়জোর ছয় ইঞ্চি। আমি অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে আর একটু হলে ওর গায়েই পড়ে যেতাম। ও আমার পায়ের শব্দ থেমে যাওয়া স্থানকে লক্ষ্য করে মাথাটা বাঁদিক দিয়ে কাত করে আমার দিকে এক পলক চেয়েই হাতটা বাড়িয়ে দিল। আমি তখনই পকেটে হাত দিলাম না। ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। আমার নজর ওর সারা শরীর ঘিরে ছিল। ওর পিঠে কাঁধে শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতচিহ্ন। বেশ কয়েক মিনিট সময় বোধহয় কেটে গেছল। ও কী একটা গালাগাল দিয়ে হাতটা সরিয়ে নিল। ভেবেছে আমি চলে গেছি। ওর বিড়বিড়ানিতে আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার এ হাল হল কী করে?' আমার প্রশ্ন থেকে আমার উপস্থিতি টের পেয়ে ও এত বেশি চমকে গেল যে তাড়াতাড়ি উঠে বসতে গিয়ে কলসির মতো গড়িয়ে একটু দূরে চলে গেল। আমি ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। ও আর একবার গড়ান দিয়ে মাটিতে দু'হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অনবরত বলে চলেছে: 'অপরাধ নেবেন না বাবু, অপরাধ নেবেন না বাবু, আজ সারাদিন শালা এক পয়সাও পাই নি।' আমি ওকে সেই একই প্রশ্ন করলাম।

'নারকেল গাছ থেকে পড়ে। শালা কপাল। বাঁ হাতটা মাটিতে রেখে ডান হাতটা দিয়ে চটাং করে কপালে একটা চাঁটি মারল। আমি ওর কপাল থেকে নেমে আসা হাতে একটা টাকা গুঁজে দিলাম।

ও আবার মুখ থুবড়ে বসল। টাকাটা একবার দেখে নিয়ে মুখটা কাঁচুমাচু করে বলে উঠল, 'দিলেনই যখন তখন পুরো পাঁচ পাত্তিই দেন। একটা সুঁইয়ের পয়সা অন্তত উঠুক। কী যে সুঁইয়ের নেশা আমাকে ধরল, এর থেকে মরে গেলেই পারতাম।' একটানা এতগুলো কথা বলে ও বেশ হাঁপাতে লাগল। ওর সব কথা আমি ভালো করে বুঝতে না পারলেও সুঁইয়ের কথাটা কানে খট্ করে বেজেছিল। আমি অতিমাত্রায় ব্যগ্রতা প্রকাশ করে ফেললাম, 'সুঁইয়ের নেশা কী জিনিস?'

'নামটাম আমি জানি না। ব্যথা উঠলে ডাক্তারবাবু দিতেন। বেশ কিছুক্ষণ কোনো কষ্ট থাকত না। এখন কেমন জানি নেশা ধরে গেছে। সুঁই না নিলে আমি পাগল হয়ে যাব।'

আমি বুঝতে পারলাম, মরফিয়া জাতীয় কিছু একটা হবে। এদিকে আমাকে ওকে ঘিরে দু-একটা লোক জমতে শুরু করেছে। কোথায় একজন টাইপরা বাবু আর কোথায় ফিকে লুঙ্গি সর্বস্ব একটা বিকৃতকায় মানুষ। খুবই অদ্ভুত কিনা! নিশ্চয়ই চুরি-ছ্যাঁচড়ামির কোন ব্যাপার।

আমি অবস্থার গুরুত্ব আঁচ করতে পেরে সাত তাড়াতাড়ি ওকে ওর নামটা জিজ্ঞাসা করলাম। ও বলল 'বিশ্বনাথ'। আমি ওর হাতে একটা টাকার নোট গুঁজে দিয়ে জোর কদম চালালাম।

সেদিন থেকেই আমার মন জুড়ে শুধু বিশ্বনাথ। আর বিশ্বনাথ। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। কিন্তু ওর অসহায় অবস্থাটা আমাকে বেশ প্রভাবিত করেছিল। তাই পরদিন অফিসে এসে একটা অদ্ভুত কাজ করে ফেললাম। সোজা বড় সাহেবের ঘরে এসে একটা দুঃসাহসিক আর্জি পেশ করলাম। বড় সাহেব আমার কথাটা খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। দু-একবার ঘড়ি খুললেন আর পড়লেন। শেষে পুরো শরীরটা দিয়ে চেয়ারটাকে দোলাতে দোলাতে বললেন, 'ওকে আমিও দেখেছি। ওর যা শরীরের অবস্থা তাতে করে ও কি ষ্টোরের কাজ করতে পারবে? আর এর আগে এ রকম কাজ কি ও করেছে?'

আমি দেখলাম, এই সুযোগ। সাহেব যে আমার কথাটাকে আমল দিয়েছেন তাই যথেষ্ট। তড়বড়িয়ে বলে উঠলাম, 'কথায় বার্তায় খুবই চটপটে। দেখতে ওইরকম বলেই যা অসুবিধা। তাও তো আর সবার সামনে বের হচ্ছে না। ও তো ষ্টোরেই থাকছে।'

'দেখ, যা ভালো বোঝ করো। শেষকালে চুরি করে তোমার আমার দুজনের না মুখে চুনকালি দেয়।'

আমি তখন 'সে ঠিক আছে স্যার, সে আমার দায়িত্ব' বলতে বলতে একেবারে স্যুইং ডোর ঠেলে বাইরে।

সেদিন অফিস ছুটির পর রাস্তার এধার-ওধার দেখতে দেখতে ওকে আগের দিনের জায়গাতেই পেলাম। আমাকে দেখে যেখানে বসেছিল ওখানেই একটা পেন্নাম ঠুকল। আমি ওর বেশ কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'এর আগে কোথায় কাজ করতে?'

ও ভীষণ চমকে উঠল, 'কেন, কেন?'

'না, এমনি জিজ্ঞাসা করছি। পড়াশুনা কতদূর করেছ?'

'ক্লাস এইট অবধি। একটা ইলেকট্রিকের দোকানে কাজ করতাম। গতবার বিশ্বকর্মা পুজোর রাতে চুরি করে নারকেল পাড়তে গিয়ে বাবা বিশ্বকর্মা আমাকে বিশ্বকর্মা করে ছেড়ে দিয়েছে।' কথাগুলো রসিয়ে রসিয়ে বলে ওর সে কী খ্যাঁকখ্যাঁকানি হাসি।

আমার ভীষণ রাগ হল। নীচু হয়ে ওকে ধমকাতে গিয়ে দেখি ওর দু পায়ের মাঝখানের জায়গাটায় টপ্ টপ্ করে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল।

এ দুদিনেই যেন ওকে ধমকাবার, সান্ত্বনা দেবার অধিকার অর্জন করে ফেলেছি। একটু আগে যেমন ধমকাতে গেছিলাম সেইরকম এবার এগিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিলাম, 'কে বললে তুমি অকর্মণ্য হয়ে গেছ? তুমি তো বেশ হাঁটাচলা করতে পার। আমাদের অফিসে কাজ করবে?'

ও ফ্যালফ্যাল করে অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

পরদিন থেকেই আমাদের অফিসের ষ্টোরে ওর একটা কাজ জুটে গেল।

'তা বলে তুই ওকে পাঁচ টাকা দিয়ে দিলি?' অপুর প্রতিবাদসূচক ধমকানিতে একটু থতমত খেয়ে গেলাম। একটু পরে ওকে ডান হাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, 'এ টাকা না পেলে ও পাগলের মতো হয়ে যেত। ও নির্ঘাত চুরি করত। মরফিয়া ওকে আজ নিতেই হবে।'

'আর সেইজন্যেই তো তোমার টাকাটা দেওয়া অন্যায় হল।' অপু আমার উপর বেশ ক্ষুব্ধ।

'দোষটা ওর নয়। দোষ যদি কারও হয়ে থাকে তবে সে ওর ডাক্তারের। মরফিয়া ইনজেকশন নিতে নিতে আজ এমন অবস্থায় এসে পৌঁচেছে যে মরফিয়ার পয়সা জোটাবার জন্যে ও চুরি করতেও প্রস্তুত। আর এই চুরির অপরাধেই আমাদের কোম্পানি থেকে ওর চাকরি যায়। ওকে পুলিসে দেওয়া হত। নেহাত বড় সাহেব দয়া করলেন বলে।'

অপু দূরে ওর অপসৃয়মাণ দেহটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু চেহারার যা হাল হয়েছে তাতে তো বেশিদিন টিকবে বলে মনে হয় না।'

'সেইজন্যেই তো দিলাম। আমি না দিলে হয়তো অন্য কেউ দিত। হয়তো কেউ দিত না। ফলে চুরি করে মার খেতে-খেতেই প্রাণটা বেরিয়ে যেত।'

অপু একটা ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়ে থামাল। আমরা তাতে উঠে বসলাম। পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে লাল আলোর হুমকিতে ট্যাক্সিকে দাঁড়াতে হল। অপু আমাকে একটু ঠেলা দিতেই বাঁ পাশে নজর গেল। দেখি, বিশ্বনাথ পিছনে দুটো হাত দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছে একটু হাসবার। পিছনের হাতে ব্যাগটা ক্রমাগত দুলে চলেছে। দেহের সমস্ত রক্তই বোধ হয় এখন ওর মুখে।

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন

দক্ষিণ কলিকাতা শাখা

১১, পালিত স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯

দুঃস্থা মহিলাদের আইনগত সাহায্য এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

সমীরণ

ডাঃ রামচন্দ্র গুপ্ত

এক সময় কলকাতার হাটখোলা নাম করা ঐতিহাসিক জায়গা ছিল, যদিও এখনও ইতিহাসে বা মানুষের মনে এই ঐতিহাসিক জায়গার কথা মনে পড়ে। তখন ছেলেপুলেরা সব সময় হৈ চৈ করত, ফুটবল খেলতো আবার কোন কোন সময় পয়সার অভাবে নেকড়ার বল খেলতো। যা খেলা হ'ত সব রাস্তাতেই এমন কি প্রতিযোগিতাও হ'ত। এখনকার দিনের মত এত গাড়ী বাস, বিক্সা ছিল না। বড় লোকের ও গরীবের ছেলে এক হয়ে খেলতো।

আমাদের সমীরণ ছিল পাড়ার সেরা—সে যেমন লেখাপড়ায় তেমনি খেলাধূলায়, তার আরও গুণ ছিল সকলের সময়ে অসময়ে কাছে এসে দাঁড়াত, বিপদে আপদে সমীরণই ছিল সকলের ভরষা।

হঠাৎ একদিন সমীরণ পাড়া থেকে লোপাট হয়ে গেল—কেউ তার কোন খোঁজই দিতে পারলো না। আমরা খুবই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম সমীরণের মত চালাক, বুদ্ধিমান ছেলে দিনের বেলায় কি করে উবে গেল। সমীরণের মা বাবার অবস্থা ভাল ছিল না, রোজের রোজ কাজ করে খাবার যোগাড় করতে হ'ত। বাপ মায়ের আশা ছিল তাদের ছেলে সমীরণ একদিন মানুষ হবে তখন তাদের আর দুঃখ থাকবে না। আজ অনেকদিন হয়ে গেল সমীরণের কোন খবর নাই। বাপ মায়ের আশা তাদের ছেলে সমীরণ ফিরে আসবে একদিন না একদিন।

ওস্তাদ খাঁন নামে এক বিখ্যাত গুণ্ডার ছিল হাটখোলাতে আড্ডা। তার মাথায় এল, গুণ্ডামী করে কত চলতে পারে? তাই সে ঠিক করলো অন্যপথে রোজগার করবে। সে নিজের গুণ্ডাদলের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তালিম দিয়ে, নানা রকম কসরৎ শিখিয়ে তার মধ্যে ছুরি খেলা, পকেট মারা, বাহাদুরি ইত্যাদি ইত্যাদিতে পাকা পোক্ত করে তুললো। ওস্তাদ খাঁনের প্রথম শীকার হল সমীরণ। আজ প্রায় পনর ষোল বছর হ'ল এসেছে - সমীরণ এখন সব রকম দক্ষতা অর্জন করেছে এমন কি সে তার শিক্ষকদেরও হারিয়ে দেয়। তাই তার নাম হয়েছে বিচ্ছু।

ওস্তাদ খাঁন বিচ্ছুকে খুব ভালবাসেন মাঝে মাঝে উৎসাহ দেয় এই বলে তুই বেটা আমার ডান হাত। তোর উপর আমি সব সময় নির্ভর করি। এখন থেকে তোকেই আমার ব্যবসার সব কিছুই দেখতে হবে। এই বলে বিচ্ছুকে উৎসাহ দেয় আর যতসব খারাপ কাজ বিচ্ছুকে দিয়ে করিয়ে নেয়। কাজের বেলায় এমন সব কাজ দেবে যাতে বিচ্ছু ধরা পড়ে যায়। ওস্তাদ খাঁনের মনে কি যে প্ল্যান ঘোরে কেউ আঁচ করতে পারে না—বিচ্ছু কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। ওস্তাদ খাঁনের মনোমত কাজ করা সত্ত্বেও বিচ্ছুর কোন উন্নতি হয় না।

ওস্তাদ খাঁনের এখন আরও উন্নতি হয়েছে—সে এখন আর পকেটমারের বা ছিনতাই-এর দিকে নজর দেয় না -তার নজর সোনা, গাঁজা, চরস পাচার ও আনা নেওয়ার দিকে—এতে ওস্তাদ খাঁনের প্রচুর অর্থাগম হয়।

ওস্তাদ খাঁনের এখন খুব উন্নতি হয়েছে—সে এখন মোটর ছাড়া চলে না। আর বিচ্ছু—যার জন্য ওস্তাদ খাঁনের উন্নতি, তার অবস্থা ঠিক আগের মতনই আছে।

বিচ্ছু একদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবছে তার ছোট বেলার কথা—মা বাবার কথা, এইসব ভাবতে ভাবতে বিচ্ছুর চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। বিচ্ছু মাকে খুব ভালবাসতো—মা বলতো সমীরণ তোর আশায় আমরা দিন গুনছি। এছাড়া বিচ্ছু চিন্তা করে আমার জন্য ওস্তাদ খাঁন আজ এত বড় লোক -আমার অবস্থার সে কোন উন্নতিই করলো না। এইসব নানাবিধ বিচ্ছুর মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুল্‌লো। সেদিন এই সব নানা কথা মনে আসায় বিচ্ছুর ঘুম আসতে চায় না। বিচ্ছু উঠে ঘাড়ে জল দেয় আর খানিকটা ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়ায়—তারপর সে বিছানায় শুয়ে পড়ে। সেদিন সকালে বিচ্ছুর ঘুম ভাঙ্গে দেরীতে। ওস্তাদ খাঁন বিচ্ছুকে কোন দয়া দাক্ষিণ্য দেখায় না তার ঘুম থেকে দেরীতে ওঠার জন্য—বিচ্ছুকে ওস্তাদ খাঁন মারধর করতে থাকে। ওস্তাদ খান বিচ্ছুকে একটি কাজ দিয়েছেন, খুব ভোরে ওঠে সেটা করার কথা। বিচ্ছুর দেরীতে ঘুম ভাঙ্গার জন্য বিচ্ছুকে আজ মার খেতে হ'ল। বিচ্ছু ওস্তাদ খাঁনের ব্যবহারে খুবই ব্যথা পায় কিন্তু কিছু প্রকাশ করে না।

বিচ্ছু ওস্তাদ খানের দেওয়া কাজ নিয়ে বেড়িয়ে গেল—সেই যে গেল বিচ্ছু আর ফিরলো না। ওস্তাদ খাঁন বিচ্ছুর অনেক খোঁজাখুজি করলো—বিচ্ছুর খোঁজ সে কোথাও পেল না।

আজ প্রায় কুড়ি বৎসর পরের কথা—হঠাৎ আমাদের সমীরণ ওরফে বিচ্ছুকে দেখা গেল দিল্লীতে। ইয়া দাঁড়ি গায়ের রঙ টক্‌টকে, মাথার চুলে পাক ধরেছে, মুখে ইয়া লম্বা চুরুট—দেখলে মনে হয় যেন একজন ইউরোপীয়ান—একটা মার্সিডিস্ বেঞ্জ গাড়ী থেকে নামছে। দুজন বেয়ারা তাকে সেলাম জানিয়ে তার ব্যাগ বহন করে এক বিরাট বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল। পিছন পিছন চুরুট খেতে খেতে আমাদের সমীরণ ওরফে বিচ্ছু এগিয়ে গিয়ে লিফটের কাছে এসে দাঁড়াল। চুরুটের ছাই ঝেড়ে সে লিফটে উঠে পড়লো। তিন তলায় লিফট থেকে নেমে এক বিরাট অফিসে প্রবেশ করলো—এই অফিসে প্রায় শ-চারেক লোক বসে কাজ করছে। এক্সপোর্ট ইম্‌পোর্টের ব্যবসা এছাড়া অন্যান্য ব্যবসাও আছে। এই হ'ল আমাদের সমীরণ ওরফে বিচ্ছুর অফিস। বিচ্ছুর ইংল্যাণ্ডে বিরাট অফিস—বছরের মধ্যে নয় মাসই ইংল্যাণ্ডে থাকে।

অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেল—বিচ্ছু ওরফে সমীরণ, মনের দুঃখে ওস্তাদ খাঁনের

কাজ নিয়ে যেখানে গিয়েছিল—তারাই সমীরণকে তাদের ব্যবসায় লাগায়। পরে ব্যবসার জন্য বিচ্ছু লণ্ডনে যায়—সেখানে একটি পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছুর আলাপ হয়!

এই পরিবারে কোন আপনজন বলতে কেউ নেই। বৃদ্ধ মুলিনস ও তাঁর স্ত্রী বৃদ্ধা মিসেস মুলিনস বাস করেন। বিচ্ছু ওরফে সমীরণ এদের বাড়ীতে আশ্রয় পায়। সমীরণ এদের দুজনকে মা বাপের মত শ্রদ্ধা করতো। তাদের সুখ সুবিধা দেখতো। আর যখন যা যা ফরমাস করত সমীরণ সঙ্গে সঙ্গে সবই করে দিত। সমীরণের ব্যবহারে মিসেস মুলিনসের মনে আস্তে আস্তে অপত্যস্নেহ জাগরিত হয়। মিঃ মুলিনসও তার মিসেসের দেখাদেখি সমীরণকে নিজের ছেলের মত দেখতে সুরু করেন। এই পরিবারের কোন পুত্র সন্তানাদিও ছিল না। সমীরণও মিঃ মুলিনস ও মিসেস মুলিনসকে মা বাবার মত ভক্তি করতো। এইভাবে সমীরণ ওরফে বিচ্ছু এদের সংসারে জড়িয়ে পড়ে। মিঃ মুলিনসের প্রচুর সম্পত্তি ও একটা বিরাট ব্যবসা ছিল। মিঃ মুলিনসের মৃত্যুর পর সমীরণকে সব দেখাশুনা করতে হয়। এরপর মিসেস মুলিনস আর পাঁচ বৎসর বেঁচে ছিলেন। মিসেস মুলিনসের মৃত্যুর পর সমীরণই এই বিরাট সম্পত্তি ও বিরাট ব্যবসার মালিক হয়ে ওঠে। এরপর সমীরণ তার দক্ষতায় ব্যবসা ও সম্পত্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে তোলে।

সমীরণের ইচ্ছায় দিল্লীতে একটি নূতন অফিস ও ব্যবসাকেন্দ্র খোলা হয়। সমীরণের জীবন ভালভাবেই চলে যাচ্ছিল—মাঝখান থেকে বাদ সাধলো একটি মেয়ে মমতা। সমীরণ এতদিন বিয়ে করেনি—বিয়ে করারও ইচ্ছা ছিল না তার। যেদিন থেকে সমীরণ মমতার সংস্পর্শে এসেছে সেদিন থেকে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। মমতাও সমীরণকে ভালবাসে। মমতা সমীরণের বাড়ী আসে গল্প করে, চা খায়, সময় হলে চলে যায়।

দিল্লীতে সমীরণ একটি কনট্র্যাকট সই করবার দিন হঠাৎ তার সঙ্গে ওস্তাদ খাঁনের দেখা। কেন না ওস্তাদ খাঁনও এই কনট্রাকট পাওয়ার জন্য তদ্বির করছিল।

সমীরণকে দেখে ওস্তাদ খাঁনের বিচ্ছুর কথা মনে হ'ল। অমনি সে বিচ্ছুকে ধরে বলতে গেল বিচ্ছু তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে এতদিন কোথায় ছিলে। এই বলে সমীরণকে একটি ঘুসো মারে। সমীরণ আর থাকতে পারে না সেও ওস্তাদ খাঁনকে আচ্ছা করে মার দেয়। আর বলে মনে করেছ তুমি জীবনে আগে যা করেছ সেই রকম ভাবেই জীবন কাটিয়ে দেবে। আমাকে তুমি আগের মত ব্যবহার করবে।

ওস্তাদ খাঁন সেদিনের মত রক্ষা পায় আর যাবার সময় বলে যায় আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে তোমার ধড় মাটিতে পড়বে। সমীরণ হেসে উড়িয়ে দেয়। এরপর কনট্রাক্ট সই করে অর্ডার নিয়ে সমীরণ অফিসে চলে যায়।

সমীরণ ওস্তাদ খাঁনের মতিগতি সম্বন্ধে জানাই ছিলো। সেদিন থেকে সমীরণ ওস্তাদ খাঁনের খবরাখবর রাখবার জন্য নিজের লোক নিযুক্ত করলো—আর কয়েকজন বিশ্বস্ত লোককে ছায়ার মত নিজের কাছে কাছে রাখে।

এর কয়েকদিন পর ওস্তাদ খাঁনের সঙ্গে আর একটা কনট্রাক্ট নিয়ে সমীরণের বচসা হয়। এই কনট্রাক্টও সমীরণ পায়। পরপর কয়েকটি কনট্রাক্ট হাত ছাড়া হওয়ায় ওস্তাদ খাঁন আরও মরীয়া হয়ে ওঠে। একদিন রাত্রে ওস্তাদ খাঁন দলবল নিয়ে হঠাৎ সমীরণের বাড়ী আক্রমণ করে। সমীরণ ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত থাকায় তার বিশেষ ক্ষতি হয়নি—এতে ওস্তাদ খাঁনের কিছু লোক ধরা পড়ে। সমীরণ ও ওস্তাদ খাঁনের মনোমালিন্য আরও বেড়ে যায়।

সমীরণ ওস্তাদ খাঁনের ব্যবসার গোপনীয়তা সবই জানতো—জানলেও তা প্রকাশ করেনি ওস্তাদ খাঁনের কুৎসিত ব্যবহারে সমীরণ আস্তে আস্তে গোপনে ওস্তাদ খাঁনের ব্যবসার কথা—চোরাই চালানের কথা পুলিশকে জানায়। পুলিশ সমস্ত কিছু তল্লাসি করে অনেক কিছু আপত্তি-কর জিনিষ পায়—এছাড়া গোপনে মাল আনা নেওয়ার ব্যবসাও ধরা পড়ে যায়। ওস্তাদ খাঁন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়।

মমতা যে ওস্তাদ খাঁনের মেয়ে তা সমীরণের জানা ছিল না। বাবা ধরা পড়ায় মমতা সমীরণের কাছে ছুটে যায়—বাবাকে বাঁচাবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করে। মমতাকে সমীরণ জিজ্ঞাসা করে কই এতদিন তুমি তো বলনি ওস্তাদ্ খাঁন তোমার বাবা। যাই হোক চলো থানায় কি করতে পারি?

সমীরণ মমতাকে নিয়ে থানায় গিয়ে ওস্তাদ খাঁনের সঙ্গে দেখা করে। মমতা বাবাকে বলে সে সমীরণকে বিয়ে করবে। ওস্তাদ খাঁন সমীরণ ও মমতাকে দেখে বলে—সমীরণ আমি হেরে গেছি। তুমিই জয়ী। এখন দয়া করে তুমি আমার মেয়েকে বিবাহ করলে খুশী হ'ব।

সমীরণ ওস্তাদ্ খাঁনকে জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। কয়েকদিন পর ওস্তাদ্ খাঁন দাঁড়িয়ে থেকে মেয়ের বিবাহ সমীরণের সঙ্গে ধুমধামের সাথে সম্পন্ন করায়।

মমতার অনুরোধে সমীরণ কলিকাতায় তার মা বাবার সন্ধান করে জানতে পারেন মা বেঁচে আছেন—বাবা কয়েকদিন আগেই গত হয়েছেন। সমীরণ খোঁজ খবর নিয়ে মাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। এখন সমীরণ সুখী—মা, স্ত্রী ও শ্বশুরকে নিয়ে।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সর্বধর্ম সমন্বয় বাণী—

শিকাগো ধর্মমহাসভার শতবর্ষ পূর্তি বছরে একটি কার্যকরী প্রস্তাব

শ্রীরামধন দাস (নিউ দিল্লী)

(এক)

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণগুলির মধ্যে যে বাণী শুনিয়েছিলেন, তার মধ্যে সর্বধর্ম সমন্বয় বাণী অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এ যুগে পৃথিবীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, কলহ, সংঘর্ষ, রক্তপাত, আণবিক বোমার ত্রাস প্রভৃতি অশান্তি মানুষকে ক্ষুব্ধ করছে, তার একমাত্র সমাধান এই বাণী। এই বাণী বৈদিক ঋষির উপলব্ধ সত্য, যিনি বলেছেন : একং সদ্‌বিপ্রাঃ বহুধাবদন্তি ; এই বাণীই হিন্দুধর্মের গীতা উপনিষদাদি সকল শাস্ত্রের মর্মবাণী ; আবার এই বাণীই এযুগে অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের "যত মত তত পথ" রূপে উপলব্ধ এবং তাঁরই বার্তাবহ স্বামী বিবেকানন্দেরও অদ্ভুদ মনীষা ও গভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধির কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত সত্য। আজ শতবর্ষ পূর্বে এই সর্বজনীন সত্যটি নির্ভয়ে ঘোষণা করেছিলেন স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভার মাধ্যমে সমস্ত জাতির কাছে।

স্বামীজীর এই ঘোষণার বিশেষত্ব এই যে, সেই ধর্মমহাসভার অন্যান্য বক্তাদের কথা আজ অবলুপ্ত ; কিন্তু তাঁর এই বাণী দিন দিন প্রসার লাভ করছে। এই বাণী আমেরিকাবাসীর মর্মে মর্মে প্রবেশ করেছে। যোগ্য ব্যক্তিগণ ইহাকে জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করছেন। তবেই ত আজ আমেরিকায় সেই শাশ্বত বাণীর পুনরালোচনার জন্য শতবর্ষ পূর্তির উৎসবের আয়োজন হচ্ছে।

(দুই)

শিকাগো বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে নানা প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ করা হ'লেও, এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নির্বিবাদে এই মঞ্চ থেকে নিজ নিজ মত ঘোষণা করার স্বাধীনতা থাকলেও, আয়োজকদের গোপন উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বামীজী এই ভেদটি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন তাঁর একখানি পত্রে ; "খৃষ্টধর্ম অপর ধর্মাপেক্ষা মহত্তর এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই ধর্ম্মমহাসভার আয়োজন হইয়াছিল।" কিন্তু এযুগে বিশ্বমানবতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল এই জড়বাদী নিষ্ঠুর সংঘর্ষময় জীবন যাত্রার একটি সমাধান এবং এক স্থায়ী শান্তি। ঠিক পথ নির্দেশ দেওয়া তাঁরই পক্ষে সম্ভব যাঁর মানবতার গভীরে প্রবেশ করার শক্তি বিদ্যমান। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তির যথার্থ অধিকারী ছিলেন।*

---

* "His (Ramakrishna's) was probably the only really universal mind of modern time"—Sister Nivedita.

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে অধ্যাত্মভাবনার নির্যাসের অন্বেষণে ও সাধনায় নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। সকল ধর্ম ও মত নিজ জীবনে সাধনা করে তাঁর এই উপলব্ধি: "যত মত তত পথ"। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা: সব ধর্ম সত্য কিন্তু পথ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। একেই বলা হয়েছে 'সর্বধর্ম সমন্বয়' বাণী।

স্বামীজী এই সমন্বয় বাণী শিকাগো ধর্মমহাসভায় উপস্থাপিত করে গৌরবের সহিত বলেন; যে ধর্ম জাতকে পরধর্ম মত সহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে তিনি সেই ধর্মভুক্ত। এধর্ম শুধু সকলের ধর্মকে সহ্য করে না, সকল ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে। শিবসহিষ্ণু স্তোত্র থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বল্লেন, বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থান, কিন্তু সব নদীই সমুদ্রে মিলিত হয়ে একাকার হয়ে যায়, সেরূপ রুচির বৈচিত্র্য থাকলেও এ সরল কুটিল নানা পথ দিয়ে হলেও সকলের লক্ষ্য একই। তারপর গীতার বিখ্যাত শ্লোকটি "যে যথা সাংপ্রবদ্যন্তে"—ইত্যাদি উদ্ধৃত করে ধর্ম সংঘর্ষের এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সকল সংঘর্ষের অবসান ঘটিয়ে সকল ধর্মের সকল জাতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য আহ্বান জানালেন। "বিবাদ নয় সহায়তা: বিনাশ নয় পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয় সমন্বয় ও শান্তি।" এই ছিল তাঁর ধর্ম সভার অন্তিম বাণী।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল মুখে বলেন নি, লিখেও দিয়েছিলেন "নরেন শিক্ষেদেবে" এই ধর্ম সমন্বয়ের পরম সত্যটি নরেণই (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রথমে পশ্চিমী মানুষকে শিক্ষা দিলেন। তাঁর প্রণামী অভিনব: আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি, বৌদ্ধিক যুক্তি দিয়ে লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে বলা; এবং এই ভাবান্দোলনকে স্থায়ী করার জন্য সংঘ প্রতিষ্ঠা করা। তখনই ধর্ম সমন্বয়রূপ সত্যের বীজ রোপিত হল। একথা পরে স্পষ্ট বলেছিলেন: "বীজরোপণ হ'ল একদিন মহীরুহ হবে।'

(তিন)

ধর্ম সমন্বয় বাণীর একটি উদারতা ও সর্বব্যাপ্তির দিক আছে। স্বামীজি বলছেন, মানুষ অসত্য থেকে সত্যে গমন করে না. বরং সত্য থেকে সত্যে আরোহণ করে; নিম্নতর সত্য হোক উচ্চতর সত্যে। তার গতি অপ্রতিহত। শেষে সে পরম সত্যে বা মুক্তিতে উপনীত হয়। প্রত্যেকেই মুক্তি পথের যাত্রী। আবার বলছেন, মানুষ বহুত্বের মধ্যে জন্ম নিলেও সেই একত্বেদিকে ফিরে যাবার তার চেষ্টা। প্রত্যেক জাতির চরিত্র নীতির ভেতর এই প্রচেষ্টাই চলেছে—কারণ এটাই মানুষের প্রকৃতিগত প্রয়োজন। সমন্বয় বাণী সুদূরপ্রসারী এবং সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সমন্বয় বিজ্ঞান ও ধর্মে, যোগ সাধনায়, রুচি বৈচিত্র্যে, চারুকলা সাহিত্যে এমন কি রাজনীতি ক্ষেত্রে হতে পারে। আপাততঃ বিরোধী বিজ্ঞান ও ধর্মে সমন্বয় হ'লে হবে জগতের প্রকৃত মানবতার বিকাশ; চারিযোগের সমন্বয়ে আসবে মানব চরিত্রের পূর্ণবিকাশ; বিভিন্ন জাতির রুচি বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে হবে

সংস্কৃতির উন্মেষ; বিভিন্ন দেশের সাহিত্য চারুকলার সমন্বয়ে আসবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা; আর রাজনৈতিক সমন্বয়ে আসবে সকল দেশের শান্তিতে সহাবস্থান। এইরূপে সমন্বয় বার্তা সমধিক সুদূর প্রসারী। আসল কথা, সমন্বয়ের বড় অংশ পরম সহিষ্ণুতাও গ্রহিষ্ণুতা। এতে সর্বধর্মের সমন্বয়টি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। এটি অন্যান্য সমন্বয়ের উৎসমূল। এটি না হলে অন্যগুলি আসা দুষ্কর।

(চার)

স্বামীজী একবার দুঃখ করে বলেছিলেন, এই উৎকৃষ্ট সমন্বয় জ্ঞান চার হাজার বছর পূর্বে আবিস্কৃত হয়েছে; কিন্তু এটি অল্প কয়েক জনের অধিকারে এসেছে। এখনও এটি জাতীয় সম্পত্তি রূপে পরিগণিত হতে পারে নি।

এই সমন্বয় জ্ঞান জনগণ জীবনে কার্যকরী করতে হলে একমাত্র উপায় শিক্ষা। শিক্ষা মানে ত ছাত্রদের মধ্যে কেবল কয়েকটি তথ্য বা বিষয়বস্তু পরিবেশন করা, অথবা পরীক্ষা পাশের যান্ত্রিক ব্যবস্থা, তা ত নয়; যা জানলাম. যা শিখলাম তাকে সংস্কারে পরিণত করাই শিক্ষা যা মজ্জগত হয়, সংস্কারগত হয় জীবনের সঙ্গে মিশে যায় তাই যথার্থ শিক্ষা. বলছেন স্বামীজী।

শিক্ষাকে কার্যকরী করার জন্য প্রাচীন ভারতের পন্থা ছিল : শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। কোন একটি বিষয়বস্তু কেবল শোনাকেই 'শ্রবণ' বলে না; তাকে অবধারণ করতে হয়। সেজন্য প্রয়োজন অধ্যয়ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে হবে অধ্যাপনা। স্বাধ্যায় প্রবচনেন চ—উপনিষদের কথা। তবে ত হবে শ্রবণের স্বার্থকতা। শ্রবণের পর মনন। 'মনন' অর্থে বিষয় বস্তুকে অনবরত চিন্তন—যাতে করে ভাবটি 'সংস্কারগত' 'মজ্জাগত' বা 'ধমনীগত' হয়। তারপর নিদিধ্যাসন; এটি অনেক কঠিন ও দূরের কথা। এর অর্থ অবিচ্ছেদী ধ্যান।

শিক্ষার এই যে প্রাচীন ভারতীয় পন্থা, তারই মূল সূত্র ধরে আধুনিক সময়োপযোগী করে নিয়ে শিক্ষার নতুন পন্থা আবিষ্কার করার প্রয়োজন এসেছে। স্বামীজীর নিকট থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি ইঙ্গিত পাই। চেতনার জাগরণ আত্মবিশ্বাসের দ্বারা, পরস্পরের প্রতি প্রেমানুভূতি ও আত্মানুভব বা একত্বভাব স্বধর্ম নিষ্ঠা এবং মনের একাগ্রতা ছাত্রদের মধ্যে এই গুনগুলির অনুশীলন হ'লে 'শ্রবণ' 'মনন' ও 'নিদিধ্যাসন' এর কিছুটা ফল হতে পারে।

একটি কার্যকরী প্রস্তাব : আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে স্বামীজী সর্বধর্ম সমন্বয় বাণী জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করেছেন। তারপর এই বিষয়ে কত বক্তৃতা হয়েছে, কত প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, কত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—তার যে সুফল একেবারে হয়নি তা বলিনা, তবে আশানুরূপ কিছুই হয়নি। ভারতে ধর্মের কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি বেশ বিস্তারিত ভাবে দেখা দিচ্ছে। তাছাড়া সর্বধর্ম সমন্বয়ের পবিত্র ও শুদ্ধ ভাবটিকে "সেকুলারিজম্" এর নামে এবং আধুনিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে অত্যন্ত বিকৃত ও কলুষিত হয়ে পড়ছে। তার জন্য যে কত বিরোধ, কত অশান্তি কত রক্তপাত, কত মিথ্যা প্রবঞ্চনা—তার আর ইয়ত্তা নেই।

এক্ষেত্রে আর সময় ব্যয় না করে স্বামীজীর শতবর্ষপূর্তির বৎসরে একটি যোজনা নেওয়া যেতে পারে। ভারতের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বিষয় একটি পাঠ্যসূচি আরম্ভ করতে হবে। এই পাঠ্যসূচিতে থাকবে প্রধান প্রধান ধর্মের চর্চা। ১) বৈদিক ধর্ম বা সনাতন ধর্ম এবং তার শাখাগুলি যেমন, বৈষ্ণব, শাক্ত শৈব গণপত্য শিখধর্ম, ২) বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ৩) পার্শী ধর্ম—জরাথুষ্ট্র ৪) খৃষ্টধর্ম ও ৫) ইসলাম ধর্ম। লক্ষণীয় এই সকল ধর্মের একটিই মূল উদ্দেশ্য: মানব চেতনার উন্নয়ন ও নৈতিক ব্যবহারিক জীবন। এটাই হবে পাঠক্রমের মূল শিক্ষা। উদ্দেশ্য হবে: সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই জ্ঞানের চর্চা এবং শুদ্ধ আধ্যাত্মিক শক্তিকে জীবনের সর্বস্তরে প্রবাহিত করা। বহিরঙ্গ ধর্ম, যথা আচার. পূজা মন্দির মসজিদ গির্জায় যাওয়া ধর্ম মিছিল বার করা এই সকল আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা যেতে পারে, কারণ ধর্মের সর্বাংশ নিয়েই ত ধর্ম। কিন্তু মনে রাখা হবে এগুলি গৌণ মাত্র, মুখ্য নয়। সেজন্য পাঠক্রমে প্রতি ধর্মের গৌণ অংশকে বাদ দিয়ে মুখ্য অংশকেই গ্রহণ করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে: হিন্দু সনাতন ধর্ম বলে, একমেবাদ্বিতীয়ম্; ইস্‌লাম বলে, লা-ইলাহা-ইল্লাল্লা—এক আল্লা (ঈশ্বর) ছাড়া কেই নেই; বাইবেল বলে, 'আমি ও আমার স্বর্গীয় পিতা এক"। এই সকল বাক্যের মধ্যে ত একই সুর বাজছে—সেই ঐক্যের সুর। এই রূপ ঐক্যভাব শিক্ষা দেওয়া হবে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির মাধ্যমে। এছাড়া, পাঠ্যসূচিতে থাকবে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী এবং তাঁদের সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণীগুলি।

উল্লিখিত পাঠ্যসূচি দিনের পর দিন একাগ্রতার সহিত অধ্যয়ন করলে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাব ছাত্রদের কোমল মনে শুভ সংস্কারের উন্মেষ হতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে চেতনার জাগরণের সম্ভাবনা আছে। এই ছাত্রগুলির মধ্যে দু'একজন হয়ত ভবিষ্যতে সমাজের নেতা হবে। তারাই আজকের দিনের বিবাদ বিরোধ ও সংঘর্ষময় পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৩৭ সালে অল ইণ্ডিয়া নেশনাল্ এডুকেশন কনফারেন্স জাকির হুসেন কমিটি গঠন করেছিল; তাতে মহাত্মা গান্ধী হয়েছিলেন অধ্যক্ষ। এই কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের জন্য একটি সুপারিশ করেছিল, যাতে ইতিহাস সিভিক্স প্রভৃতি বিষয়ের পাঠক্রমের সঙ্গে ছিল সকল ধর্মের সারমর্মের শিক্ষা দেওয়া এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পরস্পর শ্রদ্ধার ভাব জাগান। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটি কার্যকরী হয়েছে বলে জানা নেই।

আজকের শিকাগো ধর্মমহাসভার শতবর্ষ পূর্তির বছরে ভারতীয় জীবনের 'মূলমন্ত্র' এই ধর্ম সমন্বয় বাণীকে কার্যে পরিণত করা প্রচেষ্টাই হবে না কি স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন?

লেখক হওয়ার ঝক্কি

হরি গোপাল চৌধুরী

কবিতা গল্প প্রবন্ধ—সাহিত্যের নানা শাখায় শাখামৃগের মত কিছুকাল লাফালাফি করে এখন ক্লান্ত বোধ করছি। ফল যা পেয়েছি—সাদাকথায় তাকে বলে অখণ্ডিন্ন। কিন্তু এ শর্ম্মা সহজে দমবার পাত্র নই। গলাধাক্কা খেয়ে খেয়ে গলায় ব্যথা ধরেছে—সে কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু মাথাটা আস্তই আছে এবং পুরোদমে আজো কাজ করছে। সুতরাং মাথা খাটিয়ে নতুন কোন উপায়ের সন্ধানে লাগ্‌লাম। চেষ্টা ত করতেই হবে। একবার না পারিলে—দেখ শতবার। লেখক হতে গেলে কিছু ত লিখতেই হবে। কিছুই না লিখে লেখক হওয়া আদৌ সম্ভব কি? ঘুষের জোরে অথবা খুঁটীর জোরে পরীক্ষায় পাশ করা যায়—চাকুরী পাওয়া যায়—পূজা কমিটির সভাপতি হওয়া যায়—সম্বর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি হওয়া যায়—শুনেছি, মন্ত্রী পর্যন্ত হওয়া যায়। কিন্তু লেখক হওয়া—কিছুই না লিখে? কিছু না লিখে কেউ লেখক হয়েছেন—এমন ত শুনিনি। তাই সমস্যাটা অত্যন্ত জটিল। যেমন তেমন একটা কিছু লিখ্‌তেই হবে। সরস কিংবা নীরস। তিক্ত অথবা স্বাদু। আলাপ কিংবা প্রলাপ। তারপর মামার জোর আর টাকার জোর থাকলে সমালোচক আর সাহিত্য গবেষকরা হাসতে হাসতে লিখে দেবেন—"বাংলা সাহিত্যের দিগন্তে নতুন সূর্যের উদয় হয়েছে। সাহিত্যরস পিপাসুদের পক্ষে এক আশা ও আশ্বাসের বার্ত্তা বহন করে এনেছেন এ যুগের নব-ভগীরথ—অমুক চন্দ্র শর্মা। তাঁর সানন্দ আবির্ভাবকে আমরা সাদর অভ্যর্থনা করি।" আর কি চায়। এবার রবীন্দ্র পুরস্কার পর্যন্ত ধাওয়া করা যায়। সর্ত্ত হচ্ছে কিছু লিখতে হবে। না লিখে লেখক হওয়া—বোবার গজল গাওয়ার মতই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অতএব আদা জল খেয়ে কাজে লেগে গেলাম।

অনেক যত্নে একটি ছোট কবিতা খাড়া করলাম। যদি কোন মতে উৎরে যায়। শিবব্রত পুরকায়স্থ স্থানীয় সাহিত্য সংস্থার সভাপতি। তাঁকে ধরে পড়লাম। —"একবার পড়ে দেখুন পুরকায়স্থ বাবু, চলবে কিনা বলুন।" আশা আর আশংকায় বুকটা আমার ধুক্‌পুক্ করতে লাগল। পুরকায়স্থ বাবু কায়স্থ না ব্রাহ্মণ—আমি জানি না। একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন—আমরা পুরোকায়স্থ। তা পুরকায়স্থ বাবুর মনে দয়া-মায়া আছে। আমাকে সম্পূর্ণ ধরাশায়ী না করে হেসে বল্লেন—"তা এক রকম হয়েছে। তবে কাগজে প্রকাশ করার মত নয়। আরও একটু সময় নেবে। শুধু অন্ত্যমিল হলেই কবিতা হল না। কবিতার একটা সংহত অথচ গভীর অর্থ থাকা চাই। যাকে বলে কবিতার দর্শন।" আমি অবশ্য দূরদর্শন ছাড়া আর কোন দর্শনের খবর রাখি

না। পুরকায়স্থবাবু তারপর কী ভেবে বল্লেন—"আপনি বরং ছড়াটরা লেখার চেষ্টা করুন। কবিতা আপনার লাইন নয়।" আমার কবিতাটি একেবারেই পাতে দেবার মত নয়? আমি লিখেছিলাম—

হাতে পায়ে ধরে সাধা / পিঠে আছে কুলো বাঁধা
তুমি আধা আমি আধা / দুটি টাকা দিন চাঁদা

অর্থ এরও একটা আছে। কিন্তু দর্শনের ধর্ষণে কবিতাটি মারা গেল। আমাদের পাড়ার অরণ্য রুদ্র (ছদ্মনাম) খুব কঠিন কঠিন কবিতা লেখেন। পুরকায়স্থ বাবুকে জানালাম—কবিতাটি একবার তাঁকে পড়াব নাকি। পুরকায়স্থবাবু পায়ের কাছে সাপ দেখার মত আঁতকে উঠ্‌লেন। —"না, না, এত ব্যস্ত হবেন না। লেখক হতে গেলে—অসীম ধৈর্য চাই। এখুনি তাঁর কাছে যাওয়া অরণ্যে রোদন হয়ে দাঁড়াবে।" আমি নির্বোধ নই। মনে মনে বল্লাম—আমাকে এভাবে বেশীদিন দাবিয়ে রাখা যাবে না। লেখক আমাকে হতেই হবে। কিন্তু লিখ্‌ব ভাবলেই লেখা যায় না। পা থাকলেই চলা যায়। কিন্তু হাত থাকলেই লেখা যায় না। তার জন্য মাথা চাই। মাথা আমারও আছে। সেটা যে একদম ফাঁপা—এ আমি বিশ্বাস করি না।

অগত্যা ভাব্‌লাম—হাসির কিছু লেখার চেষ্টা করি। আমার মনে হাজারো দুঃখ। আমি হাসির কিছু লিখব কেমন করে? শেষ পর্যন্ত পাঠকের কাছে হাসির পাত্র হয়ে না দাঁড়াই! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ থেকে পাড়ার জগন্নাথ পর্যন্ত হাসির লেখা লিখে বিস্তর নাম-যশ কামিয়েছে। আমি অনাথ হয়ে হাত গুটিয়ে থাকব—তা হয় না। চেষ্টা করতে ক্ষতি কি।

সুদর্শন মজুমদার যেমন বিদ্বান তেমনি নিরহংকার। তাঁকে ধরলাম—আমি রঙ্গ ব্যঙ্গ হাসি তামাসা নিয়ে কিছু লিখতে চাই। আপনি সাহায্য করুন। মজুমদার বাবু খুসী হলেন। বল্লেন—"সাহিত্যে ব্যঙ্গ কয়েক প্রকার। fun, satire, humour wite." ভূমিকা শুনে আমার চক্ষুস্থির। আমি তামাসা নিয়ে লিখ্‌ব। এখন দেখ্‌ছি তামাশা হবার উপক্রম। উলু বনে মুক্তো ছড়ালে কুড়োবার লোক কোথায়। পণ্ডিত লোকদের এই এক্ দোষ। এঁরা সবাইকে অল্পবিস্তর পণ্ডিত মনে করেন। আমার কাছে জ্ঞান ভাণ্ডারের দরোজাটি খোলার অর্থ হচ্ছে—আমাকে নেকড়ের মুখে ঠেলে দেওয়া। যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। বল্লাম—মজুমদার বাবু আমি আজ যাই।

এখন কোথায় যাওয়া যায়। আমার কথা হচ্ছে—যেখানে যতটুকু পাওয়া যায়—ঝুলিতে ভরে নাও, কিছুই যাবে না ফেলা। অথচ এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে—সবই ফেলে দেওয়ার মত। কাছেই অরুণের বাড়ী। সেখানে হাজির হলাম। অরুণ রথীনের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। আমিও ভিড়ে গেলাম। হঠাৎ অরুণ রথীনকে বলল—"তোর পদবী বল।" রথীন বলল—"তার মানে? আমার পদবী তুই জানিস্ না?" অরুণ বলল—"জানি—তবু তুই বল্ না"। রথীন বলল—"কুণ্ডু"। অমনি অরুণ বলে উঠ্‌ল—"খাই তোর মুণ্ডু"। অরুণ হো হো করে হাস্‌তে লাগল্। রথীন চুপ করেই আছে। তারপর বলল—"তোর পদবী বল"। অরুণ বলল—'সুবিধে হবে না, বন্দ্যোপাধ্যায়।"

রথীন দমবার পাত্র নয়। বলল—"তোর পেছনে খেজুর গাছ।" অরুণ বলল—"কৈ, মিলল না ত?" রথীনের তাৎক্ষণিক জবাব—'না মিলল ত না মিলল—তোর পেছনটা ত বিরল।" অরুণ এবার বোকা বনে গেল। আমি বললাম—'রথীন পায়ের ধুলো দে মাইরী, তোর মাথা আছে। একদিন তোর কাছে যাব।" আমি সেখান থেকে উঠলাম।

পাড়াতে একটি মাত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের হয়। তার সম্পাদনা করেন সুকোমলদা। মানুষটা নামের বিপরীত। অর্থাৎ স্পষ্টবাদী এবং দৃঢ়চেতা। ভাবলাম তাঁর কাছে যাওয়া যাক্। এ পর্যন্ত তাঁকে তেল যতেষ্ট দিয়েছি। অম্লান বদনে তিনি তা গ্রহণও করেছেন। কিন্তু বারে বারেই একটিই সান্ত্বনাবাক্য শুনিয়েছেন—"হবে, হবে। ব্যস্ত হবেন না।" তাই তাঁর কাছে যেতে একটু ভয় হয়। কিন্তু লেখক হতে গেলে ভয়কে জয় করতে হবে। সুকোমলদা নিজে খুব ভাল লেখেন—সবাই বলে। তা বলে মনে একটুও কি দয়ামায়া থাকতে নেই? একবার তাঁর কাছে একটা কাগজের জন্য লেখা চাইতে গিয়েছিলাম, তিনি তিন দিন পরে যেতে বলে দিলেন। তিনদিন পরে গেলে বললেন—"লেখা তৈরী হয়নি। গত দুদিন মাথাটা একটুও নাড়াতে পারছি না—এমনি শরীরের অবস্থা।" আমি বললাম—"সুকোমলদা, মাথাটা না নাড়িয়েও ত লেখাটা তৈরী করা যেত। লিখতে গেলে লেখবার হাতটটি নাড়ানো জরুরী বটে॥" আমার কথা শুনে সুকোমলদা আমার মুখের দিকে ঝাড়া দুমিনিট তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন—এসব তোমার মাথায় ঢুকবে না। যেদিন ঢুকবে—সেদিন তুমিও লেখক হতে পারবে। ভাবলাম—সুকোমলদার কাছে আজ আর গিয়ে কাজ নেই। হয়ত বলবেন—লেখক হবার চেষ্টা ছেড়ে কাপড়ের ব্যবসা করুন।

বন্দনা বসু—আমাদের সবার দিদি। ভাল গল্প লেখেন। জামাইবাবু সমরেন্দ্র বসু কলেজের অধ্যাপক। দিদির লেখার খুব সুখ্যাতি। দিদির কাছে আমার ইচ্ছেটা প্রকাশ করলাম। দিদি বল্লেন—আমি ত শুধু গল্পই লিখি। লেখক হতে হলে আপনার দাদার সঙ্গে কথা বলুন। আমি এ পর্যন্ত যা লিখেছি—তাতে আপনার দাদার অবদান কিছু কম নয়। বল্লাম—দিদি, আপনার এবারের গল্পটি আমার খুব ভাল লেগেছে। 'আলো নেই'—নামটা চমৎকার। এবারে একটি গল্প লিখুন—'মানুষ নেই।' দাদা হেসে বল্লেন—মানুষের ভারে পৃথিবী ভারাক্রান্ত। অভাব মনুষ্যত্বের। দিদি বল্লেন—এটা কেমন কথা হল? হীরে আছে—তার দ্যুতি নেই? সে ত নকল হীরে। বল্লাম—"দিদি আপনি ঠিক বলেছেন।" দাদা বল্লেন—আপনি হাসির গল্প লিখতে চান। এসব তত্ত্ব কথায় মোটেই কান দেবেন না। তাহলে লেখাটাই মারা যাবে। একটা গল্প বলি, শুনুন্। —"আজ থেকে পনের বছর আগের কথা। আমি স্কুলের ছাত্র তখন। একদিন আমরা ৭/৮ জন বন্ধু আড্ডা মারছি। একজন বল্ল—যে সব সেরা গুল মারতে পারবে—সে দশ টাকা পুরস্কার পাবে। যে পুরস্কার পেল—তার গল্পটা তারই জবানীতে শুনিয়ে দিই। —'গুল নয় ভাই, একটি সত্য ঘটনা বলছি। আমাদের গ্রামে প্রকাণ্ড একটা দিঘি আছে। সেই দিঘিতে একদিন প্রকাণ্ড

একটা মাছ উঠল জালে। মাছ যে এত বড় হতে পারে—তোরা কল্পনাও করতে পারবি না। মাছটার ওজন কত হবে? ঐ অজপাড়াগাঁ-তে অতবড় মাছ ওজন করার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। অভিজ্ঞ লোকেদের ধারণা—কম করেও দেড়শ কিলো ত হবেই। মাছের গায়ের এক একটা আঁশের সাইজ থালার মত। মাছটাকে গরুর গাড়ী করে শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। পাঠাবার আগে আমার ছোট মামা তাঁর বিদেশী ক্যামেরাতে একটা ছবি তুলে নিলেন। মাছটার ওজন আর জানা যায়নি। মামা যে ছবিটা তুলেছিলেন—তার ওজন এগার কিলো। যখন দেশ ভাগ হল—তাড়াহুড়ো করে আমরা পশ্চিমবঙ্গে এসে গেলাম। ছবিটা দেশের বাড়ীতেই পড়ে আছে। দিদি টিপ্পনী কাট্‌লেন—পুরস্কারের টাকাটা বোধ হয় তুমিই পেয়েছিলে। দাদা হাসতে লাগ্‌লেন। আমি বললাম—দাদা, আমি উঠ্‌লাম।

আর একজনের কথা বলে আমার পরিক্রমার সমাপ্তি টান্‌ব। এই তরুণ লেখকটির নাম—সদানন্দ নস্কর। তাঁর কাছে গেলে আমার অবস্থা হয় তস্করের মত। তিনি ভাল লেখেন। আমি লিখতে পারি না। দেখা হতেই সদানন্দ বল্লেন—"কি দাদা, আপনার লেখা কেমন চলছে?" এই প্রশ্নে আমি যথেষ্ট পুলকিতবোধ করলাম। তাঁর প্রশ্নের মধ্যেই আমি যে লেখক সেই ইঙ্গিত ছিল বলে। বললাম—"কী লিখব, কী নিয়ে লিখব—সেটাই হয়েছে সমস্যা।" সদানন্দ বললেন—"দূর, দূর—এটা আবার সমস্যা নাকি? যা ইচ্ছে তাই নিয়ে লিখুন। মোটকথা লিখুন। লিখতে লিখতেই লেখক হওয়া যায়।" বললাম—"কি নিয়ে লিখি, বলুন ত।" বললেন—"যা ইচ্ছে-তা-ই নিয়ে লিখুন। লেখার সুবিধা নিয়ে লিখুন—লেখার অসুবিধা নিয়ে লিখুন। যদি লিখতে ইচ্ছে করে—যদি লিখ্‌তে ইচ্ছে না করে—তা-ই নিয়ে লিখুন। Be Practical. আজকের দিনে এমন লেখার উপযোগীতা অনেক বেশী। লেখা মানে প্রেমের গল্প নয়—লেখা মানে জীবনের ভাষ্য। কেবল পাওয়াটাই জীবনের গল্প নয়—হারানোটা আরো মহত্তর গল্প। আমার কথাটি বিশ্বাস করে লিখ্‌তে আরম্ভ করুন। লেখা শেষ না করে থাম্‌বে না কিছুতেই।"

সদানন্দের কথামত ঘরে ফিরেই লিখতে বসেছি। আপনারা পড়ুন কিংবা না পড়ুন—সে দায় সদানন্দের। মনে মনে আওড়ালাম—জয়, সদানন্দের জয়।

ল্যান্সডাউন মার্কেটের বিখ্যাত মৎস্য ব্যবসায়ী
৺মধুসূদন রায়ের পুত্র
শ্রীকমলকান্ত রায়
বিবাহ অথবা উৎসবে কিংবা নিত্য প্রয়োজনে সকল
রকম মৎস ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করা হয়।
যোগাযোগ করুন:
মৎস্য পট্টির ১নং ষ্টল, ল্যান্সডাউন মার্কেট।

লোকমাতা রাণীরাসমণি ও ভারতের নবজাগরণ

ডঃ সুধীর বেরা

ইতিহাস কখনও কখনও কিংবদন্তী হয়ে যায়। লোকমাতা রাণীরাসমণি সেইরকম একটি ব্যক্তিত্ব বা ইতিহাস থেকে কিংবান্তীতে পরিণত হয়েছে। তার বুদ্ধিমত্তা, মাতৃস্নেহ, ভগবৎভক্তি, বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি জাতীয়তাবোধ এবং সর্বোপরি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য অপার স্নেহ মমতা শুধু এদেশের নয় সর্বদেশের সর্বকালের একটি সুমহান ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে যুগাবতার রামকৃষ্ণ প্রকট হয়েছিলেন। তারই ধ্যান মানসে প্রথম রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে ভারতের সনাতন ধর্মের তথা সার্বিক জাগরণের শুরু তার উৎসমূলে ছিলেন লোকমাতা রাণী রাসমণি। ভগিনী নিবেদিতা যথার্থই বলেছিলেন : "রাসমণি না থাকিলে গদাধর গদাধরই থাকিতেন। রামকৃষ্ণ হইতেন না। রামকৃষ্ণ না থাকিলে নরেন্দ্র নরেন্দ্রই থাকিতেন, বিবেকানন্দ হইতেন না। বিবেকানন্দ না থাকিলে ভারতবর্ষের নবজাগরণ সম্ভব হইত না"।

১৭৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগণার হালিশহরে এক দরিদ্র চাষীর গৃহে রাণী রাসমণির জন্ম হয়। তার ডাকনাম ছিল 'রাণী।' মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। এবং তিনি প্রকৃত অর্থে 'রাণী' হন। তৎকালীন জানবাজার এষ্টেটের অভাব প্রতিপত্তি ও আর্থিক সম্মতি ছিল অতুলনীয়। রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাণী রাসমণির উপরেই জানবাজারের সেই বিশাল জমিদারী দেখা শোনার ভার পড়ে। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এই জানবাজার এষ্টেটের ম্যানেজারের পদপার্থী হয়ে দরখাস্ত করেন। এমনই ছিল তার জানবাজার এষ্টেটের নামডাক ও আর্থিক প্রাচুর্য। রাণী সেই প্রচুর ভু-সম্পত্তি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণই শুধু করেন নি, তার পরিচালনায় তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রাণী রাসমণি লেখাপড়া শেখেন নি, কিন্তু তাঁর যে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা ছিল তার প্রমাণ তিনি প্রতি পদে পদে দিয়ে গেছেন।

তাকে নিয়ে বাঙলা তথা ভারতের ঘরে ঘরে বহু সত্য ঘটনাবলীর কথা প্রচলিত আছে। এগুলির মধ্যে যেমন তার চারিত্রিক দৃঢ়তা, দেশপ্রেম, ধর্মীয় উদারতা এবং সর্বোপরি দরিদ্র অনাথ আতুরের প্রতি অপরিসীম করুণা প্রকাশ পায়, তেমনি তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ঘটনা আন্দাজ করার অসাধারণ ক্ষমতারও পরিচয় মেলে।

রাণী রাসমণি যখন জন্মগ্রহণ করেন সে ছিল এক যুগ। তখন সবে ১৭৫৭ খ্রীঃ মোগল সাম্রাজ্যের শেষ হয়েছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূচনা। ব্রিটিশ শাসন তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি।

দেশে আইন শৃঙ্খলার কোন বালাই ছিল না। ডাঙ্গায় ঠগ্-মগ্ বর্গীদের অত্যাচার, জলে দিনেমার বোম্বেটেদের। সারা দেশ অরাজকতায় ভরে ছিল, অর্থনীতির কোন বাবা-মা ছিল না। সনাতন ধর্ম্ম তার মহান আদর্শগুলি মর্মান্তিক কুসংস্কার ও নিষ্ঠুরতায় পর্যবসিত ছিল। নরবলি, সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, বহু বিবাহ প্রভৃতি অমানুষিক নৃশংস কুসংস্কারে জাতির বিবেক সমাচ্ছন্ন ছিল। জাতির না ছিল নিজের ওপর আস্থা, না ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতি ইতিহাসের ওপর বিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসহীন মুখতায় জাতি পথ হারিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে মরছিল।

রামমোহনের আবির্ভাবে সবে তখন ভোরের সূচনা হয়েছে। বিদ্যাসাগর তখনও আসেননি। রাণী রাসমণি রামমোহনের থেকে প্রায় কুড়ি বছরের ছোট এবং বিদ্যাসাগরের থেকে প্রায় সাতাশ বছরের বড়ো ছিলেন। সেই অন্ধকারময় যুগে তথাকথিত অশিক্ষিত, অতি সাধারণ দারিদ্র পরিবারের কন্যা পরবর্তী কালে, রাণী রাসমণি হয়ে দেশ-জাতি তথা ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা যেমনি গর্বের, তেমনি গৌরবের। তা শুধু ঐতিহাসিকই ছিল না, তা আগামী দিনের ইতিহাস রচনার পথ প্রশস্থ করেছিল। ভারতের ধর্মের এবং সনাতন ধর্মের তথা সার্বিক জাগরণের যে সূত্রপাত বিংশশতাব্দীর শেষভাগে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল তারই সূচনা করেছিলেন রাণী রাসমণি।

রামমোহন বৈদান্তিক ধর্মের পুর্ণজাগরণ আনতে চেষ্টা করে আত্মবিস্মৃত, বিভ্রান্ত জাতির জীবনে যে উষালগ্নের সূচনা করেছিলেন, তন্মধ্যে যুক্তিবাদের ও ধর্মীয় গোড়ামীর থেকে মুক্তির ইঙ্গিত থাকলেও তা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনকে তেমনভাবে আলোড়িত করতে পারেনি। রামমোহনের বৈদান্তিক অবদান এবং ধর্মীয় যুক্তিবাদকে অবলম্বন করে যে ব্রাহ্ম ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল যা পাশ্চাত্য ধর্ম ও সভ্যতা সংস্কৃতির উপরের জৌলুষ ও চাকচিক্যে বিভ্রান্ত দেশবাসীকে অনেকটা আত্মস্থ করে তাদের দলে দলে ক্রীশ্চান হয়ে যাওয়া বন্ধ করলেও ভারতের সনাতন ধর্ম তথা জাতীয় জীবনের ওপর তা তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। পরবর্তীকালে ব্রহ্মধর্ম মুষ্টিমেয় প্রভাব প্রতিপত্তিশালী অভিজাতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং ব্রহ্মদের তথাকথিত হিন্দু বিরোধিতার জন্য হিন্দুরাও ব্রহ্ম বিরোধী হয়ে ওঠে এবং ব্রহ্ম ধর্ম সনাতন ধর্মীয়দের প্রভাবিত করতে পরিপূর্ণ ব্যর্থ হয়ে। ব্রহ্মধর্ম এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা, ধর্মে ও জীবনে যুক্তিবাদ, এবং আশ্রয় করে এদেশে ক্রীষ্টধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হলেও এবং জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এদের অনস্বীকার্য অবদান সত্বেও ব্রাহ্মধর্ম সনাতন ধর্মের তথা ভারতের সার্বিক পুর্ণরুত্থানের ক্ষেত্রে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করেই ভারতের সনাতন ধর্মের পুর্ণজাগরণ তথা জাতীয় জীবনে সার্বিক জাগরণের শুভ সূচনা হয়।

সেই ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কুসংস্কারের যুগে রাণী রাসমণি যে ধর্মীয় উদারতা দেখিয়ে গেছেন তা বিশ্বে নজীরহীন। গদাধর তখনও রামকৃষ্ণ হননি। নিয়মমাফিক পূজা পদ্ধতি না করে কখনও নিজেই ভোগ খেয়ে নিতেন। তাঁর এই আচরণ যে কোন নিষ্ঠাবান ধর্মভীরু লোকের কাছে আতঙ্কের কারণ হতে পারতো। বস্তুতঃ কোন ধর্মেই এই আচারহীনতা বা আচারের ব্যাভিচার সহ্য করা আগেও হোত না আজও হয়না। রাণী রাসমণির এস্টেটের লোকজন গদাধরের এই অশাস্ত্রীয় অনাচারে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর ছিল। অন্য যে কোন লোকের কাছে যে কোন অবস্থায় এরকম পুরোহিত বা পূজককে কখনই রাখা হোত না। রাসমণি সবকিছু শুনে নিজের চোখে তা দেখতে চাইলেন। তিনি দেখলেন যে যা শুনেছেন সবই সত্যি। তা সত্ত্বেও তিনি গদাধরের মধ্যে যে ভাবীকালের রামকৃষ্ণ আছেন তা উপলব্ধি করেই নির্দেশ দিলেন যে গদাধর যে ভাবে ইচ্ছা পূজো করতে পারবে। তাকে কেউ বাঁধা দিতে পারবে না। একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু মহিলা সেই যুগে যে এতটা উদার এবং মুক্তমনের অধিকারিণী হতে পারেন তা কল্পনা করা যায় না। আজও এই বিংশ শতাব্দীর শেষেও এ ধরনের ধর্মীয় উদার মানসিকতা দেখা যায় না।

তারই আশ্রয়ে তারই স্নেহছায়ায় লালিত পালিত গদাধর বর্দ্ধিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণে পরিণত হন। রাণী রাসমণি যদি আর কিছু না করতেন শুধু এই জন্যই চিরকালের জন্য ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন। ধর্মীয় উদারতা সহনশীলতার মুক্তমনের এবং আচার-হীনতার যে পথ তিনি দেখিয়েছিলেন সেই পথ ধরেই রামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয় বিশ্বে নোতুন আলো জ্বেলে দেয়।

শুধু রামকৃষ্ণই রাণী রাসমণি অবদান নয় তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জননী। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। তার আগে ও পরে ইংরেজদের দোর্দ্দণ্ড প্রভাব ছিল সীমা হীন। মুঘল রাজশক্তি ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বার বিধিলিপি হিসাবে ইংরেজ শাসন কায়েম হতে শুরু করে। তামাম ভারতবর্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার বা কথাবলার কোন যোগ্য ব্যক্তিই ছিল না। তাদের অমানুষিক অন্যায় ও নৃশংস অত্যাচার ও নির্যাতন দেশের লোক শুধু মেনেই নিত না. তারা উল্টে শোষক ও শাসক ইংরেজের তোষণ করে নিজেদের আখের গোছানোর কাজেই ব্যস্ত ছিল। দেশের বড় বড় জমিদার মহাজনেরা ইংরেজের কৃপাপার্থী ছাড়া কিছুই ছিল না। ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতাই তাদের সমৃদ্ধির কারণ ছিল। ইংরেজের চরমতম অন্যায়ের বিরুদ্ধে কড়ে আঙ্গুল তুলে প্রতিবাদ করার মত কেউ ছিল না।

সেই যুগে রাণী রাসমণি ইংরেজের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এতটুকু পিছপা হননি। এসব কাহিনী বাংলা তথা ভারতের ঘরে ঘরে চলে আসছে। ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীটের সেনা ছাউনি থেকে কিছু গোড়া সৈন্য একদিন রাণী রাসমণির বাড়ীতে কাজ করে এমন কটি মেয়েকে অপমানিত

করে। রাণীর কানে এই খবর পৌঁছানো মাত্র তিনি তাঁর পাইকদের পাঠিয়ে সেই গোড়া সৈন্যদের ধরে এনে বেধড়ক পিটিয়ে বেঁধে রাখেন। গোড়া মহলে হৈ চৈ পড়ে যায়। তখন সবেমাত্র ইংরেজ সিপাহী বিদ্রোহ দমন করছে। তাদের গরম তখন চরমে। দেশীয় এক জমিদারের তাও একজন মহিলার এই ধৃষ্টতা ইংরেজ কোন ক্রমেই বরদাস্ত করতে পারলো না। তার জানবাজার প্রাসাদ আক্রমণ করে এবং ভাঙচুর শুরু করে। রাসমণি তখন নিজের হাতে খড়্গ নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ইতিমধ্যে পুলিশ কমিশনার তার বিশাল পুলিশ বাহিনী এনে অবস্থা আয়ত্বে আনেন। রাণী সেদিন যে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং জাতীয়তাবাদের যে নজীর সৃষ্টি করেছিলেন তা এদেশ ও জাতির চিরকালের গৌরব ও গর্বের ইতিহাস।

তখন নীলকরদের অত্যাচারে দেশের কৃষকদের নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে' সেই 'নীল বাঁদরদের' নৃশংস অত্যাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। সারা বাংলাদেশ নীলকরের অত্যাচারে তখন উৎপীড়িত হলেও রাণী রাসমণির জমিদারির মধ্যে কোথাও নীলকর অত্যাচার হয়নি। এমনই ছিল তার দাপট। দিনাজপুরে তার জমিদারিতে একবার নীলকর অত্যাচার শুরু হলে রাসমণি তার পাইকদের দিয়ে পাঁচ-ছজন নীলকর সাহেবকে ধরে এনে জ্যান্ত পুঁতে দেন। এর পর ইংরেজ নীলকর সাহেবরা তার জমিদারিতে অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি করতে দুঃসাহসী হয়নি।

তখনকার দিনে ইংরেজের খুবই অর্থাভাব ছিল। সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতিতে তাদের রাজকোষ প্রায় শূণ্য হয়ে যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদির মাধ্যমে রাজকোষ পূর্ণ করতে চেষ্টা করতে তারা তেমনি সফল হয়নি তখন তারা সমুদ্র নদী ও বিলে মাছ ধরার উপর নোতুন করে কর বসায়। এ দেশের গরীব জেলেরা সমুদ্র, নদী ও বিলে মাছ ধরে বেঁচে থাকতো। এই নতুন করের ফলে তাদের মাছ ধরে বেঁচে থাকার পথ বন্ধ হয়ে যায়। তারা এসে কেঁদে কেটে তাদের রাণীমা-র কাছে দরবার করে। রাণী রাসমণি সব শুনে কর্মপন্থা ঠিক করে ফেললেন. মোটা টাকার বিনিময়ে তিনি গঙ্গা লীজ নিয়ে নিলেন। শিবপুর থেকে মেটিয়াবুরুজ এবং সালকিয়া থেকে আহিরীটোলা পর্যন্ত মোটা চেন দিয়ে গঙ্গার এপার ওপার বেঁধে দিলেন। ফলে বণিক রাজার জাহাজ আর গঙ্গা দিয়ে যাতায়াত করতে পারলো না। ইংরেজরা বিপন্ন বোধ করে রাণীকে ঐ শিকল উঠিয়ে নিতে অনুরোধ জানায়। রাণী তা অস্বীকার করে জানান যে তিনি মাছ ধরার জন্যই গঙ্গা লীজ নিয়েছেন। এবং জাহাজ চললে সেই মাছধরার সমূহ ক্ষতি হবে। কাজেই তিনি শিকল ওঠাতে অপারক। প্রয়োজনবোধে তারা কোর্টেও যেতে পারে। বিপন্ন ইংরেজ কোম্পানী তখন রাণীর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের রক্ষার্থে আবেদন জানাল। কোনদিন কোন নদী খাল বিলে দরিদ্র মৎসজীবিদের উপর ট্যাক্স বসানো চলবে না। এই শর্তে তিনি গঙ্গাকে মুক্ত করতে রাজী হলেন। সেই থেকে সমুদ্র ও নদীতে মাছ ধরার উপর কর ইংরেজ উঠিয়ে নিয়েছিল।

উপরোক্ত ঘটনাবলির মধ্যে রাণীর যে বুদ্ধিমত্তা ও সাহসীকতা এবং দরিদ্র জনসাধারণের জন্য তাঁর দরদ তা প্রকাশ পেয়েছিল যার তুলনা ভারত কেন পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসেই মেলে না।

দুর্গাপূজায় বাজনা সহযোগে শোভাযাত্রা যাবার একটা রীতি তখন ছিল। এতে ইংরেজদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় এই অজুহাতে তা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। দেশের একজনও তখন এর প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে নি। একমাত্র রাণী ছাড়া। ব্রিটিশের এই আস্পর্ধাকে তিনি আমাদের ধর্মীয় এবং সামাজিক ও সংস্কৃতিক জীবনের উপরে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন এবং প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেন। কয়েক হাজার ঢাক জোগাড় করে তিনি বিজয়ার শোভা-যাত্রার নির্দেশ দিলেন এবং নিজে পর্দা নসীন হয়েও সেই শোভাযাত্রার সামনে চললেন। তখনকার মতো শোভাযাত্রা বন্ধ করতে ইংরেজ সাহসী না হলেও তারা পরে রাণীর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করেন। রাণী তা দিতে অস্বীকার করেন। তাঁর সেই জরিমানার খবর ছড়িয়ে পড়ায় হাজারে হাজারে লোক এসে জমায়েত হতে লাগলো। রাণীর নির্দেশে এখন যা 'সুরেন ব্যানার্জী ও রাণী রাসমণি রোড' নামে পরিচিত তার দু পাশে শাল-বল্লগার বেড়া দেওয়া হয়। ফলে ইংরেজদের গাড়ি ওই রাস্তার এপার ওপারে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এ পাশে ফোর্ট উইলিয়াম এবং ইংরেজদের আবাস এবং ওপাশে লাটভবন ও রাইটার্স বিল্ডিং। এই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেশে প্রশাসন চালানো অসম্ভব বুঝে ইংরেজরা নতজানু হয়ে রাণীর জরিমানা মুকুব করে দিতে বাধ্য হয়। সেই যুগে তথাকথিত এক অশিক্ষিতা ভদ্রমহিলার কাছে এরকম বীরত্বপূর্ণ ও দুঃসাহসিক আচরণ ইতিহাসে চিরকালের নজীরহীন।

রাণী রাসমণির ধর্মশিক্ষা সংস্কৃতি মানবকল্যাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দানধ্যানের কোন সীমা ছিল না। হিন্দু কলেজ (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজ), ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (বর্তমানে ন্যাশানাল লাইব্রেরী) এশিয়াটিক সোসায়িটি, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর অকৃপণ দানে গড়ে ওঠে। বেলেঘাটা খাল, কালিঘাটের আদি গঙ্গার পুনখনন, কেওড়াতলা, নিমতলা, বাবুঘাট প্রভৃতি তাঁর অক্ষয় কৃতিত্বের কয়েকটি নিদর্শন মাত্র। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কথা আগেই বলা হয়েছে, ভারতীয় নবজাগরণের পিঠস্থান এই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা পূজার জন্য তিনি তাঁর বিস্তীর্ণ জমিদারী দান করে যান।

তাঁর অর্থনৈতিক দূরদৃষ্টিও অতুলনীয় ছিল। শুধু জানবাজারের জমিদারির দেখাশোনা করে তার রক্ষণাবেক্ষণ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিই তিনি করেননি, তিনি শেয়ার মার্কেটে বুদ্ধির জোরে ব্যবসা ও লেনদেন চালিয়ে প্রচুর অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা করেন। সীপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ কম্পানিগুলির শেয়ারের দাম ভীষণ পড়ে যায়। তিনি কারও কথা না শুনে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকায় সেই শেয়ার কিনে নেন। সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইংরেজ রাজত্বের ভিত সুপ্রতিষ্টিত হলে সেই শেয়ারের

দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। রাসমণি তখন নামমাত্র মূল্যে কেনা সেই শেয়ারগুলি বিক্রী করে দিয়ে অকল্পনীয় সম্পদের অধিকারিণী হন। তাঁর এই দূরদৃষ্টির তুলনা পাওয়া যে কোন দেশেই দুষ্কর।

কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিতান্তই অনাড়ম্বর সাত্বিক জীবন যাপন করতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ভূমিশয্যায় শয়ন করতেন। দিনে একবার হবিষ্যান্ন গ্রহণ করতেন। নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে পূজা আচার করতেন। পারিবারিক দোল দুর্গোৎসব অনুষ্ঠানের যথাযথ ব্যবস্থা করতেন। প্রসঙ্গতঃ জানবাজারের জমিদারেরা বিষ্ণুভক্ত হলেও সেখানে কালীপূজা বা দুর্গাপূজার কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। তারা সমান উৎসাহের সঙ্গে সব উৎসবই পালন করতেন।

রাণী রাসমণির দয়া ও করুণায় কতো অনাথ যে আশ্রয় লাভ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। বিদ্যাসাগর প্রচলিত বিধবা বিবাহে উৎসাহ দিয়ে তিনি বহু অর্থ দান করে গেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয়, শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব প্রমুখরা যখন বিদ্যাসাগর প্রচলিত বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধাচারণ করেন তখন রাণী রাসমণি বিধবা বিবাহের সমর্থনে আর্থিক সাহায্য দানে এগিয়ে আসেন। এও তার প্রগতিশীল মানসিকতার এক অনবদ্য উদাহরণ।

যুগবতার রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের উৎস খুঁজতে খুঁজতে লোকমাতা রাণী রাসমণিতে পৌঁছাতে হয়। দৃপ্ততেজ, দেশপ্রেম, ধর্মীয় উদরতা, মানবকল্যাণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে লোকমাতা রাণী রাসমণির তুলনা রাণী রাসমণি। এমন জ্বলন্ত ব্যক্তিত্ব এমন অন্তর্দৃষ্টি, এমন তীক্ষ্ণধী, এমন কঠোর ও কুসুম কোমল প্রাণ শুধু এদেশে নয় সবদেশে সবকালে তুলনাহীন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে ভারতের যে সঠিক নবজাগরণ—তিনি আক্ষরিক অর্থে তার উৎসমূলে। প্রকৃতপক্ষে লোকমাতা রাণী রাসমণি ভারতীয় নবজাগরণের জননী (Mother of India Renaissance)।

নব নীড় (বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আবাস)

৩০, অশোক এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০৪০

ও

১/২ শ্যাম বোস রোড, চেতলা, কলিকাতা-২৭

কেবলমাত্র বৃদ্ধা মহিলাদের জন্যে, স্বল্পব্যয়ে সর্ববিধ সুবিধাসহ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

পরিচালনায় :—উইমেনস্ কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিল

৫/১, রেডক্রস্ প্লেস, কলিকাতা-৭০০০০১

স্মৃতি-বিস্মৃতি

বেদুইন

উদ্দেশ্যটা ছিল গঙ্গাস্নান। স্নান সেরে হোটেলে সকালের খাওয়া মিটিয়ে যাব সারনাথ পরিদর্শনে। সবেমাত্র দাশশ্বমেধ ঘটের প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েছি এমন সময় পথ অবরোধ করে দাঁড়াল একটি মহিলা। বলতে গেলে চমকে গিয়েছিলাম। মহিলাটিকে ভাল করে দেখেও চিনতে পারলাম না। সুঠাম দেহ, পঞ্চাশোর্ধ, বয়সকালে যে সুন্দরী ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কাশীতে নানা ফন্দীবাজ ঘোরাফেরা করে, বিশেষ করে কিছু কিছু মহিলা আছে যারা অসৎভাবে অর্থোপার্জনের ধান্দাও খোঁজে। শেষে এই রকমের কোন মহিলার পাল্লায় পড়লাম না তো! আমাকে কেমন অজানিত আতঙ্ক আচ্ছন্ন করল। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বিলম্ব হয়নি কিন্তু সহজ হতে পারছিলাম না।

ঘোর কাটলেও বিস্ময় ঘনীভূত হল যখন মহিলাটি বলল, আপনি কি কানাই ?

অপরের মুখে নিজের নামটা শুনে হতবাক্ হয়ে গেলাম। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মহিলাটি বুঝতে পেরে বললেন, আমার বোধহয় ভুল হয়েছে। অনেকের চেহারা একই ধাঁচের হয় সেজন্য ভুল হয়েছে। মাপ করবেন।

বললাম, ভুল হয়নি। কিন্তু আমি কানাই ঠিকই তবে আপনি নামটা জানলেন কি করে ?

মহিলা হেসে বললেন, আমি যে পুতুল। এবার চিনতে পারলে কি ? ছোটবেলার কথা মনে করে দেখ। সেই যে দেশভাগ হবার পর আমরা এক সাথে দেশ থেকে পাড়ি দিয়েছিলাম। গেদে এসে আমরা ভাগাভাগি হয়ে গেলাম। আমরা রয়ে গেলাম রাণাঘাটে আর তোমরা গেলে কোন অজানার খোঁজে। তারপর তো আর দেখা হয়নি।

তিরিশ বছর! তারও বোধহয় বেশি।

এবার মনে পড়ল পুতুলকে। ওর নাম রাধিকা। ছোটবেলায় অনেকে ঠাট্টা করত। তুই কানু আর ও হল রাধা। সেই পুতুল! আমার ছোটবোনের সঙ্গে একই স্কুলে পড়ত। আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসত, আমর বোন প্রতিমার সঙ্গে গোলকধাম খেলত। আমি বসে বসে খেলা দেখতাম। মনে পড়ে গেল অনেক কথা। সে সময় আটহাতি শাড়িটা জড়িয়ে পড়ত। দেহের ওপরটা আঁচল দিয়ে ঢাকা থাকত।

পুতুল জিজ্ঞেস করল, কবে এসেছ ?

এখনও চব্বিশ ঘন্টা পেরোয়নি। তুমি বুঝি গঙ্গাস্নান করতে এসেছ ?

পুণ্যলাভের আকাঙ্খা আর নেই। কাজের লোক খুঁজতে এসেছিলাম? পেলাম না। বললাম, কোথায় আছ?

কেদার ঘাটের কাছে একটা বাড়ির নীচেরতলা ভাড়া নিয়ে। তুমি কোথায় আছ?

গোধূলিয়ার একটা হোটেলে। সকাল সকাল সারনাথ যাব স্থির করে স্নান করতে এসেছি।

আজ আর সারনাথ যেতে হবে না। হোটেলে গিয়ে মালপত্র নিয়ে আমার আস্তানায় চলে এস। কটা দিন পুরানো কথা বলে কেটে যাবে। এই নাও ঠিকানা।

কিন্তু।

কিন্তু নেই কানাইদা। হোটেলের খরচ তো বাঁচবে।

কিন্তু।

ওসব শুনতে চাই না। যদি দশটার মধ্যে আমার বাসায় না আস তাহলে আমি হোটেলে গিয়ে হামলা করব। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর কথা নয়। তুমি অবশ্যই আসবে। আমি চললাম।

জোর কদমে পুতুল রাস্তা ধরল।

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

পুতুলের আস্তানায় এসে অবাক হয়ে গেলাম।

পুতুল একাকী থাকে। সঙ্গে থাকে একটা বিধবা বামুনের মেয়ে। রান্নাবান্না সব কিছু করে দেয়।

জিনিসপত্র নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। বাড়ির কর্তা কোথায়?

নেই।

কোথাও কাজে গেছে বুঝি?

বোধহয়। তারপর, তুমি বিয়ে নিশ্চয়ই করেছ? বউ কোথায়? সঙ্গে আনতে পারতে। সেও তীর্থধর্ম করে যেত।

বললাম, বিয়ে করেছিলাম। বউ ওপারে, বলেই আকাশের দিকে হাত তুলে ধরলাম।

ছেলেমেয়ে?

নেই। তোমার?

একটা মেয়ে। বিয়ে দিয়েছি। ভালই আছে দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে।

তোমার কর্তা কি আজ ফিরবেন?

না কোনদিনই ফিরবে না।

তার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। প্রশ্ন করার ইচ্ছাটাও যেন লোপ পেল। কোথাও একটা গুরুতর ক্ষত রয়েছে তাতে প্রলেপ দেবার মত কেউ বোধহয় নেই। পুতুলের মুখের চেহারায়

কিছুই বুঝতে পারলাম না। দেখলাম তার মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে। চোখ দিয়ে ঘৃণার তীব্র বিষ যেন ঝড়ে পড়ছে। ব্যক্তিগত কথায় কোন আগ্রহ ছিল না। আমার অন্যমনস্কতা ভেঙে গেল পুতুলের কথায়।

রাতে তুমি কি খাও ?

যা পাই।

দিনে ?

দিনেও কোন বাছবিচার নেই।

কাল সকালে দু'জনেই যাব সারনাথে। একটা রিক্সা ভাড়া করে বেরিয়ে আসব। তোমার কোন অসুবিধা হবে না তো ?

মোটেই না। আজকের দিনটা কোথায় যাব ঠিক কর।

তোমার বিশ্রাম। আমার হল মার্কেটিং। কেমন ?

সারনাথের পথে পুতুলের কথা যেন ফুরাতে চায় না।

বলল, আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছ। তাই না ? কি করব বল। তোমার অনেক খোঁজ করেছি কিন্তু কেউ তোমার হদিস দিতে পারেনি।

আমিও তোমাদের খুঁজেছি। আমার এক বন্ধু পুনর্বাসন বিভাগে কাজ করেন। তাকে বলেছিলাম। সে হেসে বলেছিল, পঞ্চাশ-লক্ষ বাস্তহারার মধ্যে বনমালি চক্রবর্তীকে খুঁজে বের করা কি সহজ কাজ। সমুদ্র সেঁচে মুক্তো পাওয়া যায় কিন্তু মানুষের সমুদ্রে বনমালী বাবুকে পাওয়া যাবে না বন্ধু।

তোমাকে পেলে আজ আমার এ দশা হত না। কানু আর রাধার মিলন ঘটলে আজ পুতুলকে চিন্তা করতে হত না। নিজের কর্মফলের জন্য অনুশোচনা করতে হত না। অবশ্য এরজন্য দায়ী আমি একাই। বাবা-মাকে দোষ দিতে পারব না।

সব দোষ নিজের মাথায় তুলে নিয়ে সান্ত্বনালাভ করছ এই তো। কিন্তু তোমার সেই কর্তাটির নাম কি ?

প্রবোধ। চিনতে পারলে ?

খুব চিনেছি। ওর সঙ্গে তো কয়েকবার দেখাও হয়েছে। ওতো কথাও বলেনি। তোমার সাথে ওর বিয়ে হয়েছে।

বলার মুখ ছিল না।

তা বটে। স্কুল থেকেই ওকে ককুষার প্রবোধ বলেই জানি। যে কোন কুকাজ করতে ওর জুড়ি ছিল না। তা ওর সঙ্গে পরিচয় কি করে হল ?

রিফুজি ক্যাম্পে। তখন কি জানতাম ও একটা পাষণ্ড শয়তান। সবার অমতে বিয়ে করলাম। আমাকে নিয়ে কাশীতে এল। এই বাসা ভাড়া নিয়ে সংসার সাজালাম। ছোটখাট চাকরি করে দিন গুজরাণ মন্দ হত না। সব সময়ই বলত, আরও কিছু টাকা হলে বেশ ভালভাবে থাকতে পারতাম। আমি বলতাম, ভগবান যা দিয়েছেন তা'তেই খুশী থাকতে হয়। লোভ বিপথে নিয়ে যায়।

তারপর ?

একদিন এসে বলল, আমি আবুধোবিতে চাকরি পেয়েছি। বেতন মাসে ষোল হাজার টাকা।

ষোল হাজার। বল কি!

সত্যিই তাই। আমি আবুধোবি যেতে চাই। তোমার কি মত ?

অমত কিছু নেই। যত চিন্তা বন্দনাকে নিয়ে।

কোন চিন্তা নেই। ওখানে গিয়ে বাসা ভাড়া করে তোমাদের নিয়ে যাব।

প্রবোধের সব কথা বিশ্বাস করেই ভুল করেছিলাম। তবে আমার যে টাকার প্রতি আকর্ষণ ছিল না একথা বলতে পারিনা।

পুতুল থামল।

রিক্সাটি তখন রেল লাইনের পাশ ধরে চলছিল।

পুতুল বলল, কি ভাবছ ? আমার ভাগ্যের কথা ?

ভাবছি এই ছোট লাইনের গাড়ির কথা। ষাট বছর আগে বাবা-মায়ের হাত ধরে আমরা সব ভাই বোন এই ছোট লাইনের গাড়িতে চেপে কাশী এসেছিলাম। তখন ইংরেজ ছিল দেশের রাজা। তারপর কত বছর কেটে গেছে। আজও লাইন আছে।

তা হলে তুমি এর আগে কাশী এসেছ ?

অনেকবার। পাতালেশ্বরে আমার মামার বাড়ি ছিল। এখন অবশ্য নেই। মামারা বেচে কিনে খেয়ে শেষ করছে। তুমি তাহলে আবুধোবি গিয়েছিলে ?

না। প্রবোধ সেই যে আবুধোবি গেল তারপর ছয় মাস একটা পয়সাও পাঠাল না। কোন চিঠিপত্রও দিল না। কেমন সন্দেহ হল। বেঁচে আছে কিনা সেটাই হল বিশেষ চিন্তার কথা। নিজেদের পেট চালাতে কাজ নিলাম রাঁধুনির।

ছয় মাস পরে প্রবোধের চিঠি পেলাম। তার সঙ্গে পেলাম গালফ্ ব্যাঙ্কের তিরিশ হাজার টাকার একটা ড্রাফট্।

তারপর ?

তারপর আর কিছু নেই। তার আগের কথাটা বলা দরকার। প্রবোধ লিখেছিল, সে নাসিমাবানু নামে একটা মেয়েকে বিয়ে করে আবুধোবিতে ঘর সংসার করছে। তিরিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছে ক্ষতিপূরণ হিসেবে। তবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বন্দনার বিয়ের সময় দরকার মত টাকা

সে দেবে। চিঠি পেয়ে কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এই দুর্ভাগ্যের কথা কাউকে বলতেও পারছিলাম না। এমন কি বন্দনাকেও আজ অবধি বলতে পারিনি তার বাবার কথা।

বললাম, তার বাবার কথা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করেছে ?

করেছে কিন্তু প্রবোধ যখন আবুধোবি গিয়েছিল তখন বন্দনার বয়স সবে তিন বছর। বাবার কথা তার মনেই নেই। তবু অন্যের বাবাদের কথা শুনে মাঝে মাঝে নিজের বাবার কথা জানতে চেয়েছে। কোন উত্তর দিতে পারি নি।

বন্দনা বি-এ পাশ করল।

বাঙ্গালীটোলায় টিউশনি করত। এমন সময় সুযোগ পেয়ে ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দিলাম।

বিয়েতে প্রবোধ টাকা দিয়েছিল ?

ঘেন্নায় তাকে জানাতেও চাইনি। তবে হৃদয়বান লোকের অভাব তো নেই। তাই বন্দনার বিয়েতে কোন হ্যাপা পোয়াতে হয়নি।

আমরা গন্তব্যস্থল পৌঁছাতেই গল্পের সমাপ্তি ঘটল।

ফিরতি পথে পুতুল তার বাইশ তেইশ বছরের করুণ জীবন মরণের লড়াইয়ের ইতিহাস শুনিয়েছে। কিভাবে দাসীবৃত্তি করে মেয়েকে বড় করেছে। কত অপমান লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করেছে। সব বলার পর বলল। সে সময় তোমার সঙ্গে দেখা হলে এরকম দুর্দশা এড়াতে পারতাম। ছোটবেলার ভালবাসাটা চাঙ্গা দিয়ে উঠত।

হাসলাম।

হাসছ কেন ?

তোমার আকাশকুসুম ভাবনা শুনে।

তা বটে।

ফিরতি পথে বাজারের কেনাকাটা সেরে নিল পুতুল।

বললাম, কদিন তোমার কয়েদখানায় থাকতে হবে পুতুল।

পুতুল হেসে বলল, আমার কয়েদখানার গরাদ ভাঙ্গা। যে কোন সময় ছুটে যেতে পার কানাইদা। শক্ত বাঁধন মনে করে যার সঙ্গে ঘর বেধেছিলাম সে-ই আমাকে ঠকিয়ে গরাদ ভেঙ্গে পালিয়ে গেল। আর ভাঙ্গা গরাদ দিয়ে তোমাকে আটকাতে পারব কি !

আমি মুখ ফিরিয়ে শহরের বাড়িঘর আর কাশীর দুর্ভেদ্য গলিগুলো দেখছিলাম। পুতুল আমার ধ্যানভঙ্গ করে বলল, কি ভাবছ ?

ভাবছি না, ভবিষ্যতের জন্য ভাবনাগুলো জমা করে রাখছি।

প্রায় দু বছর পর পুতুলের দেওয়া ঠিকানায় বন্দনার বাড়িতে হাজির হলাম।

নতুন করে পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার মা কোথায় আছে ?

আমার মা !

হ্যাঁ, পুতুল। তোমার মায়ের নাম তো পুতুল। আমার ছোটবেলার খেলার সঙ্গী ছিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মা বলতেন আপনার কথা। কানাই নামটা আমার মনে আছে। মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কয়েকদিন আগে তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছি।

এখন কেমন আছে ?

ভাল নয়। পাশের ঘরেই আছে। কিছুদিন আগে যদি মাকে আনতে পারতাম তাহলে বোধহয় বাঁচানো যেত। মায়ের ভেদ, মেয়ের গলগ্রহ হবে না। বড় দেরী হয়ে গেছে।

আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল বন্দনা।

মা, ঐ দেখ কে এসেছেন। তোমার সেই কানাইদা।

পুতুলের প্রায় কোমা অবস্থা। বন্দনার চিৎকারে একবার তাকাল। তারপরই তার চোখ ভেঙ্গে জল নামল। কোন কথা বলতে পারল না।

কেমন আছ পুতুল।

কোন উত্তর নেই। মোহাচ্ছন্ন ভাব।

আমি এসেছি।

ক্ষীণ স্বরে বলল, ভাল। তোমার জন্যই এতক্ষণ প্রাণটা আছে।

ছি, ও কথা বলতে নেই।

পুতুল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

ধীরে ধীরে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে বসতেই বন্দনার কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। হকচকিয়ে ছুটে গেলাম পাশের ঘরে। তখন সব শেষ।

বন্দনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল আপনাকে দেখার অপেক্ষায় ছিলেন বোধহয়।

মনে মনে ভাবলাম, সারাজীবন পুতুল আমার অপেক্ষা করে শেষবারের মত আমাকে দেখে বিদায় নিল।

আমি কেঁদেছিলাম কি ? না, কাঁদতে পারিনি। পুতুল তো আমার জীবনে কোন রেখাপাত করেনি। মানুষের শেষ পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করলাম। এর বেশি কিছু নয়।

না, তা নয়।

পুতুলের অতৃপ্ত জীবনে কিছু পেতে চেয়েছিল, যখন পেল তখন তার অন্তিম দশা। কানাই রাধার যুগল মিলন আর হল না। ভাবছিলাম, পুতুল কি চেয়েছিল, আর চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্ব কিভাবে শেষ হল।

।। আমি তাকে মা ব'লে ডাকি ।।

(পক্ষী-মা লক্ষ্মী-মাকে আমার নিবেদিত)

নচিকেতা ভরদ্বাজ

ছোট্ট খাট্টো আটপৌরে একটি কিশোরী বাঙালী মেয়ে ব'লে
তাকে দেখলে মনে হবে : কিন্তু তার বুক ভরা আকাশ-মাটির
আনন্দ-রূপ : হৃদয় পূর্ণ তার ভালোবাসার নম্র মেঘদলে—
কখন স্নেহের বৃষ্টি ঝরে পড়বে—আকাশ মাটিতে পরিশ্রুত
করে স্নিগ্ধ সবুজে সোনায় ভ'রে দেবে এই জগৎ সংসার
নিজেই তা জানে না মেয়ে। —যেন রাত্রি ভোরের শিশির
এমনি প্রশস্তি তার মুখচ্ছবি—পুণ্যতায় পবিত্র পূত
সমগ্র সত্তাটি তার !.....

পুত্র ব'লে আমার সে নিয়েছে সব ভার
আমার আকাশ জুড়ে তার স্নেহ রৌদ্র-বৃষ্টি হাওয়ার অক্ষরে
অবিরাম ঝরে পড়ছে ! মাতৃহীণকে মা সে দিয়েছে
একথা ভুলিনি আমি, কোনোদিন ভুলতে পারব না।

তার সে মমতাময়ী দেবী-চোখে যখন সে আমাকে স্পর্শ করে,
সুমধুর কণ্ঠস্বরে—উদাত্ত-সরিত-প্লুতে যখন সে কথা ব'লে যায়
আমার পতিত জমি ভ'রে যেন ফ'লে ওঠে সোনা।
অবেলার বৃষ্টি তবু অপাবৃতি নিয়ে আসে—এ-দেহের—এ-মনের
কী যেন কী মোহিনী মায়ায়।

আমি তাকে 'মা' ব'লে ডাকি। কিন্তু তাকে মনে হয়—ডানা মেলা যেন একটা পাখী
অন্ত আকাশ থেকে এসেছে সে। তার দু'টি বিমুগ্ধ চোখের ভাষায়
আকাশ-আলোর গান। —সে আমার পক্ষী মা, লক্ষ্মী মা-টি হ'য়ে
এসেছে আমার কাছে, আমি তার শাবক-শিশু নাকি ?
আমি তার ডানার নীচে নির্ভর নিবিড় আশ্রয়ে
আহা বড় সুখে আছি : ... .

.... সে আমাকে জীবনের আকাশ-গঙ্গায়
পক্ষী জননীর মতো শিখিয়েছে সক্ষম সাঁতার!

সে যখন কাছে আসে—মনে হয় পক্ষী-মা'র স্নেহের ছায়ায়
আবার নতুন ক'রে বেঁচে উঠছি! ....খুঁজে খুঁজে কত যে আধার
নিয়ে আসে আমার জন্য—দেহের ও মনের ক্ষুধার
পক্ষী-মা, লক্ষ্মী-মা—আমি তাকে বার বার করি নমস্কার।
এবং এমনি ক'রে আমি তার শাবক-ছা হ'য়ে চিরকাল
থাকতে চাই। মাগো, তোর কৃপা-দৃষ্টি থেকে কভু
কোনোদিন বঞ্চিত করিস না আমাকে—।
পক্ষী-মার মতো তুই আমাকে অমনি করে আগলে থাক
আমি মাগো, বড় ভালোবাসার কাঙাল!
তোর ঐ দেবী-দৃষ্টি. বরাভয় হাত দু'টি আকার্ষণ করে, যেন ডাকে
এ আমাকে। আমার হৃদয় মনে সমগ্র সত্তা জুড়ে অনুভব করি তোর মাতৃ-সত্তাকে॥

দিব্যজ্যোতি

জিতেন কুমার দাস

দিব্যজ্যোতির পূর্ণ প্রকাশ তিমির আঁধার ভেদি,
সত্য সাধনে বিজয় মাল্য মঙ্গল করে বেদী।
কোথা দশানন কোথায় কংস কোথায় দুঃশাসন,
নিপীড়ক যত কালিমায় ভরা নিন্দিত গুণীজন।
ধর্মের ঢাক বাজে চিরদিন ন্যায়ের নিশান উড়ে,
অত্যাচারের সীমানায় এসে যায় তারা ছাড়ে খাড়ে।
যত গ্লানি ক্লেদ আঁধারের বুকে চলে নারকীয় খেলা,
জ্যোর্তিময়ের পূর্ণ জ্যোতি করে তারে অবহেলা।
যা কিছু গুপ্ত বিরাম বিহীন সত্য পড়ে না চাপা,
সময় সমীপে মিথ্যা নিরেট ধরণীর মাঝে ফাঁপা।

পাখি

কিরণশঙ্কর মৈত্র

একটা পাখি
কালো
অজান্তে হঠাৎ কখন উড়ে আসে
পাখা মুড়ে
অগোচরে
হৃদ্‌কমলে বিঁধে যায়

সে নিজেই
একান্ত নিভৃত লিপি
দুই ডানায় বিস্তৃত
দুঃখ ও বিষাদ

অপরাধী

(ছোট গল্প)

সুনীল কুমার মণ্ডল (বীরভূম)

নির্জন ঘর। বেশ কয়েকটা নড়বড়ে আগোছাল চেয়ার ও একটা টেবিল। এরই মধ্যে একটা চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বসেছিল দীপেশ। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে কেউ যদি দীপেশকে এ অবস্থায় দেখতো, তাহলে অনেকেই একবাক্যে বলতো—দীপেশের চিন্তাজগতে সাহিত্যের কোন চিন্তা তাকে গ্রাস করেছে এবং তা থেকে বেরিয়ে আসবে মানব মনের আনন্দময় খোরাক। কিন্তু প্রিয়লেখা তাকে একা রেখে যখন দিন দুয়েকের অসুস্থতায় পরলোকে পাড়ি জমালো. তখন থেকেই দীপেশ তার কলম থামিয়েছে—সৃষ্টির উৎসমুখে ইতি পড়েছে! তাই আজ আর কেউই ঠিক বলতে পারে না, সে কি চিন্তা করছে। হতে পারে হয়তো প্রিয়লেখার স্মৃতিরোমন্থন, নয়তো ভবিষ্যৎ অন্নময় জীবনের পথে নিজেকে ধীর লয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথাই। দুর্বার ক্ষুধার জ্বালা তো কাউকেই এই মরজগতে ক্ষমা করবে না, রেহাই দেবে না ধীর স্থিরভাবে গতিহীন অবস্থায় বসে থাকার সুখটুকু অনুভব করতে; বিশেষ করে—দীপেশের মতো বিত্তহীন বেকার জীবন দরিয়ায় ভাসমান মানুষকে।

একটু পরেই সোমেশ বেড়াতে বেরিয়ে দীপেশের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। এ গ্রামে সোমেশের মামাবাড়ি। এর আগে সোমেশ অনেকবার এখানে এসেছিল, যখন দীপেশ তার লেখনী মুখে সাহিত্যের অমৃতধারায় তাদের মতো অনেকের মনে আনন্দের অনির্বাণ স্রোতধারা বইয়ে দিত। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সোমেশ দেখলো—শ্রীহীণ পূজামণ্ডপ! প্রতিমা বিসর্জনের পর নির্জন শূন্যতায় ভরে আছে। মনে পড়ল, এভাবেই সে কতবার এসেছে, দেখেছে—দীপেশ হাড়ভাঙা খাটুনির পর যেটুকু অবসর মেলে তাতেই—গল্প. উপন্যাস, নাটক কিংবা কবিতা লিখছে। আর প্রিয়লেখা তার সামনে অধীর আগ্রহে বসে অপেক্ষা করছে—শোনার আনন্দের চরম মুহূর্তটির জন্য! আর আজ—সব যেন কেমন উলট পালট। প্রিয়লেখা দীপেশের বাস্তবের গণ্ডীবদ্ধ জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়ার পরও এসেছে সোমেশ, কোন সান্ত্বনার বাণী সেদিন শোনাতে পারে নাই। যদিও জানতো দীপেশের জীবনে প্রিয়লেখাই সব—প্রিয়লেখাহারা দীপেশ ছন্নছাড়া. উদ্‌ভ্রান্ত একটি সাধারণ মানুষ!

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর, ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সোমেশ দীপেশের টেবিলের সামনে। দেখেই হঠাৎ ধাক্কা খাওয়ার মতো চমকে উঠলো দীপেশ—চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে গেল।

চমকে উঠলেও সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিল সে। মৃদু হেসে দীপেশ বলল, কি গো ভাগ্নে অনেকদিন পর এলে, তোমাদের সব ভাল ?

সোমেশও মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ মামাবাবু, সবাই ভাল, আপনি ?

—চলে যাচ্ছে একরকম।

—আপনার শরীর কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে ?

—বয়স হচ্ছে, শরীরের আর দোষ কি।

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আক্ষেপের সুরে সোমেশ বলল, দুর্ভাগ্য আপনার, দুর্ভাগ্য আমাদেরও ; প্রিয়মামীমা মারা যাবার জন্য আজ— !

—হঠাৎ প্রিয়কে মনে পড়ে গেল ?

—মনে পড়ার জন্য শুধু আমিই দায়ী নই, আপনার তাবৎ সহমর্মী পাঠকেরাই !

কথাটা বলতে বলতেই দীপেশের মুখের দিকে তাকাতেই সোমেশের বক্তব্য আটকে গেল। ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসল সোমেশ, তাকালো দীপেশের মুখের দিকে। দেখলো, হঠাৎ কালবৈশাখীর উড়ো মেঘের মতো দীপেশের মনের আকাশে বেশ ভীড় করে মেঘ জমেছে। আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেতে মহাপ্রকৃতি নিথর হয়ে এলো। কিন্তু ঝড় উঠল না ; তার বদলে দীপেশের অন্তর ভেদ ক'রে একটা ঝড়ো দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার অজান্তেই। দুজনেই চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পর দূরমনস্কের মতো দীপেশ বলল, প্রিয়র কথা, আর নাই বা তুললে !

কথাটা শুনে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কেটে যাওয়ার পর সোমেশ ধীরে ধীরে বলল, তাঁর কথা না তুললেও আপনা আপনিই যে—উনি এসে আমাদের সামনে দাঁড়ান !

অন্তরের সবটুকু একাগ্রতা ঢেলে দিয়েই বোধহয় দীপেশ সোমেশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, হতে পারে !

—তা নয়তো কি ? মামীমা চলে যাবার পর থেকেই তো লেখা একদম ছেড়ে দিলেন !

—অনেকটা তাই !

—কিন্তু, এতেই কি তাঁর প্রতি সত্যিকার সম্মান দেখানো হচ্ছে ?

—হয়তো নয় !

—তবে ?

—যে যায় সে আর আসে না, আমি যে —

—এই মরণশীল জগৎ থেকে সবাইকেই একদিন এই দেহ ত্যাগ করে চিরদিনের মতো চলে যেতেই হবে, কিন্তু আপনি—

—যাকে হারিয়েছি, যা হারিয়েছি, তাকে আর—

—তাই বলে সব কিছু হারিয়ে যাওয়া দেউলিয়াদের মতো···· !

—সে যে সব নিয়ে গিয়েছে, আমাকে নিঃস্ব করে···· !

রুদ্ধ হয়ে গেল দীপেশের কণ্ঠস্বর। বেদনার গভীরে সে যেন তলিয়ে যেতে চাইলো। কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে সোমেশ বলল, আপনি এই বিচ্ছেদ বেদনাতেই সাহিত্যের নূতন সুর খুঁজে পেতে পারেন !

অন্তরের তীব্র ব্যথার অনুভূতি সত্ত্বেও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃদু হেসে দীপেশ বলল, হয়তো পারি, কিন্তু···

—কিন্তু ?

—যাকে সামনে রেখে সৃষ্টির আনন্দ খুজে পেতাম, তা যে আজ হিমশীতল !

—একদিকের নিঃস্বতা অন্যদিকের পূর্ণতার পূর্বাভাসও তো হতে পারে !

—তা ঠিক, তবে অন্তরের মধ্যে যে বিরাট শূন্যতা, তাকে যে কিছুতেই পূর্ণ করতে পারছি না !

—সাহিত্যের সাধনা দিয়েই পূর্ণতা আনতে হবে, রবীন্দ্রনাথ বা অন্যান্য সাহিত্যিকরা যেখানে··· ?

এবার মৃদু হেসে অনেকটা সহজ হয়ে দীপেশ বলল, কোথায় সমুদ্র আর নালা, এ দুয়ের কি··· ?

—হয়, নদী-নালা-বৃষ্টির মহামিলনেই তো মহাসমুদ্র, নইলে সমুদ্রের পূর্ণতা আসতো কি ? সীমাহীন সৃষ্টির চলমানতা কি শুধু মাত্র কয়েকজনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় ? যদিও বিন্দুর মধ্যেও সিন্ধু দর্শন হতে পারে, তবু নির্দিষ্ট বিন্দুতে থেমে যাওয়া তো সৃষ্টির লক্ষ্য নয় !

কথাগুলো একটানা বলে নীরব হল সোমেশ। দীপেশ চুপচাপ শুনল, মুখে কিছুই বলল না। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সোমেশ আবার বলল,—আগামী সংখ্যার পত্রপত্রিকায় কিন্তু আপনার লেখা দেখতে চাই, আশা করি— ?

এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীপেশ ধীরে ধীরে বলল, লেখা হয়তো দিতে পারি, কিন্তু তাতে কি সত্যিই প্রাণ থাকবে ?

—প্রিয়মামীমা সত্যিই কি আপনার জীবন থেকে চলে গিয়েছেন ?

—কি জানি !

—না, কোনদিনই না ; তাঁকে কোনদিনই হারাতে পারেন না, তবে .. ।

—তবে ?

—তাঁকে এতদিন সাহিত্যরসের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছেন !

কথাটা শেষ করেই সোমেশ তাকিয়ে রইল দীপেশের মুখের দিকে। দেখলো, দীপেশের মনের আকাশটা আবার বেশ ঘোলাটে হয়ে উঠল। কথাটা দীপেশের কানে যেতেই অতীত স্মৃতির ধূসর পর্দাটা আলোকিত হয়ে দুলে উঠল। তার মনে পড়ল, একদিন একটা কবিতা লেখা শেষ ক'রে দীপেশ নিজের মনেই বার কয়েক আবৃত্তি করল, কিন্তু মন ভরল না। প্রিয়লেখা তখন সাংসারিক কাজে এমন জড়িয়ে পড়েছে যে, স্বামীর পাশে বসে তা শোনার তিলমাত্র ফুরসৎ নাই। অতিষ্ঠ হয়ে বারকয়ের স্ত্রীর আসার পথের দিকে চেয়ে থেকে নিরাশ হয়ে একরকম বাধ্য হয়েই ডাক দিল, প্রিয়, প্রিয়লেখা শুনছো—একবার তাড়াতাড়ি এসো—কবিতাটা শেষ করেছি—তোমাকে এক্ষুনি শুনতে হবে!

নিচে থেকে প্রিয়লেখা অনেকটা বিরক্ত হয়েই বলল, কবিতা শোনা দূরে থাক্, এখন আমার মরারও সময় নাই, রেখে দাও পরে শুনবো কাজগুলো না সেরে আর···।

—তা হলে আজ থেকে এখানেই আমার লেখা ··!

হাতের ঝাঁটাটা সশব্দে ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে প্রিয়লেখা দ্রুত নিজের শাড়ীর আঁচলে হাত মুখ ঝাড়তে ঝাড়তে এসে দীপেশের পিঠে একটা সোহাগের মৃদু থাপ্পড় দিয়ে স্বামীর পাশে বসে বলল, তোমার জ্বালায় ঘর সংসারের কাজকর্ম চুলোয় উঠবে যে, এক্ষুনি তোমার বন্ধুরা এসে পড়লে বসতে দেবো কোথায়? —বিড়ি সিগারেটের টুকরোগুলো এবার থেকে নিজের নিজের পকেটে পুরতে বলে দিয়ো!

স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে মোহময় আবেষ্টনীতে মৃদু হেসে দীপেশ বলল, আগে আমার লেখা, তারপর তাদের আসা যাওয়া, তারও পরে তাদের—আসা যাওয়ার ধকল!

—এবার কাজ শুরু ক'রো, কি শোনাবে শোনাও?

—এতো তাড়াহুড়ো ক'রে?

—দিনের দিন ছেলেমানুষি তোমার বেড়েই যাচ্ছে, সত্যি ক'রে বলতো—সত্যিই আমাকে ভালবাসো!

—প্রিয়, হঠাৎ এ তুমি ··· ···· ?

—কোনদিন আমাকে তোমার সাহিত্য থেকে আলাদা ভাববে না!

—তুমি ছাড়া আমার সাহিত্য যে প্রাণ পাবে না!

—কোনদিন রসাস্বাদ থেকে বঞ্চিত করবে না!!

—না গো—না! না!! না!!!

—যদি মরে যাই?

—পাগল হলে, তুমি যে আমার ··· ··· !

—ওসব বড় বড় বুলি, চোখের আড়াল হলেই সব ··· ··· !

এবার আবেগ ভ'রে স্ত্রীর হাতটা নিবিড়ভাবে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে দীপেশ আবেগ-মন্থর কণ্ঠে বলল, আমার সাধনা যে তোমাকে ঘিরেই, তোমাকে জড়িয়েই ; তোমার তৃপ্তিই আমার তৃপ্তি—কালি কলমের প্রাণ !

—কিন্তু, তবুও যদি ···· ···· ?

—এখানে কোন কিন্তু তবু নাই প্রিয়লেখা, যতদিন তুমি ততদিনই আমি ! তুমি আমি এক, চিরন্তন—জীবনে মরণে !

নির্নিমেষ নয়নে দেখছিল দীপেশের দিকে তাকিয়ে সোমেশ—দীপেশের রক্তেমাংসে গড়া মুখের আয়নায় ভাবের উত্থান পতনের নীরব রেখাচিত্র। বেশ কিছুক্ষণ পর গভীর দীর্ঘশ্বাসে দীপেশের বক্ষপিঞ্জর কেঁপে উঠল। সেদিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সোমেশ বলল, আপনারাই বলেন, দৈহিক মৃত্যু শেষ কথা নয়, প্রয়োজনের বেড়ীমুক্ত হওয়া—তারপর থেকেই তো আর এক মহাজীবনের শুরু, সেখানেই তো অনন্ত বিস্তৃতি, সব পাওয়ার শান্তিময় মুক্ত পূর্ণাঙ্গণ—প্রিয়মামীমা হয়তো সেখান থেকেই নিশ্চিন্তে—সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে চান ! কথাটা শুনে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীপেশ বলল, তবুও যেন ··· !

—হয়তো প্রিয়মামীমা সহজ নাগালের মধ্যে নাই, আমাদের মতো অসংখ্য পাঠকের মধ্যে ছড়িয়ে আছেন—আমাদের বঞ্চিত করলে তাঁর আত্মার কাছেই অপরাধী হবেন !

কথা শেষ করে থামল সোমেশ। সোমেশের কথাগুলো দীপেশের হৃদয়ের নিভৃত তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত হয়ে, রাগ অনুরাগের প্রতি ঘাট ছুঁয়ে চলমান প্রয়োজনসর্বস্ব জীবনকে পিছনে ফেলে অনেক অনেক দূরে টেনে নিয়ে চলল ; এ অভিসার প্রিয়লেখার কাছে শাশ্বত মিলনের অভিসার—যেখানে মহাকালও শুধু অসহায় দৃষ্টিতে লীলা প্রত্যক্ষ করে, গ্রাস ক'রে নিঃশেষ ক'রে দিতে পারে না ! দীপেশ খুঁজে পেতে চাইল সে পথ, যে পথের নিশান সোমেশ তাকে এইমাত্র দিয়েছে। পথের সঠিক হদিশের জন্য দীপেশ নির্বাক নির্লিপ্ত সমাধিস্থ—সোমেশের মধ্যেই যেন পথ দেখার আলো, এ আলোতেই সে চিনে নিতে চায় নিজেকে, অপরাধীর অপরাধকে ধুয়ে মুছে নিতে। দেখতে দেখতে মুক্তাবিন্দুর মতো অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল দীপেশের সজল চোখের কোণ থেকে।

নারায়ণ

মীর মহম্মদ জাফর

দোকানে বসে ঝিমুচ্ছিলাম। ছোট্ট মণিহারির দোকান। রাত্তির বিশেষ হয়নি। রাস্তা তবু ফাঁকা। পথচারি নেই প্রায়। দু' চারটে বেওয়ারিশ স্বাধীন কুকুর, পথে ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি দুটি বাই-সাইকিল এর টুং টাং। রিক্সোর আরোহী যেন মাঝে মাঝে হঠাৎ ছিটকে আসার মত। নির্লজ্জ ও লজ্জিত খদ্দের আসে ঠিক এই সময়। তাঁদের অস্বস্তি ও সাহসের প্রাণান্তকর দ্বন্দ্বলীলা। সেই ইনেস্‌পেক্টর বাবুর গিন্নি যখন বুক ফুলিয়ে আমার দোকানের সামনে রিক্সো দাঁড় করান আমি নিজেই বরং অপ্রতিভ হয়ে পড়ি। ভদ্রমহিলা কি চান জানি বাবা। চুপিসাড়ে পাচারও করে দেব তা বলেতে। কিন্তু এরূপ বদখত ও তীক্ষ্ণকণ্ঠের চীৎকারে শ্রোতাকুলের পিলে চম্‌কে দিয়ে নাফাটা কি? যাকগে। যে যা ভালো বোঝে। এই খদ্দেরগুলোর থেকেই তো দু'পাইস বেশি রোজগার হয় আমার। ওদেরই আশায় বসে থাকি। যারা সন্তান চায় না, সেই সমস্ত খদ্দের পিল্‌ প্যাকেট নিতে আসে এ সময়টা বেশ নিরিবিলি বলে।

বাড়িওলার হুকুম বিদ্যুতের আলো বেশি পোড়ান যাবে না। কেবল খচ্‌খচানি। আলো জ্বলছে এখনো। এবার দোকান বন্ধ করতে হবে।

একটু গোছগাছ করে নিচ্ছি, নানান চিন্তার ভিড়ে। হঠাৎ লক্ষ্য হ'ল একটি যুবতী, এক কিশোর।

সত্যি চমকে উঠলাম। শ্যামলী! তার ভাই তরুণ!

বিস্মিত হয়ে এবং উৎকণ্ঠায় বললাম: আরে শ্যামলী যে! তরুণ! কী খবর তোমাদের? হঠাৎ?

হাসল শ্যামলী। লজ্জিত। তরুণ যেন ঠাকুর দেখছে আমাকে।

শ্যামলী বলল: জামাইবাবু, আমরা এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। বীরভূম। তরুণ মাঝে মাঝে বিরক্ত করত আমাকে। বেড়াতে আসতো। গতকাল এসেছি আমরা। তারাপীঠ হয়ে বক্রেশ্বর। গত কাল দাতাবাবার মেলা দেখেছি, পাথর চাপুড়িতে। রাত্রিটা মেলায় কাটিয়ে সকালে গিছলাম বাসে মশানজোড়। বিকেলে ফিরে আসার পর বাস পাইনি, বাড়ি ফেরার। কি একটা গণ্ডগোল হয়েছে। রাত্রিটা কাটাবো কোথায়? আপনি ছাড়া আপন লোক তো কেউ নেই এখানে। একটা হোটেল টোটেল এর ব্যবস্থা করে দিন। একটু সস্তা। শুধু রাতটা কাটাব। সকালে দিদিকে দেখা করে বাড়ি চলে যাব।

পরিস্থিতি অস্বস্তিকর। শ্যামলীদের অবস্থা জানি। শ্বশুরগ্রামে ওপাড়ার মেয়ে। সংসারে বাবা মা ঠাকুমা একটি ভাই তরুণ। সামান্য জমিজমা। গ্রামে টিউশানি করে বাড়ি বাড়ি। ভাইকেও সময় বেঁধে পড়ায়। আর গ্রামে মাস্টারি করে কি আয় সেতো আমার জানা।

CENTRAL LIBRARY

সুতরাং চিন্তাজনকই বটে।

বললাম : শ্যামলী ধরো এখানে একটি রাত্রিবাস তার খেসারত নগদ ত্রিশটি টাকা।

যেন আঁতকে উঠল শ্যামলী : তিরিশ ?

বললাম : শহর হ'ল কহর—মানে বজ্র। তাই কথা দিদিমণি। এতটা খরচের ধকল সইতে পারবে ?

একটু যেন ক্ষুণ্ণ হ'ল। তবু বলল : উপায় যখন নেই দিতে হবে।

আমি একটু সাহসী হয়ে উঠলাম। ভয়ও হচ্ছে। একটি শোবার ঘর। অন্যটি ঠিক বাসের উপযোগী বলা যায় না। নানান আসবাবে ভর্তি। মাঝে মাঝে হঠাৎ কুটুম্ব এলে অপারগ হয়েই ওটাকে ব্যবহার করি। ফস্ করে ওকে বলে ফেললাম : তোমার অসুবিধা না হলে আমার গরীবখানায় রাত্রিটা থাকতে পার।

শ্যামলীও আমাদের অবস্থা কিছু জানে। একটু চঞ্চল হয়ে উঠল : আমি তো বিদেশে। মাথা গোঁজার ঠাই—তার চে একটু নিরাপত্তা যথেষ্ট। আপনাদের অসুবিধা যদি—

আরে না না আমাদের কোন অসুবিধা নেই। তবে গরীব দুলাভায়ের বাড়ি এই যা। ভদ্রলোকের থাকার মত তো নয়। একটু কষ্টে সষ্টে যদি—

কৃতজ্ঞ শ্যামলী। আর তরুণ তখন যেন দ্বিতীয়বার মহাপুরুষ দর্শন করল।

অদূরে 'ঠাকুর ভোজনালয়ে' আহার সেরে পরম তৃপ্তিভরে সেবা নিয়ে যখন ওরা ফিরে এল আমার দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।

খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ওদের !

বললাম চল। দেখি তোমার দিদি ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা। দুজনের কাঁধে দুটি এয়ারব্যাগ।

চলতে শুরু করলাম।

অন্ধকার রাত্রে ওরা আমাকে অনুসরণ করে চলল ! পূবমুখী হয়ে সোজা রাস্তা। ডাইনে একটি ডোবা। তাই ঘেঁষে একটি সরু গলিপথ।

আমি যথারীতি হেঁটে গেলেও ওদের রাস্তা ঠাহর করতে অসুবিধা হচ্ছে। বুঝতে পারছি। সুতরাং দাড়িয়ে পড়ছি ও সময়ক্ষেপ হচ্ছে।

উদ্বিগ্ন হচ্ছি এজন্যে যে ময়না, আমার বউ বোধহয় বাবুকে নিয়ে এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে।

পৌঁছে দরজায় খট্ খট্ শব্দ হতে জওয়াব ভেসে এল। ময়নারই গলা।

ঠাহর করতে না পারা ময়নার মুখ দেখতে পেয়ে কৃতার্থের হাসি হেসে তরুণ বলল : ময়নাদি আমি তরুণ। তোমার বাড়ি থাকতে এসেছি।

বিষম খেল ময়না : হঠাৎ যে! আর কে আছে সঙ্গে রে তোর?

পূণরায় বুদ্ধিমান তরুণ বলল : আরে আমি কি একা আসতে পারি না? সঙ্গে শুধু দিদি আছে মাত্র।

বিস্মিত হল ময়না : শ্যামলী! কই—ওমা, আরে আয় আয়।

শ্যামলী লুকিয়ে ছিল। রগড় করে বলল : ভালো আছ ময়নাদি?

হ্যাঁ ভালো আছি। আয়।

ঘরের যিনি আসল কর্তা অর্থাৎ শ্রীমান বাবু তরুণের এয়ারব্যাগ ছুঁয়ে বলল : এরা কে মা?

: তোর নানী বাড়ির খালা আর মামা।

জবাব শোনার আগেই তরুণকে তখন শোবার ঘরের দিকে টান দিতে শুরু করেছে ঠিকেদারবাবু।

আমি সজোরে হেসে বললাম : একেই আমার ভয়। সম্যক পরিচয়ের আগে আপ্যায়ণ।

শ্যামলী হাসল। ধীরে হেঁটে সেও ঘরে ঢুকে ব্যাগখানি নামিয়ে বাবুর গালটুকু টিপে বলল : আমি তোমার খালা। তাহলে তুমি আমার কে?

: বাবু।

: বাবু নাম তোমার। সম্পর্কে বাবা তো?

ব্যাগের চেন টেনে তার কার্যকারিতা পরীক্ষায় মন দিতে দিতে বলল : মা খালাটা বড় বোকা। আমি বাবু ও বুঝতেই পারছে না।

শ্যামলী কিছুতেই শোবার ঘরে শুতে চাইল না। ওটা ছোট অপরিসর ঘর। তবু সেখানে কোনক্রমে আমি রাত্রিটা কাটিয়ে দিতাম। তবু আমাদের ঘরে ও কিছুতেই শোবে না। প্রধান যুক্তি দুটি। বাবুর অসুবিধা হবে। ময়নাদির নয় দুলাভায়ের কষ্ট হবে। তরুণকে নিয়ে সে আরাম করে ওঘরেই থাকবে বরং।

বাধ্য হয়ে ছোট কামরাখানি পরিষ্কার করতে লেগে পড়লাম। শ্যামলী ক্লান্ত। বারণ করলাম, তবু শ্যামলীও হাত লাগল। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে উপবিষ্ট শ্যামলী তরুণ বাবুদের আসরে গিয়ে বসলাম। মোটমাট কত লোক দেখেছে ওরা, সেই পরিসংখ্যানে তখন ব্যস্ত শ্রীমান বাবু।

হেসে বললাম : তুমি মাষ্টারি করলেও শ্রীমান বাবুদের অঙ্ক কিছুতেই ভুল হবে না। তা প্রতিপক্ষ যখন এতই শক্তিশালী আমার মনে হয় ওর কাছে তোমাদের আত্মসমর্পণ করাই সব থেকে জ্ঞানের পরিচয়।

হেসে শ্যামলী বলল : বেশ বেশ বাবা শ্রীমান বাবু। তোমার হিসেব বুঝি না। মোটমাট হিসেবে আমরা দুশো তিনশো থেকে চারশো পাঁচশো ছশো লোক দেখেছি মনে হয়। খুশি তো ?

এবার খুশি হ'ল বাবু।

শ্যামলী শ্লেষের স্বরে বলল : বাবুরাই মনে হয় দেশের সঠিক জন-সংখ্যা প্রকাশের চেষ্টা করে চলেছে দুলাভাই !

এ কথার উত্তর দিলাম না।

ততক্ষণে ময়না এসে গেছে।

বেশ চুটিয়ে গল্প হল রাত্রে।

সকালে টিফিন হ'ল। শ্যামলী বিধবা। অথচ আশ্চর্য গ্রামের মেয়ে হয়েও শ্যামলীর সংস্কারে ঘা না দিয়ে সহজভাবে অতিথি সেবা করল ময়না। শ্যামলী নিজেও উনুনশালে বসে তরকারি কোটা ইত্যাদি সেরে ফেলেছে সাত সকালে। বারন শোনে নি। দিদির নাকি একা ঝামেলা হচ্ছে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে। যদিও আমাদের সবেধন নীলমণি একটি মাত্র বাচ্চা।

সকালে বাজার অন্যান্য বন্দোবস্ত করতে দোকান যেতে একটু বিলম্ব হয়ে গেছে। দোকানের ঝামেলা মিটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম দুপুরে, দেখলাম শ্যামলী আমাকে দেখে হাসছে। কৌতুকের আশ্রয়। তরুণ রাগত। আর ময়না আমার পানে এমন কট্‌মট্‌ করে তাকাল আমার বুক শুকিয়ে গেল।

মেঝের উপর গামছা বিছিয়ে শুয়ে আছে বাবু। একটা কিছু বিভ্রাট নিশ্চয়ই ঘটে গেছে বুঝলাম।

ময়নার মুখে যা শুনলাম তাতে ক্রোধের চেয়ে লজ্জিত হলাম বেশী।

চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় না হলেও মোটামুটি ভালো রান্নাবান্না করে খাওয়ানোর ইচ্ছে গতকাল থেকেই পোষণ করে রেখেছে ময়না। আর আমিও সজোরে মাথা নেড়েছি। কিন্তু শ্রীমানবাবু কোন এক ফাঁকে খাদ্যের গুণগত মান নির্ণয়ের অভিপ্রায়ে প্রত্যেকটি খাবার আঙ্গুল ডুবিয়ে তুলে খামচে বিশ্রি রকমভাবে খেটে টেস্ট করে দেখেছে। পরিতাপের বিষয় ওদের খাওয়া হয়নি।

কি করব কি বলব ঠিক করতে না পেরে ঘরের ভেতর উপবিষ্ট শ্যামলীর সামনে গিয়ে দাড়ালাম। শ্যামলী উঠে পড়ে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে বলল : বসুন দুলাভাই। না : আপনি তো চান টান করবেন।

তা না হয় করব। কিন্তু যে খুব কষ্ট দিলাম ভাই তোমাদের। খুবই লজ্জার। বাবুটা যে —

ছি! ছি! কি যে বলেন দুলাভাই। ওর কি জ্ঞান আছে? আপনি মিছি মিছি মন খারাপ না করে নেয়ে খেয়ে নিন। অনেক বেলা হ'ল যান। যান বলছি।

তারপর হঠাৎই কেঁদে ফেলল শ্যামলী। দুই চোখ করঞ্জার মত লাল দেখেছি। বলল: ময়নাদি যেভাবে মারল বাবুকে। এখন ভাবছি এখানে না এলেই ভালো হ'ত। দিদি আমার চে কত বড়। সত্যি সব কথা ভেবে বড্ড কষ্ট পাচ্ছি। ওই টুকু বাচ্চা। ওরা অজ্ঞান হওয়াই স্বাভাবিক। কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। থামিয়ে দিল শ্যামলী। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল, বলল: দিদি কি একথাও বোঝে না সামান্য ঘটনার সুযোগ নিয়ে ওভাবে গোরুর মতন বাচ্চাদের পেটাতে নেই, অন্যায়। ওকি জানে না শিশুরা হচ্ছে নারাণ?

শ্যামলী আমার পানে চাইল। চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে কেবলই জল ঝরে যাচ্ছে একটানা।

আমি জবাব খুঁজে পেলাম না ঠিকমত।

তবে আমারও কি দুঃখে এখন কান্না এসে যাচ্ছে? বেদনায় বড্ড মুচড়ে উঠল বুকটা॥

প্রভুকে বসাও সদা অন্তরে

সুনীল কুমার দে

মন্দিরে নয়—মসজিদে নয়
রাম ও আল্লা আছেন অন্তরে।
পূজা-নামাজে পাবে কি তাঁরে
বাঁধা তিনি ভক্তি ডোরে॥

হিংসা অসী ছুঁড়ে ফেলে দাও
প্রেমের বাঁশী হাতে ধরে নাও
মানবতার গান গেয়ে যাও
স্বর্গ আসুক মোদের ঘরে॥

হিংসা কেন ধর্মের নামে.
ঘৃণা কি শেখায় বেদ, কোরাণে,
কি ফল বল মন্ত্র-আজানে
প্রেমের ফকীর প্রভু যেরে॥

রক্তপাত নয় ধর্মের নামে
ভালোবাসা জাগাও প্রাণে
অযোধ্যা-মক্কা আসুক মনে
প্রভুকে বসাও সদা অন্তরে॥

গন্ধরাজ

(গল্প)

শৈলজা চৌধুরী

যখনই-যাই মেয়ের বাড়ি, শ্যামলী পাতা শুদ্ধ গন্ধরাজ এনে দেয় আমায়।

শ্যামলী কে ?

জানাটা কি খুবই প্রয়োজন ? তাও যদি জানতে চাও তবে বলি এদিকের ফ্ল্যাটগুলোতে সে কাজ করে। কিন্তু সেটাও তো সব জানা নয়।

তার একটা দেশ আছে, বাড়ি আছে আর আছে স্বপ্ন।

দেশটা তোমরা জেনে নিতে পার। মেদিনীপুর জেলার এক গ্রামে তার বাড়ি। সেখানে মা, বাবা, ভাই, বোন সবাই আছে। তাদের জন্যে এখানে আসা তার।

কিন্তু একটা জিনিষ সে নিজেও জানতো না। সেটা হল তার স্বপ্ন। গাঁয়ের ইস্কুলে লেখাপড়া করতে করতে কখন যেন একটা স্বপ্ন বাসা বেঁধেছিল! তার খোঁজ করবার সময় কোথা ? ওই গন্ধরাজটা যখন সে তোলে, সে নিজেও জানে না যে ওর সৌরভ ওর মনের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

ওর ঘুরিয়ে পরা ডুরে শাড়ি, রঙ্গিন জামা, লম্বা বেণী, শীর্ণ দেহটাকে ঘিরে একটা ভাল লাগার ছোঁয়া দিয়ে যায়। তার চেয়ে ভাল লাগে ওর চোখের ভাষা আর মুখের হাসি।

ফুলটা দিয়ে ও যেন বলে, "এ শুধুমাত্র দেওয়া নয়, এ অন্তরের নিবেদন····তুমি যে লেখ ! —ওই দেওয়ার মধ্যে ওর মনের মধু যে খানিকটা মিশে যায় তা ও জানে না।

—ফুল আমি ভালবাসি। ফুল ভালবাসে না এমন লোক খুব কম।

কিন্তু আমার ভালবাসায় একটু পার্থক্য আছে। ভোরের শুকতারা যখন আকাশে···· শিউলিতলা থেকে ডাক আসতো·····চেয়ে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। সবুজে, সাদায়, কমলায় এক অপূর্ব্ব নক্‌শা। লাল গোলাপ যেমন ভাল লাগতো সেই রকম লাগতো পথের ধারে ঝরে পড়া কল্‌কে ফুলগুলো।

কিন্তু গন্ধরাজের মতো গন্ধ কোথায় ? ওকে নাম দিয়েছি দূরের মিতে। ও আড়াল থেকে ডাক পাঠায়, কাছে এলে বলে আমি তো নেই।

—অনেকবার চেষ্টা করেছি ওকে আমার ঘরে আনতে। কিন্তু প্রতিবারই তুড়ি মেরে বলেছে—'আমায় পাবে না।' তাই গন্ধরাজের ওপর টানটা বেশী।

সেবার কঠিন অসুখে পড়লুম। অনেকদিন আর যেতে পারিনি মেয়ের বাড়ি। সেদিন মেয়ে এল, হাতে এক গুচ্ছ গন্ধরাজ।

বললে—শ্যামলী তুলেছে তোমার জন্য। ...আমি আসব শুনে ও ছুটতে ছুটতে এসে আমার হাতে দিয়ে বললে—মাসীমাকে দিও, ভুলো না যেন....

চেয়ে আছি আমার ফুলদানীতে রাখা গন্ধরাজ গুলোর দিকে।

চোখের ওপর ভাসছে—একটি মেয়ে—তার রঙিন শাড়ী, লম্বা বেণী, মুখের হাসি, চোখের ভাষা সব মিলিয়ে সে সৌরভ ছড়াতে ছড়াতে মত্ত গন্ধরাজ হয়ে গেছে।

এমন সময় আমার আত্মীয় এল তার কন্যাকে নিয়ে। বিদেশে ঘুরে খেতাব নিয়ে এসেছে। আত্মীয়টি কন্যার গর্ব্বে গর্ব্বিত। কোন সংবাদ পত্রে তার টুশকির কথা কি ভাবে লিখেছে; সেই সব কথা বলতে আরম্ভ করলো।

শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে বলি, "মক্ষিকার মতো মধু তো সঞ্চয় করেছে, কিন্তু গন্ধরাজ কি হতে পেরেছে?"

আত্মীয়টি অবাক হয়ে বলে—তার মানে?

বলি—মানে কিছু নেই।

রাজপথ

রবি রঞ্জন চ্যাটার্জী

রাজপথ আমি, রাজপথ আমি
চলি সম্মুখ পানে
মহাভারতের মহাজন স্রোত
চলে বামে আর ডানে।
কেউ গেছে গেয়ে জীবনের গান
কেউ যৌবন রথে
মুখরিত করে আকাশ বাতাস
চলে গেছে এই পথে।
কত যে পথিক চলেছে এ পথে
সুদিনে, গহন রাতে
কত বীর, হেথা রুখেছে অরীরে
খোলা তলোয়ার হাতে।

কত রাজা, কত বীরের কাহিনী
কত কবিদের দুখ
রাজপথ আমি, কত কথা দিয়ে
ভরা আছে মোর বুক।
আমি যে দেখেছি নদের নিমাই
গেয়ে মিলনের গান
আমি যে শুনেছি নানক কবির
ধরেছে মধুর তান।
আজো মনে পড়ে, সেদিন, যেদিন
এসেছিল হেথা ধেয়ে
হুমায়ুন বীর, শত সেনা নিয়ে
ভগ্নীর রাখি পেয়ে।

সিঁদ কাটা

তপতী চক্রবর্তী

নিশাপতি সামন্ত পাশ ফিরে শুল। আগে দুটো বড়িতে কাজ হ'ত, এখন চারটে বড়িতেও ঘুম আসে না। কারবারের ঝামেলা যত বাড়ছে, ঘুম তেমনই কমছে। বড়িতে ভেজাল চালাচ্ছে কিনা ভগবান জানেন। বেশী বড়ি খেতেও সাহস হয় না। যদি হিতে বিপরীত হয়।

আর মজা এমনই, ঘুম না এলেই নানাবিধ শব্দ কানে আসে। বাইরের শব্দ তো আছেই, তাছাড়া ভিতরের আওয়াজ।

আরশুলা, টিকটিকি তার ওপর ইঁদুর। আগে নিশাপতি ওপরে শুত। মানে তিনতলায় মোজাইক মেঝে। তিনদিক বারান্দা। প্রকাণ্ড ঘর। সে ঘরে ইঁদুর আর আরশুলার উৎপাত ছিল না।

কিন্তু অদৃষ্ট। নিশাপতির হার্ট বিকল না হওয়াই আশ্চর্য। ইনকাম ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, রপ্তানির লাইসেন্সের ঝমেলা। তার ওপর সবাই হাত পেতে আছে।

গদিতে হেলান দিয়ে কথা বলতে বলতে নিশাপতি এক দুপুরে কাত হয়ে পড়ল।

ছুটোছুটি, বরফ, ডাক্তার। শেষকালে হাসপাতালে। ডাক্তার বলল স্ট্রোক। তবে হালকা ধরণের। সাবধানে থাকতে হবে। তিনমাস বিছানা আশ্রয়।

সেই থেকে নিশাপতি একতলায়। আগে এ ঘরে গরম মশলার বস্তা থাকত, সেসব সরিয়ে দেয়াল মেরামত করে, হালকা রংয়ের প্রলেপ দিয়ে শোবার ঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

স্ত্রী সত্যভামা ওপরে থাকে, তার শাড়ি গয়নার আলমারি সব ওপরে। সেসব ছেড়ে একতলার এই নরকে মরতে সে রাজী নয়।

তবে রাতের দিকে একবার করে স্বামীর খোঁজ নেয়। তার বেশী অবশ্য সম্ভব নয়। কারণ আড়াইমনি শরীর নিয়ে একবারের বেশী ওঠানামা করা দুরূহ।

নিশাপতির তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ খুট করে শব্দ হতে ঘুম ভেঙে গেল।

ইঁদুরের উপদ্রব বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু একটানা এরকম শব্দ কি ইঁদুরে করে।

মনে হচ্ছে কে যেন শাবল দিয়ে বাইরের দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে।

বাইরে অবশ্য দুজন দারোয়ান শোয়। একজন ঘুমোবে, আর একজন জাগবে, এই নিয়ম।

কিন্তু এদেশে নিয়ম মাফিক আর কোন কাজটা হচ্ছে? দুজনেই নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে—সেটা নিশাপতি ভালই জানে।

এ নিয়ে ঝামেলা করে লাভ নেই। কেউ দোষ স্বীকার করবে না।

দরকারের সময় জাগলেই হ'ল। একটানা শব্দ। বিরতিহীন। ঠিক যেন সিঁধ কাটছে।

কথাটা মনে হতেই নিশাপতি বিছানার ওপর উঠে বসল। পা দিয়ে মেঝেতে ঠুক্ ঠুক্ করে আওয়াজ করল।

ইঁদুর হলে চলে যেত, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও। কিন্তু না, শব্দ সমানে চলল।

নিশাপতির পক্ষে আর শুয়ে থাকা সম্ভব হল না। উঠে দাঁড়াল, তারপর পা টিপে টিপে দরজার কাছে এল।

সাবধানে দরজা খুলল, একটু আওয়াজ না করে। রাস্তার আলো কিছুটা রোয়াকের ওপর এসে পড়েছে। তাতে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল দুজন দারোয়ান চৈতন আর মুন্না সিং দুপাশে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

ডাকবার আগে নিশাপতি আর একবার কান পেতে শুনল। আওয়াজ একভাবে চলেছে।

একটু ঝুঁকে পড়ে নিশাপতি চাপা গলায় ডাকল। মুন্না, ও বাবা চৈতন।

দুজনেরই ঘুম তরল বলতে হবে। চাপাস্বরে ডাকতেই ধড়মড় করে উঠে বসল।

বাবু!

ওরে, পিছনের দেয়ালে চোরে সিঁদ কাটছে আওয়াজ পাচ্ছিস না।

আওয়াজ শোনার চেষ্টা না করেই দুজনে লাফ দিয়ে দাঁড়াল।

নিশাপতি আবার বলল, ওরে আস্তে আস্তে বাইরের দিকে যা। দেখ আর শব্দ পাচ্ছি না। বুঝি পালাল।

আর বলতে হ'ল না। পা টিপে টিপে দুজনে বেরিয়ে গেল।

পিছনে সরু একটা সড়ক। কর্পোরেশনের আলো একটা আছে বটে কিন্তু সে আলো বেশীর ভাগ দিনই জ্বলে না। সড়ক এত অপ্রশস্ত যে রিক্সাও চলে না। ফলে, দিনের বেলাতেই লোক চলাচল কম। বাড়ীর নল থেকে জল পরে কিছুটা জায়গা কর্দমাক্ত। সেখানে কিছু আগাছা জন্মেছে।

সেই আগাছার পিছনে কে একজন উবু হয়ে বসে রয়েছে। লোকটার সাড়া নেই। পিছনে দুটো জোয়ান এগিয়ে আসার শব্দও তার কানে গেল না।

কে রে ওখানে?

একবারে কাছে গিয়ে চৈতন গর্জন করল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চমকে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপরে প্রাণপণে ছুট।

কিন্তু ছুটতে আর হ'ল না। পিছনে মুন্না ছিল। হাতে লাঠি। সে লাঠিটা ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল লোকটাকে লক্ষ্য করে। বাবা বলে একটা আর্তনাদ, তারপর ধপাস করে আওয়াজ।

লোকটা ছিটকে রাস্তার ওপর পড়ে গেল।

রোগা পাঁজরা জর্জর দেহ। গায়ে ময়লা একটা গেঞ্জি আর পরনে লুঙ্গি। হাতের সরু শাবলটা কিছুটা দূরে রাস্তার ওপর।

লাঠির ঘায়ে পা থেকে দর দর করে রক্ত পড়ছে। চৈতন চুলের মুঠি ধরে লোকটাকে টেনে তুলল। আর মুন্না তার গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের এক চড় দিল।

লোকটা আবার ছিট্‌কে পড়ে যেত কিন্তু চৈতনের হাতে তার চুলের মুঠি ধরা থাকায় লোকটা পড়ল না।

মুন্না সরু শাবলটা কুড়িয়ে নিয়ে লোকটার গলা ধাক্কা দিয়ে বলল, চোর কোথাকার।

কথা শেষ হবার আগে আবার একটা চড়।

এবার লোকটা হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল, আর মারবেন না একেবারে মরে যাব।

চৈতন হেসে বলল, ওরে মারিস না। বাবুর কষ্ট হচ্ছে। তার চেয়ে বাজারের দিকে নিয়ে চল, যদি দোকান খোলা থাকে তাহলে বেলফুলের একটা মালা গলায় ঝুলিয়ে দেব।

মুন্নাও হেসে উঠল।

তারপর দুজনে লোকটার গলাধাক্কা দিতে দিতে তাকে বাড়ীর দিকে ঠেলে নিয়ে চলল।

নিশাপতির বেশী দৌড় ঝাঁপ ডাক্তারের নিষেধ।

কিন্তু নিশাপতি একেবারে রাস্তার উপর এসে দাঁড়িয়েছে। হাতের টর্চ এদিক ওদিক ফেলতে ফেলতে চেঁচাচ্ছে, কি হল রে, ধরতে পারলি নাকি।

চৈতন উত্তর দিল, আজ্ঞে যাবে কোথায়, ধরেছি।

নিশাপতির উৎফুল্ল কণ্ঠ শোনা গেল, ধরেছিস্। দলে কজন ছিল।

আপাতত একজনকে তো ধরলাম।

আর সব পালাল বুঝি ? তোরা একেবারে কোন কর্মের নয়।

কোন কথা না বলে চৈতন আর মুন্না টানতে টানতে লোকটাকে একেবারে নিশাপতির সামনে হাজির করে দিল।

নিশাপতির টর্চের আলো লোকটার মুখে। ছোট কুতকুতে চোখ, উঁচু চোয়াল, পুরু ঠোঁট, কপালের নীচে একটা কাটা দাগ। দুটো হাত বুকের ওপর মোড় করা। নিশাপতি এগিয়ে এল লোকটার কাছ বরাবর।

মুন্না শাবলটা তুলে ধরল।

ওরে বাবা, কি সর্বনেশে লোকরে। দেখ, দেখ, ভাল করে দেখ, কোথাও ছোরা টোরা লুকানো আছে কিনা।

চৈতন টেনে লোকটার গেঞ্জি ছিঁড়ে দিল, লুঙ্গি খুলে খানাতল্লাসী। না, কোথাও কোন অস্ত্র লুকানো নেই।

নিশাপতি নীচু হয়ে নিজের পায়ের চটি খুলে নিল। তারপর পটাপট—চটির ঘা লাগাতে লাগাতে বলল। আর কে সঙ্গে ছিল? কেন সিঁধ কাটছিলি?

চটিতে বোধহয় পেরেক ছিল। সেই পেরেকের আঁচড়ে লোকটার মুখে রক্তের আলপনা ফুটে উঠল।

লোকটা দু'হাতে মুখ চেপে নিশাপতির পায়ের কাছে বসে পড়ল। বিশ্বাস করুণ বাবু সঙ্গে কেউ ছিল না। তিন দিন না খেয়ে আছি। এক টুকরো রুটির জন্য সিধ কাটছিলাম।

নিশাপতি গর্জন করে উঠল, বেটার কথা শোন। ভিক্ষে করতে নবাব পুত্তুরের মান যায়। রুটির জন্য সিঁধ।

সত্যি বলছি বাবু ভিক্ষে আজকাল কেউ দেয় না। দুটি বাড়িতে পায়ে গরম জল ঢেলে দিয়েছে। এই দেখুন ফোস্কা।

একে বাড়ির মধ্যে নিয়ে আয়। হুকুম দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে নিশাপতি নিজে বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

ততক্ষণে চেঁচামেচিতে বাড়ীর সবাই উঠে পরেছে।

সত্যভামা প্রথমে দরজা দিয়ে সোজা নীচে নেমে এসেছে।

একেবারে নীচে নামতে পারেনি। সিঁড়ির ধাপের ওপর বসে হাঁপাচ্ছে।

চোরকে ঠিক তার নজরে পড়েনি। নিশাপতির হাঁক ডাকে সে চিন্তিত হয়ে পড়ছে।

যে লোকটির উত্তেজিত হওয়া বারণ, শুধু ওষুধের উপরে খাড়া রয়েছে—তার এই সিংহ-বিক্রমের কারণ কি?

পরে রীতাও উঠেছে। সে নীচে একেবারে বাবার শোবার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হিন্দী সিনেমা ছাড়া চোর দেখেনি।

আসল চোর দেখবার আনন্দে সে একটী চেয়ারে বসে পড়ল।

আগে নিশাপতি ঘরে ঢুকল। তারপর পিছনে চৈতন আর মুন্না। মাঝখানে লোকটা।

ঘরে ঢুকে মুন্না শাবলটা টেবিলের ওপর রাখলো। নিশাপতি একবার চোখ বুলিয়ে ঘরের অবস্থাটা দেখে নিল। মেয়েকে দেখে বলল, কিরে তুই উঠে এলি কেন?

রীতা ভ্রু-কোঁচকাল। বাঃ, ঘরে চোর ঢুকেছে, আর শুয়ে থাকব।

নিশাপতি হাত দিয়ে কপালের কল্পিত ঘাম মুছে বলল, উঃ ভগবান বাঁচিয়েছেন।

ততক্ষণে সত্যভামা নেমে এসেছে, দরজার কপাট ধরে কিছুক্ষণ হাঁপ ছেড়ে বলল, কোন ঘরে সিঁদ কেটেছে?

রান্নাঘরে।

রান্নাঘরে? রান্নাঘরে কেন?

বলছে তো এক টুকরো রুটির জন্য।

সত্যভামা চেয়ারে বসল। চেয়ারটা আর্তনাদ করে উঠল।

ওসব বাজে কথা, রান্নঘর দিয়ে অন্য ঘরে ঢুকত। তোমাকে বললাম সিঁড়ির কাছে একটা দরজা বসাও। যাতে উঠকো লোক ওপরে উঠতে না পারে।

নিশাপতি সত্যভামার কথায় কোন উত্তর দিল না। খাটের পাশে রাখা টেলিফোন ডায়াল করল।

তারপর রিং হতে বলল, ও সি, বসাককে একবার দিন।

তারের অপার প্রান্তে বসাক। গম্ভীর কণ্ঠের হ্যালো শোনা গেল।

আমি নিশাপতি সামন্ত। আপনি শিগগীর চলে আসুন চোর ধরা পড়েছে। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বাড়ী। না কিছু নিয়ে যেতে পারেনি। তার আগেই ধরে ফেলা হয়েছে।

কথা শেষ করে সত্যভামা আর রীতার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, থানার ও সি আসছেন, যাও তোমরা অন্য ঘরে।

সত্যভামা এখনই উপরে যেতে নারাজ। সে মেয়েকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল মাঝখানে জানালা। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে এ ঘরের দৃশ্য দেখার পক্ষে কোন অসুবিধা নেই।

একটু পরেই বাইরে জীপের শব্দ হল।

বসাক দুটো পুলিশ নিয়ে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই একটু থমকে দাঁড়াল।

লোকটার মুখে রক্তাক্ত আঁচড়। পা দিয়েও বেশ রক্ত ঝরছে।

বসাকের দৃষ্টি অনুসরণ করে নিশাপতি দেখল তারপর বলল, বেটা পালাতে গিয়ে পড়ে গেছে। সঙ্গে আরও লোক ছিল, তাদের নাম বলছে না।

বসাক এবার উত্তেজিত হ'য়ে উঠল, আমাদের হাতে ছেড়ে দিন না। বাপ বাপ বলে সঙ্গীদের নাম বলবে।

কথাটা বলেই বসাক সঙ্গের পুলিশদের ইশারা করল।

লোকটার পিঠে সজোরে একটা লাঠি এসে পড়ল।

বাবারে বলে লোকটা হুমড়ি খেয়ে মেঝের উপর পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলো।

কি নাম? থাকিস কোথায়?

লোকটা বহুকষ্টে উঠে বসে হাতজোড় করে বলল আজ্ঞে পুঁটিরাম। আমার কোন সঠিক আস্তানা নেই।

এ শাবল পেলি কোথায়?

আজ্ঞে মজুররা কাজ করছিল ইষ্টিশানের ধারে, সেখান থেকে তুলে নিয়ে এসেছি।

এ বাড়ির সিঁদ কাটছিলি কেন?

যেতে যেতে রুটির গন্ধ নাকে এল। তিনদিন পেটে কিছু পড়ে নি। মনে করলাম এমনিতে তো কেউ দেবে না হুজুর, তাই গর্ত করছিলাম।

হুঁ। বসাক উঠে দাঁড়িয়ে নিশাপতির দিকে ফিরে বলল, চলুন যে ঘরে সিঁদ কাটছিল, সে ঘরটা একবার দেখে আসি।

বসাকের সঙ্গে নিশাপতি রান্নাঘরের দিকে ঢুকল।

পশ্চিমদিকের দেয়ালে বেশ কিছুটা গর্ত! দুটো ইঁট গলানো হয়েছে। কিছু বালি আর সুরকি।

একটু পরে বসাক লোকটাকে টানতে টানতে জীপে নিয়ে গিয়ে উঠল। নিশাপতি ভেবেছিল পুলিশ টানা হ্যাঁচড়া করলে লোকটা কান্নাকাটি করবে নিশাপতির পা জড়িয়ে।

কিন্তু সেরকম কিছুই করল না। বোধহয় এই ভেবে সে চুপ করে রইল যে হাজতে সম্ভবত যেতে হবে।

নিশাপতি ঘরে ঢুকে দেখল বসাক ছোট শাবলটা ফেলে গেছে।

কাল সকালে এই শাবলটার জন্য হয়তো আবার একজন পুলিশকে পাঠাবে।

নিশাপতি শাবলটা নিজের হাতে তুলে নিল। উঁকি দিয়ে দেখল চৈতন আর মুন্না দুজনেই শুয়ে পড়েছে।

সত্যভামা শুধু দাঁড়িয়ে আছে, ওপরে উঠবার আগে দম নিচ্ছে।

নিশাপতি ফিসফিস করে বলল দাঁড়াও কথা আছে।

কি কথা?

বলছি।

নিশাপতি সন্তর্পণে একবার বাইরে দেখল। চৈতন্য মুন্না ঘুমিয়ে পড়েছে, নাকের গর্জনও শোনা যাচ্ছে।

বরাত বটে, ঘুমের বড়ির দরকার হয় না।

নিশাপতি হাত নেড়ে সত্যভামাকে ডাকল।

বিস্মিত সত্যভামা ধীর পায়ে নিশাপতির পিছন পিছন রান্নাঘরে এল।

আমি একটা কথা ভাবছি। সত্যভামার কথায় নিশাপতি চাপা গলায় বলল, আহা লোকটাকে বয়েকখানা রুটি দিলেই হতো।

পলকে নিশাপতির মুখ কঠিন হয়ে উঠল। খাঁজ পড়ল কপালে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল আর একটু হলে লোকটা আমার সর্বনাশ করত।

নিশাপতি জামা খুলে ফেলল। পাজামা গুটিয়ে নিল হাঁটু পর্য্যন্ত।

তারপর সত্যভামাকে অবাক করে দিয়ে ছোট শাবলটা নিয়ে দেয়ালে ঠুকতে লাগল।

ঠিক লোকটা যেখানে গর্ত করছিল তার একটু উপরে।

ঝুপ্ ঝুপ্ করে দেয়ালের চুণ খসতে লাগল।

তারপর নিশাপতি নীচু হয়ে টিনের একটা বাক্স বার করলে।

এগুলো অন্য জায়গায় সরিয়ে রাখতে হবে।

সত্যভামা প্রশ্ন করল কি আছে ওতে ?

নিশাপতি বাক্সর ডালা খুলে ফেলল। থাক থাক নোট সাজানো একশো টাকার।

নিশাপতি মুখ তুলতেই সত্যভামা চমকে উঠল।

অল্প পাওয়ারের আলোয় নিশাপতিকে অবিকল সিঁদ কাটা লোকটার মত মনে হচ্ছিল।

কিন্তু নিশাপতি কার টাকা অপহরণ করছে, নিজের টাকা নিজে সিঁদ কেটে।

আবিষ্কার

দেবাশিস্ দাশ

হঠাৎ আমি তাকে আবিষ্কার করলাম :
আবিষ্কারের আনন্দে মানুষ—যেমন
নৃত্য করে,

ঠিক তেমনি।
তার শাড়ির আঁচল যখন আমাকে
স্পর্শ করলো—
শুধু এইটুকু মাত্র ···

খুঁজে পেলাম না ভাষা—খুঁজে পেলাম না
নিজেকে !

মনে হলো—
স্বর্গ এর চেয়ে বেশি কিছু কি !!

তার শাড়ির আঁচলে
খুঁজে পেলো ঈশ্বর, ঈশ্বরীকে !!!

নিজের ফাঁদে

সতীদেবী মুখোপাধ্যায়

তখনও চারিদিক পরিস্কার হয়নি। আশ্বিনের সূর্য্য যেন আলস্য কাটিয়ে উঠতে পারছে না আকাশের বুকে।

সোমনাথের ঘুম ভেঙে গেলেও শুয়ে আছে। ভাবছে, অনেক কিছু কেনবার আছে, শীতের মুখে দার্জ্জিলিংয়ে যাওয়া মানে গরম জামা কাপড় বিশেষ দরকার। তবে তার জন্যে আটকাবে না। বিস্তর গরম পোষাক আছে। সেগুলি গুছিয়ে নেওয়া। বোনের কলেজ আছে; সে কি গুছিয়ে দেবার সময় পাবে? কাজেই আজ সারাদিন অনেক কাজ। প্লেনের টিকিট কাটা হয়নি সেটাই সব আগে করতে হবে। শুধু দার্জ্জিলিং হলে অত চিন্তার কথা হোত না। গ্যাংটক ফালুট মিরিক সব কিছু দেখে আসবার কথা ভেবে রেখেছে সোমনাথ।

কাজেই ফর্দটা হয়েছে বেশ লম্বা।

উঠে বসে হাই তুলছে, ছোট বোন মালা এসে বললে—

—দাদা তাড়াতাড়ি এসো। বাবা ডাকছে তোমাকে।

—বাবা ডাকছে! হাইটা মাঝপথেই আটকে গেল তার।

সোমনাথের বাবার মত বদ মেজাজী মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। তাঁর মতের বিরুদ্ধে কেউ এতটুকু প্রতিবাদ করলে সেকালের দুর্বাশা মুনির মত রেগে গিয়ে জিনিষপত্র ভেঙে তছনছ করতেন। সেই সময় কেউ পারত পক্ষে সামনে থাকতো না। সে সাহসও কারুর ছিল না।

সকলে তাঁকে যম বা বাঘের মত ভয় করে। এটাতে বিশ্বনাথবাবু রীতিমত গর্ব্বিত। ছেলে মেয়ে ছোট থেকেই সাধ্যমত বাপকে এড়িয়ে চলে। সব কিছু আবদার ওদের মায়ের কাছে। ছোট বেলাকার ভয় বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে সঙ্কোচে। বড় সোমনাথ পড়া শেষ করে বড় এক কম্পানীতে উচ্চ পদেই কাজ করে। এখনও বাবার কাছে সে সহজ হতে পারে না। কাজেই ভোর বেলাতেই বাবা ডাকছেন শোনাটা ওর কাছে শ্রুতিমধুর লাগেনি।

ভুরু কুঁচকে বললে—এই সাত সকালে কি এমন জরুরী প্রয়োজন হোল?

মালা দুষ্টু হাসির সঙ্গে বললে—তা আমি কি জানি?

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সোমনাথ বললে—সন্দেহ জনক মনে হচ্ছে।

হাসতে হাসতে মালা বললে—তোমাকে আজ দেখতে আসবে?

—দেখতে আসবে আমাকে! আমি কি আজব চিজ! তাই আমাকে দেখতে আসবে। ও সব হবে না।

মালা হাসি থামিয়ে বললে—আমাকে বলে লাভ নেই। বাবাকে নিজে গিয়ে বলো। মাকে কিন্তু এর ভেতর জড়িও না।

পাশ বালিসটার ওপর হেলে বসে সোমনাথ বললে—লক্ষ্মীটি মালা ; কি ব্যাপার খুলে বল।

মালা বললে—বাবা ঠিক করেছেন এবার তোমার বিয়ে দেবেন। পাত্রীও দেখে পছন্দ করে ফেলেছেন। তাঁরাই আজ সাড়ে নটা-দশটার সময় তোমাকে দেখতে আসবেন।

কথাটা বলেই মালা চলে যাবার পর সোমনাথ আবার শুয়ে পোড়লো।

খোলা জানলা দিয়ে সকালের সোনালী রোদ বিছানার ওপর আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে। একটা চড়ুই পাখী উ'ড় এসে ঘরের ভেতর এক পাক ঘুরে আবার জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সোমনাথ সেই দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলে উঠলো—আমি কিছুতেই এখন বিয়ে কোরবো না। এতো আমার ওপর রীতিমত জুলুম। উনি ওঁর ইচ্ছে মত 'বিয়ে কর' বললেই আমাকে বিয়ে করতে যেতে হবে! সব বিষয়ে একটা প্রস্তুতি আছে সেটা উনি বুঝবেন না—বুঝতে চাইবেনও না। না, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে কোরবো না। আমি কাল দার্জ্জিলিং যাচ্ছি, বিয়ের কথা ভাববার সময় নেই। কিন্তু যাবো তো কাল, আজকের উপায় কি? একটা উপায় আছে সারাদিন বাড়ীতে না থাকা। বাবা রাগ করবেন? করুন যত খুশী। নিজের ইচ্ছেমত চলতে গিয়ে বাইরের লোকের কাছে বেশ অসুবিধের পড়বেন—সেকথা স্মরণ কোরে সোমনাথ আনন্দে লাফিয়ে উঠে পোড়লো। আর দেরী নয়, কেউ দেখে ফেললে আর পালানো যাবে না।

সামনে যে সার্টটা ছিল তাড়াতাড়ি গায়ে দিয়ে মানিব্যাগটা পকেটে পুরে চটি পায়েই রাস্তায় বেরিয়ে এল। গেটের কাছে দরওয়ান তখনও হাজির হয়নি কাজেই চুপচাপ বড় রাস্তায় এসে সামনেই ৫ নম্বর বাস পেয়ে লাফিয়ে বাসে উঠে পোড়লো। যোধপুর পার্কে তার ঘনিষ্ট বন্ধু অনিল থাকে, তার কাছেই আগে যাওয়া যাক্। তারপর কি করবে সেটা পরে চিন্তা করা যাবে।

যোধপুর পার্কে অনিলের বাবা সম্প্রতি সুন্দর একটি বাড়ী করেছেন। তিনি কন্ট্রাক্টর, ছেলেকেও নিজের লাইনে এনেছেন। বুদ্ধিমান ছেলে অল্পদিনেই এ বিষয়ে বাবার ডানহাত হয়ে উঠেছে।

বাইরের ঘরে বসে সবেমাত্র ফাইল খুলেছে, সোমনাথ হুড়মুড় কোরে ঘরে প্রবেশ কোরে টেবিলের ওপর রাখা ধুমায়িত চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বড় বড় চুমুকে চা শেষ কোরে ঠক কোরে কাপটা নামিয়ে রেখে মস্ত নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে বসে পোড়লো।

অনিল ততক্ষণ অবাক হয়ে ওর পানে তাকিয়ে ছিল। এবার ফাইলটা একপাশে সরিয়ে রেখে প্রশ্ন করলে—কি ব্যাপার! তোর চেহারা আর ধরণ ধারণ দেখে মনে হচ্ছে কি একটা ঘটেছে। বাড়ীর খবর ভাল তো।

সোমনাথ পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বললে—আন্দাজ কর দেখি কি ঘটতে পারে?

CENTRAL LIBRARY

অনিল থেমে থেমে বললে—পাঁচছয় দিন দাড়ি কামাস নি, এলো মেলো চুল, আধময়লা সার্ট, তোকে কোনদিন এমন আগোছালো দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। কোন কি মানে····

—না না সে সব কিছু নয়। মানে আজ আমাকে দেখতে আসবে। আমি যেন আজব কিছু, তাই·····

অনিল হাসতে হাসতে বললে · তাই তুই বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিস। আরে—না দেখলে চলবে কেন? কার হাতে মেয়ে দিচ্ছেন সেটা পাত্রীপক্ষ একবার দেখে নেবেন না? তুই ভেবে দেখ, আমরা যখন পাত্রী দেখতে যাই কত ভাবেই না মেয়েটিকে পরীক্ষা করি। বাজারে তরকারী কিনতে গেলে যেভাবে বেছে নেয় মানুষ—আমার মনে হয়—

বাধা দিয়ে সোমনাথ বললে—ওসব কথা এখন থাক। এখন কি কোরবো সে বিষয়ে পরামর্শ করা দরকার। বাবা নিজের খেয়াল খুসী মত পাত্রী দেখে এসেছেন, এবং আমাকে দেখবার জন্যে তাঁদের বলেও এসেছেন এ বিষয়ে আমার মায়ের সঙ্গেও কথা বলার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি। আজ বাইরের লোকের কাছে অপ্রস্তুত হবেন ভেবে আমার বেশ ভালই লাগছে।

অনিল বললে—না না ওসব বুদ্ধি ভাল নয়। কখন আসবেন তাঁরা?

—কটা বেজেছে? সোমনাথ প্রশ্ন করলে।

দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অনিল বললে—প্রায় সাড়ে নটা বাজে।

সোমনাথ হেসে বললে—ব্যস সময় কাবার। সাড়ে নটা দশটার সময় আসবার কথা ছিল।

অনিল বিরক্ত হয়ে বললে—ছিঃ ছিঃ কাজটা ভাল করিস নি সোম। আমাদের গাড়ী থাকলে, তোকে এখনি পৌঁছে দিয়ে আসতে পারতুম। বাবা সকালেই গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছেন। বাসে গেলে পৌঁছতে পারা যাবে না। ট্যাক্সি পেলে ভাল হয়। আয় দেখি ট্যাক্সি পাওয়া যায় কিনা।

অনিল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে একটি যুবক বেরিয়ে অনিলকে বললে—অনিল, মামীমাকে বলে এলুম বামুন ঠাকুরের কথা, তুইও মনে করিয়ে দিস।

—কেন তোদের বামুন ঠাকুরের কি হোল?

—সে তো দু মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ী গেছে। যাকে বদলী দিয়ে গেল সেটা দিন সাতেক কাজ করেই চুপচাপ পালিয়েছে। যাকে তাকে রাখা যায় না, যা দিনকাল! অথচ মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে।

সোমনাথ নিবিষ্ট মনে ওদের কথা শুনছিল, এবার এগিয়ে এসে বিনীত ভাবে বললে, আমাকে রাখবেন?

অনিল আশ্চর্য্য হয়ে বললে—এই তুই·····

সোমনাথ অলক্ষ্যে অনিলের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে চুপ করে থাকতে বললে।

যুবক অনিলের পিসতুতো দাদা। নিউ আলিপুরে থাকে। সোমনাথের কথা শুনে অনিলের পানে তাকিয়ে বললে, তোর চেনা লোক নিশ্চয় !

অনিল কি বলবে ঠিক কোরতে না পেরে ঘাড় নেড়ে চুপ চাপ থাকে। সোমনাথ বিনীত ভাবে বললে—উনি আমাকে ছোট থেকেই চেনেন। আমার হাতের রান্না উনি ভীষণ পছন্দ করেন আজ্ঞে।

এতক্ষণে অনিলের সম্বিৎ ফিরে এসেছে। সে ভাবলে বাবুর য়্যাডভেঞ্চারের সখ হয়েছে, একটু জব্দ হোক। বললে—তোর কোন চিন্তা নেই বিনয়। ওকে তুই পিসিমার হাতে সমর্পণ কর। তিনি ওকে ঠিক মত চালিয়ে নেবেন। কিহে লোকনাথ কাজ কাজ করছিলে কাজ পেয়ে এবার খুশী তো !

সোমনাথ হাসিমুখে বললে, আপনার অনেক দয়া !

বিনয়ের খুব পছন্দ হয়েছে, বললে, তোমার নাম কিহে !

—আজ্ঞে আমার নাম লোকনাথ। তাহলে কবে যাবো বলুন।

পাছে হাতছাড়া হয়ে যায় সেই ভেবে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো কবে কিহে ! এখনি চল আমার সঙ্গে। জামা কাপড়ের জন্যে চিন্তা নেই এখনকার মত ব্যবস্থা করা যাবে, পরে তুমি সুবিধে মত নিয়ে এস।

বিনয়ের পিছু পিছু সোমনাথ গাড়ীতে পিছনের সিটে গিয়ে বোসলো।

ব্যাপারটা তার কাছে খুবই উপভোগ্য মনে হোল। মস্ত না হলেও সে একজন অফিসার, এখন রাঁধুনী বামন সেজে চলেছে। দেখা যাক কদিন।

ওকে দেখে বিনয়ের মা প্রতিমা দেবী বিস্মিত ভাবে চেয়ে রইলেন। বিনয় কাছে এসে বললে অনিলের চেনা লোক। মাইনের কথা কিছু হয়নি ওসব তুমি ঠিক কোরে নিও মা।

সোমনাথ বললে—মাইনে যাহোক দেবেন। আগে রান্না কেমন করি খেয়ে দেখুন পছন্দ হয় কিনা।

প্রতিভা দেবী তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এই ছেলে রান্না করতে এসেছে ! দেখলে অভাবী ঘরের ছেলে মনে হয় না ! বোধহয় অভাবে পরে চাকরী করতে বেরিয়েছে, লেখা পড়াও মনে হয় বেশী দুর শেখেনি।

তাঁর মনের কথা বুঝে সোমনাথ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো. লেখাপড়া সামান্য জানি, তাতে কি মা চাকরী পাওয়া যায় !

ভারি মায়া পরে গেল প্রতিভাদেবীর। বিনয় ফিরে এসে বললে—মা ওর জামা কাপড় কিছুই আনতে দিইনি, দেরী হবে বলে, ওকে ধুতী গেঞ্জি তোয়ালে দিয়ে দিও।

ছোটবেলা থেকেই সোমনাথের রান্না করার সখ। নতুন নতুন রান্না কোরে সকলকে খাওয়াতে পছন্দ করে সে। প্রতি বছর বাইরে কোথাও চেঞ্জে গেলে সোমনাথ স্বেচ্ছায় রান্নার দায়িত্ব নিয়েছে। কাজেই এখানে তার রান্না করতে কিছুই অসুবিধে হোল না।

বাবাকে বেশ অসুবিধেয় ফেলেছে ভেবে খুশী হোল সে। দুপুরে খাবার পরিবেশন করতে এসে এই প্রথম বেশ বিব্রত ও সঙ্কুচিত হয়ে পরলো। এ দিকের কথা তার একবারের জন্যেও মনে পড়েনি।

প্রতিভাদেবীর তিন মেয়ে দুই ছেলে। বড় ছেলে বিনয় হাইকোর্টের য়্যাডভোকেট। ছোট ছেলে অজয় টাটার ডাক্তার। জামসেদপুরে থাকে।

বড় মেয়ে শ্রীমতীর বিয়ে হয়েছে গত বছর। পাত্র রাজীব ইঞ্জিনিয়ার দিল্লীতে থাকে। মেজ মেয়ে জয়ন্তী এম. এ পড়ছে. ছোট মেয়ে আরতি এখনও স্কুলে পড়ে।

সোমনাথকে দেখে দুবোনের মুখে প্রথমটা কথা সরলো না। সে চলে যেতে আরতি বলে উঠলো—ওমা এ যে দেখছি বাবু ঠাকুর। কোথা থেকে একে তুমি জোগাড় কোরলে মা?

প্রতিভা দেবী হাসিমুখে বললে—তোদের মামিমা দিয়েছেন।

জানো মা, ওকে রান্নার কাজের চেয়ে আমার টিউটর হলে মানাতো ভাল। তাই না ছোড়দি!

জয়ন্তী হেসে বললে – তা ঠিক বলেছিস, তবে তোকে পড়াবার মত বিদ্যে আছে কিনা বিবেচ্য।

ওকে মানাতো·····

সোমনাথকে আসতে দেখে জয়ন্তী থেমে গেল।

আরতি বললে—ঠাকুর তোমার নাম কি?

সোমনাথ সপ্রতিভ ভাবে বললে আমার নাম লোকনাথ।

আরতি বলে—ইস! ঠাকুর তোমার নামটা দারুণ! কি বলিস ছোড়দি! আচ্ছা লোকনাথ তুমি কতদূর লেখা পড়া কোরেছো?

সোমনাথ নিরীহ ভাবে বললে—বেশী শিখিনি লেখাপড়া। আপনি আমাকে পড়াবেন?

আরতি খাওয়া বন্ধ কোরে বললে—তুমি পড়বে আমার কাছে? ঠিক আছে তোমাকে পড়াবো কিন্তু দিন কতক পরে। এখন আমার পরীক্ষা হবে শিগ্‌গির তাই—আমার একটুও সময় নেই বুঝলে।

সোমনাথ হাসিমুখে বললে—ঠিক আছে দিদিমণি।

রাত্রে সোমনাথ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘটনাটা আগাগোড়া ভাবছিল। বাবাকে জব্দ কোরতে গিয়ে নিজেই বুঝি জব্দ হয়ে যাবো। তার বন্ধুর যে বোন আছে সেটা আগে খেয়ালই হয়নি। মেয়েদের রীতিমত ভয় করে। কে জানে কখন কি ঘটবে? অবশ্য অনিলের পিসতুতো বোন দুটিকে দেখলে ভয় পাবার মত মনে হয় না। বড় জয়ন্তী তো তার সঙ্গে কথাই বলেনি। কিন্তু তবু মনটা খুঁত খুঁত করে। তার চেয়ে মানে মানে সরে পড়াই যুক্তি সঙ্গত।

চাকরীর তৃতীয় দিনে বিকেলবেলা সোমনাথ রান্নাঘরের সিঁড়ির উপর বসে বই পড়ছে—এমন সময় প্রতিভাদেবী ওকে ডাকতে বই রেখে সোমনাথ উঠে গেল।

ঠিক সেইসময় জয়ন্তী খাবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল, নজরে পরলো বই। এগিয়ে গিয়ে পাতা উল্টে দেখলে বিদেশী নাম করা সাহিত্যিকের বই সেটা। প্রথম পাতাতে যার বই তার নাম লেখা আছে সোমনাথ।

বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি বই রেখে ফিরে এল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথ বেরিয়ে এসে বইটা তুলে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

তাড়াতাড়িতে সে জয়ন্তীকে লক্ষ্যই করেনি।

জয়ন্তীর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। প্রায় নিরক্ষর বামুনের হাতে ইংরেজী নভেল! তবে কি ও লেখাপড়া জানে? কিন্তু তাই যদি জানবে, তাহলে সামান্য রান্নার কাজ করতে আসবে কেন?

কত কি ভাবতে ভাবতে চলে আসছে, অনিলের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে হেসে বললে—কি ব্যাপার অনিলদা পথ ভুলে এসেছো বলে মনে হচ্ছে?

ওর মাথায় মৃদু টোকা দিয়ে অনিল বললে—পথ ভুলে? কেন আমি কি আসি না তোদের দেখতে! এই তো কদিন আগেই—ভাল কথা, লোকনাথ কেমন কাজকর্ম্ম করছে রে?

—রান্না খুবই ভাল। তবে.....

অনিল উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করলে—তবে কি? কিছু কি...

ওর কথা শেষ হবার আগেই প্রতিভাদেবী এসে বললেন—ওরে অনিল তুই এসেছিস খুব ভাল হয়েছে। সেই ভদ্রলোক এসেছেন যাঁর ছেলের সঙ্গে জয়ার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। উনি একটু বেরিয়েছেন। তুই গিয়ে একটু দেখ বাবা। অবশ্য বিনয় কথা বলছে।

—যাচ্ছি পিসিমা। বিনয়দা আছে তো পিসেমশাই না থাকলেও কোন অসুবিধে হবে না। ছেলেটি কি করে? সবকিছু ভালমত খোঁজ খবর নিয়েছো তো?

পিসিমা তাড়া দিলেন। সব কথা পরে শুনিস। চা জল খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুই দেখে শুনে টেবিলে সাজিয়ে দিস।

—ঠিক আছে আমি যাচ্ছি।

ওকে দেখে বিশ্বনাথবাবু ভীষণ খুসী হয়ে বললেন—এই যে অনিল তুমি এখানে? তোমাকে আমি কদিন থেকে খুঁজছি, কি ব্যাপার বলতো?

আজ্ঞে কিসের ব্যাপার?

ঐ যে তোমার বন্ধুর খবর কিছু জানো কি? হঠাৎ কোথায় গেছে, কিছুই বলে যায় নি। বাড়ীতে আমরা সবাই বেশ চিন্তায় আছি। তুমি কিছু জানো কি? কোথায় গেছে।

অনিলের পিসেমশাই ঘরে প্রবেশ করে বললেন, নমস্কার দাদা কেমন আছেন?

—ভাল আছি...তবে ইয়ে, অনিলকে আপনি চেনেন?

অনিলের পিসেমশাই পরেশবাবু হাসিমুখে বললেন,—অনিল আমার শালার ছেলে। বড় ভাল ছেলে অনিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিশ্বনাথবাবু বললেন, ওকে আমি খুব ভালরকম জানি। আমার ছেলের সঙ্গে ছোট থেকেই বন্ধুত্ব—তাই তো....আরে কে যায়? অনিল দেখতো জানলার পাশ দিয়ে কে গেল? দেখে মনে হল সোমনাথের·····

—কি বলছেন কাকা! সোমনাথ এখানে কি কোরে আসবে!

অসহিষ্ণু ভাবে বিশ্বনাথবাবু বললেন—আহা ওসব কথা পরে হবে, আগে যাও তাড়াতাড়ি ওকে ধরে নিয়ে এস।

অগত্যা অনিল বাড়ীর ভেতরে এসে বলে, পিসিমা লোকনাথকে একবার ডাকো, বাইরে যিনি এসেছেন ডাকছেন!

প্রতিভাদেবী ব্যস্ত হয়ে বললেন—কেন রে লোকনাথকে উনি ডাকছেন কেন?

অনিল হতাশ ভাবে সোফায় বসে পরলো।

— কি:র কি করেছে লোকনাথ?

—যা করেছে সে কথা বলবার নয়।

প্রতিভাদেবী রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। জয়ন্তী আরতি দুবোনও উৎকণ্ঠিতভাবে এগিয়ে এসে বললে, কি হয়েছে অনিলদা? লোকনাথ কি ওঁর বাড়ীতে চুরি করে পালিয়েছে?

অনিল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, যাই ওঁকে বলে আসি ও পালিয়েছে।

প্রতিভাদেবী ধমকে উঠলেন. হেঁয়ালী রাখ, কি ঘটেছে আগে তাই বল। কে পালিয়েছে?

—সোমনাথ!

সোমনাথ!

সবাই যেন জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে উঠে।

—বাবু র‍্যাডভেঞ্চার করছিলেন, বাবাকে জব্দ করতে এসেছেন। এখন বোঝ ঠেলা।

পরেশ বাবু এসে বললেন, কি হয়েছে অনিল? লোকনাথ কি ওঁর বাড়ীতে কাজ করতো?

—লোকনাথ, মানে সোমনাথ ওঁরই ছেলে। এখানে কদিন লুকিয়ে ছিল।

—কি সর্বনাশ! লোকনাথ বিশ্বনাথ বাবুর ছেলে? সে তো শুনেছি বড় অফিসে ভাল পোষ্টে আছে।

অনিল আগাগোড়া সব ব্যাপার খুলে বলতে আরতির হাসি আর থামে না। হাসতে হাসতে বললে—অনিলদা তোমার বন্ধু দেখছি উপন্যাসকেও হার মানাবে। ছোড়দি, এবার সত্যি কথা বল, বামুন ঠাকুরকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো? ভদ্রলোক আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছে যা

হোক। যাকে বিয়ে করতে হবে জেনে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এল কিনা যার সঙ্গে বিয়ে হবে তারই কাছে ?

পরেশ বাবু অনিলকে ধমক দিতে গিয়ে হেসে ফেললেন।

প্রতিভা দেবী বললেন,—প্রথমদিন ওকে দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল।

অনিল হাসি মুখে বললে—এখন বল সোমনাথকে তোমাদের সকলের পছন্দ হয়েছে তো ?

—খুব পছন্দ। এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে জয়ন্তীর অনেক সৌভাগ্য।

জয়ন্তী বললে—কেন ? আমি কি ফেলনা ? রাঁধুনীর সঙ্গে বিয়ে হওয়াকে সৌভাগ্য বলছো !

অনিল গর্ব্বের সঙ্গে বললে সে কথা আর বলতে হয় না। ও লেখাপড়া সব বিষয়ে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট বুঝলে।

আরতি বললে—খুব বুঝলাম, সেই সঙ্গে এও বুঝতে পারছি মায়ের মনে কষ্ট হচ্ছে।

—কেন ? কেন ? পিসিমার কষ্ট কেন ?

—বাঃ অমন সুন্দর রান্নার লোক এই ভাবে হাতছাড়া হয়ে গেলে মায়ের কষ্ট হবে না ?

আরতির কথায় সকলেই হেসে উঠলো।

"বারমাস্যা"

গৌর গোপাল পাল

শুনুন শুনুন বারো মাসের কথ-কথাগুলি।
অঘ্রানেতে নবান্ন হয়—পৌষে পিঠে-পুলি ॥

মাঘেতে বাদনা পরব—বাগ্দেবীর আরাধনা,
ফাল্গুনে ফাগুয়া খেলেন—শ্যাম কালোসোনা,
চৈত্রতে চড়ক পূজায়—ঢোলক বাজায় ঢুলি ॥

বৈশাখেতে ধরম পূজা সব গাঁয়েতেই হয়,
জ্যৈষ্ঠতে জামাইষষ্ঠী শ্বশুরের নয় ছয়,
আষাঢ়েতে রথে আসে আম-কাঁঠালে ঝুলি ॥

শাওনে শাঁওডালি পূজা কাঁচা দেবতায় নমি,
ভাদ্রতে তালের বড়া—জনম অষ্টমি,
আশ্বিনে অম্বিকা পূজায় প্রীতির কোলাকুলি ॥

কার্তিকে হয় কালী পূজা দিলাম বিবরণ,
গৌর পালের কথ-কথা করে সমপণ,
বার মাসে তের পার্বন—বলে গেলাম খুলি ॥

বিনয়ের জন্মদিনে—
স্বপনবুড়োর শুভেচ্ছা

সংগঠনেই তব কাটে যে জীবন,
সেই হেতু আমাদের আদরের ধন।
সবাকারে নিয়ে গড়ো মধু-বৃত্ত—
মধুর স্বভাবে তব ভরে চিত্ত।
সংস্কৃতি-মনীষাতে মুগ্ধ এ মন,
প্রীতি দিয়ে সবাকার ভরেছ ভুবন।
শতদল সমজাগে তোমার হৃদয়
সবাকার ঠাঁই আছে, ক্ষুদ্র ত নয়॥

বুদ্ধ পূর্ণিমা
১৩৮২

শুভার্থী
স্বপন বুড়ো

।। সতর্ক বাণী ।।

মদন মোহন চট্টোপাধ্যায়

আপন আসন হতে আজি যারে গর্বভরে
দিতেছো সরায়ে তুমি ঠেলে—
একদিন সে তোমারে ফেলিবে পাঁকের পরে
প্রতিদানে অতি অবহেলে।
মানুষের দেবতারে নিয়ত রাখিয়া দূরে
নিজ পার্শ্বে কোনদিনও দাও নাই স্থান—
নিয়তির ক্রোধানলে দুর্দিনের পদতলে
সঁপিয়া দিতে যে হবে আপনার সকলি সম্মান।
যদি কর মানব—দেবতার অপমান ॥
রোগ শোক সন্তাপেতে ধুঁকিছে সারা দেশ কোনমতে
চাহিয়া আছে তব মুখপানে পতিতের ভগবান—
এখনো সময় আছে, ধর হাত সবা মাঝে,
প্রমাণ করিয়া দাও তুমিই সেই অমৃতের সন্তান।
নহেতো পাবে না কখনো কোন পরিত্রাণ
যদি কর মানব-দেবতার অপমান ॥

ইংরেজীতে অনুবাদ ঃ—

As every action has its equal and
opposite reaction,
pride goeth before destruction.
Untouchability is considerd a
great sin,
disregardness follows as its
practical mean.
Ailing country needs thine sympa-
thetic help during her suffring
with attaintment of every relief
through manliness revealing.

প্রভাতের উদয়

শ্রীকুমার রঞ্জন (সিংভূম, বিহার)

আকাশে ঘনঘটা আঁধার
স্তব্ধতা নিরবতার নির্বিকার।
হয়েছে আঁকা রক্তের আলোপনা।
এরই মধ্যে হিংসার আগুন জ্বালা,
ঘৃণিতার পাতা পড়া।
ধর্মের হত্যাকরে পাপ দেয় হাততালি,
ক্ষুধার জ্বালায় ভিখারী যায় গড়াগড়ি।
গোলা-বারুদ নাচে বিভোর
ধ্বংসের অনুরাগী।
এমন সময় ককিল ডাকে কুহু'!
রাতের আঁধার কেটে গেছে ঐ প্রভাতের শুরু।
হারিয়ে গেছে প্রেত পিচাশের নাচ,
শুরু হয়েছে প্রভাতীর ভালোবাসার গান।
নূতন আলোয় বিশ্বে জুড়েছে,
বিশ্বজয়ী প্রেমের গান।
মিটে গেছে রক্তের আলোপনা।
অভয়ে নিত্য মানুষের আনাগোনা।
হাতে হাত মিলিয়েছে,
হিন্দু-মুসলিম-শিখ-ইশাই,
কালো গোরা একই সঙ্গে
জুড়েছে প্রভাতীর জয়গান।
ভয় নেই আর ভয় নেই,
শয়তান বলে ডাকব কারে,
সবে তো মানুষ ;
সবারই হাত-পা রক্ত মাংসেই গড়া।
এই সহজ সরল বাক্য বুঝিয়ে দিতে
নব প্রভাতের উদয়,
আর দেরী নেই—আর দেরী নেই।

কবি লক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক-এর

ভিন্ন স্বাদ ও ছন্দ মধুর এক অনন্য কালজয়ী কাব্য-গ্রন্থ

কবিতা লহরী মূল্য ৭ টাকা

পরিবেশনায় : ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

সংস্কৃত ভাণ্ডার ৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

মতিশীল লাইব্রেরী ২০২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরবাসীর গৌরবময় ভূমিকা জানতে হলে নিজে পড়ুন ও ছেলেমেয়েদের পড়ান

স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর—১ম খণ্ড, মূল্য ৬০.
বসন্ত কুমার দাস

স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর—২য় খণ্ড, মূল্য ৬০.
বসন্ত কুমার দাস

স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর—৩য় খণ্ড, মূল্য ১০০.
ডাঃ রাসবিহারী পাল
অধ্যাপক শ্রীহরিপদ মাইতি

মুখ্য পরিবেশক—দে বুক ষ্টোর, দাসগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী
সি ই ২, সল্টলেক, কলিকাতা-৬৪

মেদিনীপুর সদর ও মহকুমাগুলির প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ১০·০০ টাকা
Price Rs. 10·00

আভা—ABHA

Regd. No. WB/SC 73
R. N. 18638/72

আশ্বিন-কার্ত্তিক—১৪০০
September-October—1993

With best compliments of :

THE PEERLESS GENERAL FINANCE
& INVESTMENT CO. LTD.

Regd. Office :
'PEERLESS BHAVAN'
3, Esplanade East, Calcutta-700 069

INDIA'S LARGEST NON-BANKING SAVINGS COMPANY

প্রকাশক :—শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায়, ৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২৬
মুদ্রক :—কৃষ্ণা আর্ট প্রেস, ৩১, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০

ফেরৎ পাঠাতে হলে প্রকাশকের ঠিকানায় পাঠাবেন।